প্রথম (নাথ পাবলিশিং) সংস্করণ
নভেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

মুদ্রাকর
মৃণালকান্তি ঘোষ
ঘোষ প্রিণ্টার্স
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদপট ও অলংকরণ
গৌতম রায়

পঁচিশ টাকা

অগ্রজ প্রতিম

শ্রীবিমল কর

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

মোহানার দিকে

স্বর্গের এক বাসিন্দা

কেয়াপাতার নৌকো প্রথম পর্ব

কেয়াপাতার নৌকো

অবনীমোহনের ধারণা, পুব বাঙলাকে চেনার মন্ত্র হেমনাথ-লারমোর-স্নেহলতার মতন মানুষদের হাতে রয়েছে এবং পুব বাঙলাকে না জানলে গোটা বাঙলা দেশটাকেই জানা যাবে না। তাঁর বিশ্বাস এখানে তাঁদের থাকা ব্যর্থ হবে না। আবেগপূর্ণ স্বরে সেই কথাই তিনি বলে গেলেন। তারপর উৎসুক দৃষ্টিতে হেমনাথের দিকে তাকালেন।

অভিভূতের মতন শুনে যাচ্ছিলেন হেমনাথ। আচ্ছন্ন গলায় বললেন, 'তুমি যে এভাবে ভেবেছ, আমি চিন্তাই করিনি।'

অবনীমোহন হাসলেন।

হেমনাথ আবার বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ, পুব বাঙলাকে না জানলে গোটা বাঙলাদেশকে জানা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।'

একটু চুপ।

তারপর অবনীমোহন বললেন, 'কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে মামাবাবু—'

'কী সমস্যা ?'

'আমরা যদি এখানে থেকে যাই ছেলেমেয়েগুলো পরীক্ষা-টরীক্ষা দিতে পারবে না। তাতে একটা করে বছর নষ্ট।'

'পরীক্ষার জন্যে আটকাবে না। আমি হেডমাস্টারকে বলে দেব জানুয়ারি মাসে বিনুকে পরের ক্লাসে ভর্তি করে নেবে। অবশ্য একটা এ্যাডমিসন টেস্ট দিতে হবে। আর সুধা-সুনীতির জন্যে তো ভবতোষই আছে। ওদের কলেজে ভর্তি হতে অসুবিধা হবে না।'

অবনীমোহন বললেন, 'ভবতোষবাবু সন্ধ্যেবেলা এসেছিলেন। সুধা-সুনীতির ভর্তির ব্যাপারে আমি তাঁকে একটু আভাস দিয়েছি। বলেছি, দু-একদিনের ভেতর আপনাকে নিয়ে তাঁর বাড়ি যাব।'

হেমনাথ বললেন, 'বেশ তো—'

হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে অবনীমোহনকে চিন্তিত দেখাল। বললেন, 'ভর্তি তো করব, কিন্তু—'

'কী ?'

'ওরা কলকাতা ইউনিভার্সিটির কোর্স পড়েছে। এখানে—'

বাধা দিয়ে হেমনাথ বলে উঠলেন, 'সে জন্তে তোমার দুশ্চিন্তা নেই। এখানকার কলেজটা কলকাতা ইউনিভার্সিটির আওতারে। ঢাকা শহর বাদ দিলে ইস্টবেঙ্গলে যত স্কুল-কলেজ আছে তার প্রায় সবগুলোই কলকাতা ইউনিভার্সিটির আওতায় পড়ে।'

'তাই নাকি? আমার জানা ছিল না। যাক, ভালই হয়েছে।' অবনী-মোহন নিশ্চিন্ত হলেন।

হেমনাথ খানিক ভেবে নিয়ে বললেন, 'এখানে তো থাকবে কিন্তু কলকাতায় তোমার ব্যবসা-ট্যবসা আছে না?'

'আছে।'

'তার কী করবে?'

'তুলে দেব। মাঝখানে একবার কলকাতায় যেতে হবে। সব বন্দোবস্ত করে সপ্তাখানেকের ভেতর ফিরে আসব। ভাবছি—'

'কী?'

'চুপচাপ হাত-পা গুটিয়ে তো বসে থাকা যাবে না। এখানে কিছু ধান জমিটমি কিনে চাষবাষ করব, একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে।'

'বেশ তো; কালই তোমার মিতাকে একটা খবর পাঠাচ্ছি, তার কাছে অনেক জমির খোঁজ আছে।'

'মিতা মানে মজিদ মিঞা?'

'হ্যাঁ—'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেমনাথ আর অবনীমোহনের কথা গোগ্রাসে গিলছিল বিনু। হঠাৎ কে যেন চাপা গলায় ডেকে উঠল, 'ছুটোবাবু—'

চমকে পেছন ফিরতেই দেখা গেল, বারান্দার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যুগল। চোখাচোখি হতেই যুগল হাতছানি দিল।

পায়ে পায়ে ঘর থেকে বাইরে এল বিনু। বলল, 'ডাকছ কেন?'

চাপা আনন্দের গলায় যুগল বলল, 'বড় বাহারের সম্বাদ (খবর) ছুটোবাবু, বড় বাহারের সম্বাদ—'

বুঝতে না পেরে বিনু শুধলো, 'কী?'

'আপনেরা রাইজদিয়াতে থাকবেন।'

তারা রাজদিয়া-বাসী হবে, এতে সবাই খুশী। হেমনাথ-ঝিনুক-শিবানী-স্নেহলতা, সব্বাই। যুগলও যে খুশী হবে, মনে মনে বিনু তা জানত।

যুগল বলল, 'লন (চলুন) আমার লগে।'

'কেন ?'

'মেলা কথা আছে।'

বিনু আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। অন্ধকারে যুগলের সঙ্গে তার ঘরে চলে এল। হাতড়ে হাতড়ে কোত্থেকে একটা হারিকেন বার করে জ্বালিয়ে ফেলল যুগল। বলল, 'বসেন—'

বিনু পা ঝুলিয়ে চৌকিতে বসল। তারপর জানতে চাইল, 'কী কথা যেন বলবে—'

'তরাতরির কী ছুটোবাবু, ধীরেসুস্থে শোনেন—'

যুগলের চোখেমুখে আলো খেলে যাচ্ছে। দুই ঠোঁটের মধ্যিখানে আধফোটা একটু হাসি। বাইরেটা দেখে মনে হয়, প্রাণের ভেতর তার আনন্দের বান ডেকেছে। উৎসুক চোখে বিনু তাকিয়ে থাকল।

কিছুক্ষণ পর যুগল বলল, 'আইজ বিহান বেলায় (সকালে) বড়কত্তার লগে কমলাঘাট গেছিলাম।'

বিনু বলল, 'জানি।'

'হেইখানে কী হইছে জানেন ছুটোবাবু ?'

'কী ?'

খুশির সঙ্গে খানিকটা উত্তেজনা মিশিয়ে যুগল ফিসফিস করল, 'গোপাল দাসের লগে দেখা। হ্যায়ও (সে-ও) কমলাঘাট আইছিল।'

এত আনন্দের কারণ যেন কিছুটা আন্দাজ করতে পারল বিনু। তাকিয়েই ছিল। বলল, 'সেই জন্যেই বুঝি এত ফুর্তি ?'

যুগল শব্দ করে হাসতে লাগল।

বিনু আজকাল বিয়ের ব্যাপারে যুগলের সঙ্গে ঠাট্টা-টাট্টা করে। রগড়ের গলায় বলল, শ্বশুরের সঙ্গে দেখা হলে কার না আনন্দ হয় !'

যুগল বলল 'অহনও হউর হয় নাই কিলাম।'

'দু দিন পর হইব তো।'

'তা হইব।' যুগল তক্ষুনি ঘাড় কাত করল।

বিনু শুধলো, 'গোপাল দাস কী বললে ?'

'আমারে কিছু কয় নাই। কথা-বাত্‌রা যা কিছু বড়কত্তার লগেই হইছে।' যুগল বলতে লাগল, 'গোপাল দাস কী কইছে জানেন ?'

'কী ?'

'বিয়ার সময় পাখিরে যা-যা গয়নাগাটি দিব, বানাইয়া ফালাইছে। হার চুড়ি আংটি কানের দুল জামাইর আংটি—কিচ্ছু আর বাকি নাই। হের পর অন্য জিনিসের কথা ধরেন। নয়া কাপড়-চোপড়, টিনের তোরঙ্গ, বিছানা-পাটি, আয়না-কাকই (চিরুনি), বাসন-কোসন—সগল কিনা (কেনা) হইয়া গেছে।' বলতে বলতে একেবারে বিভোর হয়ে গেল যুগল। তার চোখ চকচক করতে লাগল।

বিনু বলল, 'এত তাড়াতাড়ি সব কিনে ফেলল ?'

যুগল অবাক, 'তরাতরির কই ছুটোবাবু! দিনের হিসাব কইরা দেখছেন ?'

বিনু ঘাড় নাড়ল ; হিসেব করেনি।

যুগল বলল, 'কাত্তিক মাস শ্যাষ হইয়া আইল। আর ছয় দিন পর অঘ্ঘান পইড়া যাইব। অঘ্ঘানের মাঝামাঝি ধান কাটা। একবার ধান কাটা আরম্ভ হইলে উয়াস (নিশ্বাস) ফালানের সময় পাইব না গোপাল দাস। এক-আধটুক জমিন তো তার না ; এক লপ্তে বিশ কানি জমিন। বিশ কানিতে কত ধান হয়, চিন্তা কইরা ছাখেন। হেই সগল কাইটা-কুইটা সেইত্যা ঘরে তুলতে পৌষ-মাঘ দুইখান মাস যাইব গিয়া। হেরপরেই ফাল্গুন মাস। আর—'

'আর কী ?' জিজ্ঞাসু চোখে বিনু তাকাল।

যুগল বলল, 'ফাল্গুন মাস পড়লেই বিয়া—এইর ভিতর কিনা-কাটা সাইরা না রাখলে চলে ?'

বিনুকে মাথা নাড়তেই হল, 'তা তো ঠিকই—'

একটু ভেবে যুগল আবার বলল 'দুই একদিনের ভিতরেই গোপাল দাস আমাগো এইখানে আইব।

'কেন ?'

'বড় কত্তার কাছ থিকা পণের ট্যাকা আদায় করতে।'

বিনুর মনে পড়ে গেল, পাখির জন্য সেদিন আট কুড়ি টাকা পণ চেয়েছিল গোপাল দাস।

যুগল আবার বলল, 'ধান কাটার আগেই সগল ঝামেলা চুকাইয়া রাখতে চায় গোপাল দাস। হেরপর ফাল্গুন পড়লেই পাখির আর আমার দুই জনের চাইর হাত এক কইরা দিব। ঝামেলা আগেই মিটাইয়া রাখন ভাল ; না কী ক'ন ছুটোবাবু ?' সমর্থনের আশায় বিনুর চোখের দিকে তাকাল সে।

বিনু মাথা নাড়াল।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর যুগলই আবার শুরু করল, আমার বিয়ার সময় আপনেরে কিন্তুক বরযাত্রী যাইতে হইব ছুটোবাবু। না গেলে ছাড়ুম না।'

বিনু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'যাব, নিশ্চয়ই যাব।'

'আপনেরা এইখানে থাকবেন, আমার বিয়ায় যাইবেন—কী যে আনন্দ হইতে আছে ছুটোবাবু!'

বিনু উত্তর দিল না।

যুগল বলতে লাগল, 'পাখি আর আমার ব্যাপারটা আপনে তো সগলই জানেন ছুটোবাবু। হেই জল সাতরাইয়া পাখি আমার নায়ে আইল, তারে গান শুনাইলাম, তার লেইগা ছোক ছোক করতে করতে টুনি বইনের বাড়িত যাইতাম—কী না জানেন আপনে! আপনেরে যদি বিয়ার সময় না পাইতাম কী দুঃখু যে হইত!'

বিনু এবারও চুপ করে থাকল।

ধীরে ধীরে কার্তিকের রাত গাঢ় হতে লাগল।

॥ দুই ॥

পরের দিন সকালেই নৌকো দিয়ে যুগলকে কেতুগঞ্জে পাঠিয়ে দিলেন হেমনাথ। মজিদ মিঞাকে নিয়ে সে যখন ফিরল হেমন্তের সূর্য মাথার ওপর এসে পড়েছে।

ক'দিন আগেও দুপুরবেলাটা অসহ্য লাগত। চারদিকে এত গাছপালা, এত জল, স্নিগ্ধ সুশ্যাম মাঠ, এমন অঢেল হাওয়া—তবু সূর্য মাথার উপর এলে তাতে গা পুড়ে যেত।

কার্তিক মাস পড়তেই সূর্যটা কেমন যেন জুড়িয়ে যেতে শুরু করেছে। রোদের স্বভাব যাচ্ছে দ্রুত বদলে। দুপুরবেলাগুলোও এখন বেশ আরামদায়ক, সুস্বাদু। হাওয়াতে টান ধরেছে। শীত যে আসছে, এ তারই ভূমিকা।

মজিদ মিঞাকে আনবার জন্যই যুগলকে পাঠানো হয়েছিল। যেতে-আসতে যুগলের দুপুর হয়ে যাবে; মোটামুটি সময়ের এই হিসেব ধরে হেমনাথ আর অবনীমোহন বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন। বিনুও সেখানে ছিল।

আন্দাজটা মোটামুটি সঠিক। জানলা দিয়ে বিনুরা দেখতে পেল, যুগলের নৌকো পুকুরঘাটে এসে ভিড়েছে। ভিড়বার সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে পাড়ে নামল

মজিদ মিঞা। তারপর উল্লসিত উত্তেজিত গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করল, 'আমার মিতায় কই? ঠাউর ভাই (বড় দাদা) কই?'

মজিদকে দেখে সবাই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। হেমনাথ গলা তুলে বললেন, 'এই যে আমরা।'

কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে মজিদ মিঞা বলল, 'কথাখান কি সত্য ঠাউর ভাই?' বলে হেমনাথের দিকে তাকাল। মজিদ হেমনাথকে ঠাকুর ভাই ডাকে।

হেমনাথ শুধোলেন, 'কোন্ কথা?'

'আমার মিতায় নিহি রাইজদিয়ায় থাইকা যাইব?'

'হ্যাঁ।'

অত বড় মানুষটা, প্রায় অবনীমোহনের সমবয়সী—আনন্দে উত্তেজনায় কী করবে, কী না করবে যেন ভেবে পেল না। ছুটে এসে বিনুকে কোলেই তুলে নিল সে। তারপর আবেগের গলায় বলল, যুগলা গিয়া যখন এই কথা কইল, আমি তো বিশ্বাসই করি নাই।'

হেমনাথ বললেন, 'ঘরে আয়—'

সবাই ঘরে গেল। মজিদ মিঞা বিনুকে ছাড়ে না; তাকে কোলে নিয়েই তক্তপোষে বসল। বিনু বারকতক উসখুস করল কিন্তু মুক্তি পাওয়া গেল না।

মজিদ মিঞা বলল, 'বিহানবেলা বাইর হইতে আছি, যুগলা গিয়া হাজির। তারে দেইখা আমি আটাস (অবাক); মনে মনে এট্টু ডরও ধরছিল। দরকার পড়লে ঠাউর ভাই নিজেই আমার বাড়িত্ যায়; তয় যুগলা আইল কেন? কী সম্বাদ হ্যায় (সে) লইয়া আইছে, কে জানে।'

হেমনাথ শুধোলেন, 'তারপর?'

মজিদ মিঞা আর বলতে পারল না। পুকুরঘাট থেকে যুগল এসে কখন যে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়েছে, কারো খেয়াল নেই। সে বলল, 'হেরপর আমি যহন কইলাম, জামাইকত্তারা (অবনীমোহনরা) এইখানেই থাকব তহন মিঞাভাই তেনার পোলাপানেরে ডাইকা, বাপেরে ডাইকা, মায়েরে ডাইকা, ভাবীজানরে ডাইকা, কেতুগঞ্জের বেবাক মাইন্ষেরে ডাইকা চাইরদিক উথাল-পাথাল কইরা ফেলাইল। মিঞাভাইর মুখে খালি একখান কথা, আমার কইলকাতার মিতায় এইবার রাইজদিয়া-বাসী হইব।'

মুখময় কাঁচাপাকা দাড়ি। তার ফাঁকে জগতের সরলতম হাসিটি হেসে মজিদ

মিঞা বলল, 'কথাখান শুইনা আহ্লাদে আথান হইয়া গেছিলাম : আহ্লাদ হইলে মাইন্ষেরে ডাইকা ডাইকা কমু না ?'

মজিদের আনন্দ, মজিদের আন্তরিকতা প্রাণের গভীর দেশকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। অভিভূত অবনীমোহন বললেন, 'হাজার বার বলবেন—'

মজিদ মিঞা যেন শুনতে পেল না। ঘোরের ভেতর থেকে বলে উঠল, 'আইজ বিহান বেলায় কার মুখ দেইখা উঠছিলাম। জন্ম জন্ম য্যান তার মুখ দেইখাই উঠি।'

একটুক্ষণ চুপ।

তারপ মজিদ মিঞা নীরবতা ভাঙল, 'অহন ক'ন কিসের লেইগা ডাইকা পাঠাইছেন—'

হেমনাথ বললেন, 'খুব দরকারী কথা আছে তোর সঙ্গে—'

মজিদ মিঞা উৎসুক চোখে তাকাল।

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'এখন না ; খাওয়া-দাওয়া কর্। তারপর ধীরে সুস্থে শুনিস।'

মজিদ মিঞার তর আর সয় না। বলল, 'না, অথনই ক'ন।'

এইসময় ভেতর-বাড়ি থেকে করিম এসে জানাল, রান্না-বান্না হয়ে গেছে। স্নেহলতা বলে দিয়েছেন, এক্ষুনি যেন সবাই চান-টান করে নেয়।

হেমনাথ বললেন, 'ঐ যে তলব এসে গেছে। এখন যদি বসে বসে কথা বলতে থাকি, তোর আমার কারো মাথাই বাঁচবে না।'

খাওয়া-দাওয়ার পর পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকতে পারল না মজিদ মিঞা। খেতে বসেই সে বলল, 'ঠাউর ভাই, আমি কিন্তুক সোয়াস্তি পাইতে আছি না।'

হেমনাথ তাকালেন, 'কেন ?'

'ক্যান আবার, যে কথা কওনের লেইগা ডাইকা আনলেন অহনও তা কইতে আছেন না—'

হেমনাথ হেসে ফেললেন, 'তুই বড় অস্থির মজিদ—'

মজিদ মিঞা তক্ষুনি ঘাড় কাত করল, 'লাখ কথার এক কথা। সত্যই আমি বড় অস্থির—'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না হেমনাথ। মনে মনে খানিক চিন্তা করে একসময় শুরু করলেন, 'অবনীর খুব ইচ্ছে কিছু জমিজমা কেনে। চাষ-আবাদ করতে চায়—'

মজিদ মিঞা লাফিয়ে উঠল, 'এ তো বড় আনন্দের কথা—'

'আগে সবটা শোন্। তারপর লাফাস।'

'আইচ্ছা ক'ন—'

হেমনাথ বলতে লাগলেন, আমি তো জমিজমার খবর জানি না ; তুই এ ব্যাপারে দেখেশুনে কিছু ভাল জমি অবনীমোহনকে কিনে দে। দেখিস, পরে যেন আবার মামলা মোকদ্দমা না বাধে।'

মজিদ মিঞা বলল, 'জমিন কিনতে হইব না।'

হেমনাথ অবাক, 'না কিনলে পাবে কোত্থেকে ?'

'আমার চাইর শ' কানি জমিন আছে। তা'র থিকা তিরিশ কানি মিতারে দিয়া দিমু। শখ মিটাইয়া তেনি (তিনি) চাষবাস করুক।'

অবনীমোহন অভিভূত। কেউ যে এমন অক্লেশে মাত্র দু'দিনের আলাপে অতখানি জমি দিয়ে দেবার কথা বলতে পারে তা যেন অভাবনীয়। তবু বিব্রত বোধ করতে লাগলেন অবনীমোহন। বললেন, 'না না, আপনার জমি দেবেন কেন ?'

মজিদ মিঞা বলল, 'দিলামই না হয়। আপনে আমার আপনজন না ?'

'নিশ্চয়ই আপনজন। তবে—'

অবনীমোহন কথা শেষ করতে পারলেন না। তার আগেই মজিদ মিঞা বলে উঠল, 'নিজের ভাই-বন্ধুরে কেও যদি কিছু দ্যায় তা নিতে দোষের কিছু আছে ?'

অবনীমোহন বললেন, 'দোষের কিছু না—'

'তয় ?'

'নেবারও তো সীমা থাকা উচিত।'

মজিদ মিঞা কোন কথাই শুনতে চায় না। বিনে পয়সায় তার জমি নিতেই হবে। না নিলে চারধারে তাবত মানুষকে বলে দেবে কেউ যেন অবনীমোহনের কাছে জমি না বেচে।

মজিদ মিঞা কিছুতেই দাম নেবে না। ওদিকে অবনীমোহনও দাম ছাড়া জমি নেবেন না।

শেষ পর্যন্ত হাসতে হাসতে হেমনাথই মধ্যস্থতা করলেন। বললেন, 'দ্যাখ, মজিদ, তোর কথাটা বুঝতে পারছি। অবনীমোহনকে তুই নিজের জন ভাবিস। সেদিক থেকে কিছু দিলে হাত পেতে নেওয়াই উচিত। কিন্তু অবনীমোহনের দিকটাও ভেবে দ্যাখ—'

'ক'ন কী দিক ?'

'দাম দিয়ে না কিনলে কোন জিনিসই নিজের মনে হয় না। মনে হয় দান নিচ্ছি। অবনী যদি দাম দিতে না পারত তা হলে ছিল আলাদা কথা। তাই বলছিলাম কি—'

'কী ?'

'বাজারে যা দাম, তুই তার চাইতে কিছু কম নে। ওটুকু স্থবিধে করে দিলেই অবনী খুশী হবে। বন্ধু ছাড়া, নিজের লোক ছাড়া কে-ই বা তা ছায়।'

একটু চুপ করে থেকে মজিদ মিঞা বলল, 'আপনে যা কইলেন তাই হইব। কোনদিন আপনের অবাইধ্য তো হই নাই। তয় একখানা কথা—।

'বল্।'

'আমি যে দাম কমু তার বেশি সিকি পয়সা দিলেও কিন্তুক নিতে পারুম না।'

'বেশ তাই হবে।' হেমনাথ হাসলেন।

মজিদ মিঞা বলল, 'তরাতরি খাইয়া-দাইয়া লন ; আইজই মিতারে জমিন দেখাইয়া দিমু।'

খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রামের স্থযোগ পাওয়া গেল না। একরকম তাড়া দিয়েই অবনীমোহন আর হেমনাথকে নৌকোয় নিয়ে তুলল মজিদ মিঞা। বিনু সঙ্গ ছাড়ল না, সেও নৌকোয় উঠল।

যুগলের এখনও চান-খাওয়া হয়নি। ঠিক হল, মজিদ মিঞা নিজেই নৌকো বেয়ে যাবে।

বিনু অবাক হয়ে দেখছিল, জমি দেখার ব্যাপারে সবার চাইতে বেশী উৎসাহ মজিদ মিঞার। অবনীমোহনরা রাজদিয়া-বাসী হলে জগতে তার মতন স্থখী বুঝিবা আর কেউ হবে না।

যাই হোক, হেমন্তের প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে জমি দেখা শুরু হল। মাটি অবশ্য দেখা গেল না। কেননা, কার্তিকের শেষাশেষি এই সময়টায় মাঠে জল আছে। আর সেই জলের ওপর মাথা তুলে আছে থোকা থোকা—একটানা দিগন্ত পর্যন্ত—ধানের মঞ্জরী। যেদিকে যতদূর চোখ ফেরানো যাক, মাঠের ঝাঁপি পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

ক'দিন আগেও ধানের রং সবুজ দেখেছে বিনু। নরম তুঁষের ভেতর তখন সবে দুধ জমেছে। আর এখন ? ধানের খেতকে আর চেনাই যায় না। কোন যাদুকর শ্যামল মাঠকে সোনালি লাবণ্যে কখন ভরে দিল কে জানে।

জমি দেখাতে দেখাতে বিকেল হেলে গেল। ধানের মঞ্জরীর ভেতর দিয়ে পথ করে নৌকো চলেছে তো চলেইছে।

একসময় মজিদ মিঞা অবনীমোহনের উদ্দেশে বলল, 'এতগুলান জমিন দেখাইলাম, কোন্‌টা পছন্দ হইল ক'ন—'

অবনীমোহন বললেন, 'আমার তো সব জমিই ভাল লাগল। কি চমৎকার ধান হয়ে আছে।'

জোরে জোরে মাথা নেড়ে মজিদ মিঞা বলল, 'উঁহু—'

'কী ?'

'এই চকের সব জমিনই ভাল না মিতা। এইর ভিতর সরস-নীরস আছে।'

'তাই নাকি ?'

'হ—' মজিদ মিঞা ঘাড় কাত করল।

অবনীমোহন বললেন, 'আমি তো বুঝতে পারছি না। সব জায়গাতেই সুন্দর ধান ফলেছে।'

'মিতা আপনে ভাল কইরা ধানটা খেয়াল করেন নাই। করলে বুঝতেন, যেই জমিনে ঘন হইয়া মোটা গোছে ধানগাছ ফনফনাই উঠছে সেই জমিনই ভাল জমিন। আর যেই জমিনে ধানগাছ পাতলা সেই জমিন ভাল না।'

'সত্যি, আমি অতটা খেয়াল করিনি।'

মজিদ মিঞা বলল, 'জমিন চিনা সহজ না।'

অবনীমোহন বললেন, 'নিশ্চয়ই। আমি বলি কি, আর ঘোরাঘুরিতে দরকার নেই। আপনি একটা জমি পছন্দ করে দেবেন, আমি তাই নেব।'

কথাটা যুক্তিসঙ্গত মনে হল। মজিদ মিঞা বলল, 'হেই ভাল।'

জমি দেখার পর ফেরার পালা। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে নেমে গেল।

॥ তিন ॥

দিন দুই পর অবনীমোহন কলকাতা রওনা হলেন। ওখানকার সব ব্যবস্থা করে ফিরতে ফিরতে এক সপ্তাহ। রাজদিয়ায় ফিরেই জমি রেজিস্ট্রি করার ইচ্ছা। হেমনাথ এবং মজিদ মিঞাকে এ ব্যাপারে সব বন্দোবস্ত করে রাখতে বলে গেছেন তিনি।

দুপুরের স্টিমারে অবনীমোহন চলে গেছেন।

বিকেলবেলা পুবের ঘরে সুধা আর বিনু বসে ছিল। সুনীতি জানলার শিক ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে গাইছিল :

'ভালবাসিবে বলে ভালবাসি নে
আমার এই রীতি,
তোমা বই জানি নে।
বিধু মুখে মধুর হাসি
দেখিলে সুখেতে ভাসি,
তাই তোমারে দেখিতে আসি,
দেখা দিতে আসি নে।'

গাইতে গাইতে হঠাৎ থেমে গেল সুনীতি।

সুধা বলল, 'বেশ তো গাইছিলি, থামলি কেন?'

ঠোঁট টিপে সুনীতি বলল, 'তোর বিধু মুখে মধুর হাসি দেখবার জন্যে কে আসছে ত্যাখ সুধা। উঠে ত্যাখ—'

সুধা, তার সঙ্গে বিনু—জানলার বাইরে তাকাতেই দেখতে পেল, বাগান পেরিয়ে এদিকেই আসছে হিরণ।

অনেকদিন পর হিরণ এ-বাড়িতে এল। পুজোর আগে নাটক-টাটকের ব্যাপারে নিয়মিত হানা দিত সে। পুজোর পর বার-দুই মোটে তাকে দেখা গেছে। বিজয়ার পরের দিন একবার, আরেকবার কোজাগরীর রাত্তিরে। তারপর থেকে হিরণ নিরুদ্দেশ।

এই তো সেদিন তার সঙ্গে আলাপ। দেখামাত্র বিনুদের জয় করে নিয়েছিল হিরণ। বিশেষ করে সুরমা আর অবনীমোহনের তো খুবই ভাল লেগেছে তাকে।

নিয়ম করে যে দু' বেলা আসছিল, হঠাৎ পনের-কুড়ি দিন তার খোঁজখবর নেই। সুরমা এবং অবনীমোহন চিন্তিত হয়েছেন; রোজই হিরণের কথা বলাবলি করেছেন। হেমনাথের অবশ্য দুর্ভাবনা নেই। হিরণকে তিনি চেনেন। হাসতে হাসতে বলেছেন, 'ওটা ঐরকমই। এল তো দিনে দশবারই এল। তারপর এমন উধাও হল যে বিশ-পঁচিশ দিন আর পাত্তাই নেই।' হিরণের স্বভাব জেনেও তার খোঁজে যুগলকে কয়েকদিন পাঠিয়েছেন। যুগল এসে জানিয়েছে, হিরণ নেই। কোথায় গেছে, বাড়ির লোকেরা জানে না।

বাগান-টাগান পেরিয়ে একটু পর হিরণ পুবের ঘরে চলে এল। খুশীর সুরে বলল, 'তিন ভাইবোনই এখানে আছে দেখছি।'

'হ্যাঁ। সুনীতি ঘাড় কাত করল। কণ্ঠস্বরে দোলা দিয়ে বলল, 'আপনি তো বেশ লোক মশাই—'

হিরণ হকচকিয়ে গেল, 'কেন ?'

'সেই যে লক্ষ্মীপুজোর দিন এলেন ; তারপর আর পাত্তাই নেই। বাড়িতে লোক পাঠিয়েও খোঁজ পাওয়া যায় না। কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন ?'

'মানিকগঞ্জে আমার এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম। ওরা কিছুতেই ছাড়ল না। দিন পনের-কুড়ি কাটিয়ে আসতে হল।'

'বাঃ বাঃ, চমৎকার !'

ভয়ে ভয়ে হিরণ জিজ্ঞেস করল, 'কী ?'

সুনীতি বলল, 'পনের-কুড়ি দিন উধাও হয়ে থাকলেন। বাড়িতে একটা খবরও তো পাঠাতে হয়।'

'রোজই ভেবেছি পাঠাব। পাঠাব পাঠাব করে পাঠানো আর হয়নি ; শেষ পর্যন্ত চলে এলাম।'

'বাড়ির লোকদের দুশ্চিন্তায় ফেলে কী লাভ ?'

'বাড়ির লোকেরা দুশ্চিন্তা করে না। মাঝে মাঝেই আমি ডুব দি, সবার এতে অভ্যেস হয়ে গেছে।' হিরণ বলতে লাগল, 'সে যাকগে। আজই মানিকগঞ্জ থেকে ফিরেছি। স্টিমারঘাটে নেমে একটা সুখবর শুনলাম। শুনে আমাদের বাড়িতে একবার দেখা দিয়েই আপনাদের এখানে ছুটতে ছুটতে আসছি।'

সুনীতি শুধলো, 'কী এমন সুখবর যে ছুটতে ছুটতে আসতে হল ?'

উৎসাহের গলায় হিরণ বলল, 'আপনারা নাকি কলকাতায় ফিরছেন না ; রাজদিয়াতেই থেকে যাবেন ?'

'আপনাকে কে বললে ?'

'জীবন ঘোষ।'

'জীবন ঘোষ আবার কে ?'

হিরণ হাসল, 'সবাইকে কি আপনি চিনবেন ? স্টিমারঘাটার পাশে সারি সারি মিষ্টির দোকান দেখেছেন তো ?'

সুনীতি মাথা নেড়ে জানাল, দেখেছে।

হিরণ বলল, 'প্রথম দোকানটা জীবন ঘোষের।'

সুনীতি অবাক। বিস্ময়ের সুরে বলল, 'মিষ্টির দোকানদারদের কাছেও এ-খবর পৌঁছে গেছে!'

'ইয়েস ম্যাডাম।' হিরণ জিজ্ঞেস করল, 'খবরটা ঠিক তো?'

'ঠিক।'

হিরণের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উৎফুল্ল সুরে বলল, 'সত্যি গুড নিউজ। আমার কী আনন্দ যে হচ্ছে!'

সুনীতির কপাল কুঁচকে গেল। ঘাড়খানা ঈষৎ হেলিয়ে চোখ আধাআধি বুজে নীরস গলায় শুধালো, 'আমরা থাকব; তাতে আপনার আনন্দ কেন হবে মশাই?' বলেই আড়ে আড়ে সুধার দিকে তাকাল।

সুধার অবস্থা অবর্ণনীয়। মুখ নীচু করে সমানে নখ খুঁটে যাচ্ছে সে; খুঁটেই যাচ্ছে।

এদিকে হিরণ থতমত খেয়ে গেছে। ফস করে জোরালো ঝলমলে আলো নিভে গেলে যেমন হয়, তার মুখের চেহারা অবিকল সেইরকম। কাঁপা শিথিল গলায় বলল, 'বা রে, আপনারা থাকলে আমার আনন্দ হবে না?'

এমনিতে সুনীতি বেশ গম্ভীর, মৃদুভাষিণী। চপলতা তরলতা তার ধারে কাছে নেই। কিন্তু হিরণকে এতদিন পর পেয়ে আজ যেন কী হয়ে গেছে! আপন স্বভাবের কথা মনেই নেই সুনীতির। প্রগলভতার ঈশ্বর বুঝিবা তার ওপর ভর করে বসেছে। কপালে আরো ক'টা ভাঁজ ফেলে চোখ আরো ছোট করে সে বলল, 'আনন্দের একটা কারণ তো থাকবে। সেটা কী?'

সুধা আর বিনুকে দ্রুত এক পলক দেখে নিয়ে বিব্রত বিপন্ন মুখে হিরণ বলল, 'মানে—মানে—আপনারা হেমদাদুর আত্মীয়; তাই—'

'হেমদাদুর আত্মীয় তো আপনার কী? আনন্দ হলে হেমদাদুরই হওয়া উচিত।' সুনীতি আজ বড়ই নিষ্ঠুরা।

হিরণ কী বলবে, ভেবে পেল না। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল, গলায় স্বর ফুটল না।

একটুক্ষণ নীরবতা।

তারপর অতি দ্রুত সুনীতির মুখচোখের চেহারা বদলে যেতে লাগল। গলাখানা আগের মতন ঈষৎ বাঁকিয়েই রাখল সে। চোখের তারা দুটো উজ্জ্বল কালো মণির মতন কৌতুকে ঝিকমিক করতে লাগল। ঠোঁটের প্রান্তে আধো-গোপন একটুখানি হাসি। তারা সারা গায়ে অদৃশ্য ঢেউয়ের মতন কী যেন খেলে বেড়াতে লাগল।

খুব চাপা গলায় সুনীতি হঠাৎ ফিসফিস করল, 'বুঝলেন মশাই—'

চকিত হিরণ তার চোখের দিকে তাকিয়ে ভীরু গলায় সাড়া দিল, 'কী ?'

'খুব আনন্দ হয়েছে, না ?

হিরণ চুপ। কী উত্তর দেওয়া ঠিক হবে তা যেন স্থির করে উঠতে পারল না। ক্ষণে নিষ্ঠুরা ক্ষণে মধুরা—সুনীতির এইরকম দ্রুত স্বভাব-বদল আগে আর কখনও ছাখেনি সে।

রঙ্গিণী নায়িকার মতন লীলাভরে হাত নেড়ে সুনীতি বলল, 'পনের- কুড়ি দিন উধাও হয়ে থেকে আজ এসে বলছেন, আনন্দ হয়েছে। ওভাবে আনন্দ প্রকাশ করে না মশাই—'

ইতিমধ্যে খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে নিয়েছে হিরণ। মুখ তুলে একবার সুনীতিকে দেখে নিয়ে বলল, 'কিভাবে তা হলে করে ?'

'সুধার কাছে জেনে নিন। বলেই বিনুর দিকে ফিরল সুনীতি, 'চল্ রে বিনু, আমরা বাগানে যাই—'

হিরণের চোখেমুখে আগের উজ্জ্বলতা ফিরে এসেছে। রঙ্গিণী এবং নির্দয়া, ছুই রূপেই যে সুনীতি কৌতুক করেছে, এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে হিরণ। মাথাটা সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকিয়ে সে বলল, 'আপনি সত্যিই মহানুভব!'

'বলছেন ?'

'একশ বার।'

বিনুকে নিয়ে তু'পা গিয়েই হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে পেছন ফিরল সুনীতি। বলল, 'ছুনিয়ার সব স্কুল-কলেজ খুলে গেছে। আপনার ইউনিভার্সিটি এ-বছর খোলার আশা আছে ?'

'নিশ্চয়ই আছে।' হেসে হেসে হিরণ বলল, 'আজ থেকে তিনদিন পর খুলবে।'

'ইউনিভার্সিটি খুললেই তো ঢাকায় গিয়ে থাকবেন ?'

'তা তো থাকতেই হবে।'

'কিন্তু—'

'কী ?'

একটু ভেবে সুনীতি বলল, 'একটানা ঢাকায় গিয়ে থাকলে চলবে না। মাঝে মাঝে এখানে এসে আনন্দ প্রকাশ করে যাবেন, বুঝলেন ?'

মাথাটা অনেকখানি হেলিয়ে হিরণ বলল, 'আপনার আদেশ মাথা পেতে নিলাম।'

সুনীতি আর কিছু বলল না। বিনুকে সঙ্গে নিয়ে ইঙ্গিতময় একটু হেসে বাগানের দিকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর ছুটতে ছুটতে সুধা বাগানে এল। হেমন্তের বাতাসে তার পিঠময় খোলা চুল উড়ছে; চোখের তারায় আগুনের হল্কা খেলে যাচ্ছে। বুকটা ঢেউয়ের দোলায় একবার উঠছে, একবার নামছে। সুধা যেন এখন রণরঙ্গিণী।

বিনু সুনীতি এখানেই ছিল। বাগানের উত্তর দিকে খালের ধার ঘেঁষে একটা রোয়াইল ফলের গাছ। হলুদ রঙের গোল গোল ফলগুলি যেমন টক তেমনি সুস্বাদু। সুনীতি কোঁচড় ভরে নিয়েছিল; বিনু নিয়েছিল পকেট বোঝাই করে। তারপর বাগানময় ঘুরে ঘুরে টপাটপ মুখে ফেলে যাচ্ছিল।

সুধা এসে সোজা সুনীতির একটা হাত চেপে ধরল। এত জোরে ধরেছে যে বাহুর কোমল মাংসে নখ বসে গেছে।

সুনীতি বলল, 'উ, লাগে। ছাড়্ সুধা—'যন্ত্রণায় তার চোখমুখ কুঁচকে গেছে।

সুধা ছাড়ল না। ধারাল গলায় বলল 'এটা কী হল?'

'কোনটা?'

'আমাকে আর হিরণবাবুকে ওভাবে রেখে চলে এলি যে?'

যন্ত্রণার মধ্যেও হেসে ফেলল সুনীতি। গলা নামিয়ে ফিসফিস করল, 'তোরা তাই চেয়েছিলি যে।'

সুধা খুব রেগে গেল, 'কী চাই, তোর কানে কানে বুঝি বলেছিলাম?'

'বলতে হবে কেন?'

'তবে?'

'আমি কি কচি খুকি, কিছুই বুঝি না?'

সুধা ভেংচি কাটার মতন করে বলল, 'কচি খুকি হবি কেন, তুই সব্বার ঠাকুমা। বুঝবি আবার না, একেবারে অন্তর্যামী হয়ে বসে আছিস!'

সুনীতি হাসতে লাগল, 'আছিই তো।

সুধা এবার খেপে উঠল, 'আমাকে আর হিরণবাবুকে নিয়ে আবার যদি এরকম করিস খুব খারাপ হয়ে যাবে।'

কৌতুকের গলায় সুনীতি বলল, 'সত্যি!' শেষ শব্দটার ওপর কণ্ঠস্বরের সবটুকু শক্তি ঢেলে দিল সে।

'সত্যি না তো মিথ্যে ?'

সুনীতি এবার এক কাণ্ডই করল। আঙুলের ডগায় পানপাতার সরু সুছাঁদ প্রান্তের মতন সুধার মনোহর চিবুকটি তুলে ধরে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, 'আমার বেলায় বুঝি মনে ছিল না ?'

সুধা বলল, 'তোর সঙ্গে আবার কী করলাম ?'

'এর ভেতরেই ভুলে গেলি ?'

'কিছু করলে তো মনে থাকবে ?'

স্বর টেনে টেনে সুনীতি বলল, 'কিছু করোনি ?

সুধা বলল, না।'

'আনন্দবাবু আর আমাকে নৌকোয় তুলে সেদিন ঠেলে দিয়েছিল কে ? এবার মনে পড়ছে ?' সুধার চিবুকটা ঠেলে আরেকটু ওপরে তুলল সুনীতি।

সুধা এবার হেসে ফেলল, 'তাই বুঝি শোধ তুললি ?'

'ঠিক তাই। এবার থেকে মনে রাখবি, এক মাঘে শীত যায় না।'

'রাখব ; তুইও রাখিস।'

দুই বোন হাত-ধরাধরি করে হঠাৎ গলা মিলিয়ে হেসে উঠল।

॥ চার ॥

হিরণ, ভবতোষ কিংবা মজিদ মিঞাই শুধু না। বিনুরা যে এখন থেকে রাজদিয়াতেই থাকবে, এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাবে—এ খবরটা জানতে রাজদিয়ার কারো আর বাকি রইল না। এবং মুখে মুখে দিগ্বিদিকে ছড়িয়েও পড়তে লাগল।

সকাল নেই দুপুর নেই, আজকাল লোক আসছে তো আসছেই। নিকারীপাড়া-মৃধাপাড়া, কুমোরপাড়া-কামারপাড়া, যুগীপাড়া-ঋষিপাড়া, রাজদিয়াই বা কেন, দূর-দূরান্তের গ্রাম-গঞ্জ থেকে জলস্রোতের মতন মানুষ আসছেই। বিনুরা এখানে থাকবে, তাদের প্রতিবেশী হিসেবে পাওয়া যাবে—এতে সবাই আনন্দিত, গর্বিত। আনন্দ আর গর্বের কথাটা তারা আন্তরিক সুরে বলে যেতে লাগল।

বিনুদের জন্য সারা রাজদিয়া জুড়ে উৎসব শুরু হয়ে গেছে বুঝি। তাদের থাকার কথা শুনে এত লোক যে ছুটে আসতে পারে তা যেন ভাবাই যায় না।

বিস্মিত অভিভূত সুরমা তো বলেই ফেলেছেন, 'যেখানকার মানুষ এত ভাল সে-জায়গা স্বর্গ।'

দেখতে দেখতে অঘ্রান মাস পড়ে গেল।

একদিন সকালবেলা তুই দিদি আর ঝিনুকের সঙ্গে দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় পড়তে বসেছিল বিনু। কলকাতায় গিয়ে অ্যানুয়েল পরীক্ষা অবশ্য দিতে হবে না। সেদিক থেকে দুর্ভাবনা না থাকলেও জানুয়ারী মাসে এ্যাডমিসন টেস্ট দিয়ে এখানকার স্কুলে ভর্তি হতে হবে। তাই বই-টইগুলোর সঙ্গে একটু-আধটু যোগাযোগ রাখা দরকার।

পড়ার মধ্যে হঠাৎ কোত্থেকে যুগল এসে হাজির। উঠোনের কোণ থেকে ইশারায় বিনুকে ডেকে নিয়ে খুব উৎসাহের সুরে বলল, 'ছুটোবাবু, কাউঠ্যার মাংস খাইছেন কুনোদিন?'

বিনু বলল, 'কাউঠ্যা কী?'

'কাউঠ্যা চিনেন না?'

'না।'

যুগল এবার এমনভাবে তাকাল যাতে মনে হয়, 'কাউঠ্যা' না চেনার ফলে জীবন একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেছে বিনুর। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর 'কাউঠ্যা' নামক প্রাণীটির রূপগুণ বংশ-পরিচয়ের বিবরণ দিতে শুরু করল, 'কাউঠ্যা জলে থাকে, গোল দেখতে। পিঠের চারাখান লোহার নাহান (মতন) শক্ত। কাউঠ্যার নাহান আরেকখান জলের পোক আছে—কাছিম। কাছিমের দুই ধারে যে বাদি আছে তা খাইতে লাগে নাইরকলের নাহান (নারকেলের মতন)। চাবাইলে কচ কচ করে।'

সবটা বলা হল না। আধাআধি শুনেই বিনু প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি কচ্ছপের কথা বলছ?'

'হ-হ, কচ্ছম—'

'তাই বল। আমি ভাবলাম, না জানি কী! কউঠ্যা-কাউঠ্যা করলে লোকে কখনও চিনতে পারে?'

এবার বিব্রত হবার পালা যুগলের। হাত কচলাতে কচলাতে সে বলল, 'কী করুম ছুটোবাবু, আমরা তো আর এংরাজি-টেংরাজি শিখি নাই। আমরা কাউঠ্যাই কই—'

ইংরেজি শেখার সঙ্গে 'কাউঠ্যা' বলার সম্পর্ক কী, বিনু ভেবে পেল না।

এ-ব্যাপারে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে বলল, 'কচ্ছপ আমি ঢের দেখেছি, তবে মাংস খাইনি।'

'মাংস যদি খাইতে হয়, লন (চলুন) আমার লগে। এক শালারে জলের তলে উদ্দিশ কইরা এক নাইলা (যার একটিমাত্র ফলা) টেটা নিতে আইছি। গিয়াই গাথুম (গাঁথব)।' যুগল বলতে লাগল, 'টেটা নিতে আইসা আপনের কথা মনে পড়ল ছুটোবাবু, ভাবলাম ডাইকা নিয়া যাই—'

মাংসের লোভ খুব একটা নেই। জলের তলায় কোথায় কচ্ছপ দেখে এসেছে যুগল, কিভাবে সেটাকে গেঁথে ওপরে তুলবে—তাই ভেবে উত্তেজনা বোধ করতে লাগল বিনু। উৎসাহের সুরে বলল, 'চল—'

'এট্টু খাড়ন, টেটাটা নিয়া আসি।'

ছুটে গিয়ে নিজের ঘর থেকে এক ফলাওয়ালা একটা টেটা এবং এক টুকরো চ্যাপ্টা ভারী লোহার পাত নিয়ে এল যুগল। বলল, 'লন যাই—'

বইপত্তর দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় ছড়িয়েই রইল। যুগলের পিছু পিছু ছুট লাগাল বিনু। এই মুহূর্তে, কোথায় কোন্ অদৃশ্যে বসে জলতলের এক প্রাণী তাকে অবিরাম হাতছানি দিয়ে যাচ্ছে যেন।

উঠোন-বাগান পেরিয়ে রাস্তায় আসতেই হঠাৎ বিনুর মনে সন্দেহ দেখা দিল। আস্তে করে সে ডাকল, 'যুগল—'

যুগল তক্ষুনি সাড়া দিল, 'কী ক'ন ছুটোবাবু—'

সংশয়ের গলায় বিনু বলল, 'তুমি তো সেই কখন কচ্ছপটাকে দেখে এসেছ। সে কি এতক্ষণ আমাদের জন্যে বসে আছে! গিয়ে হয়তো দেখব, পালিয়ে গেছে।'

বিজ্ঞের মতন একটু হাসল যুগল, 'কাউঠ্যার চরিত্তির আপনে জানেন না ছুটোবাবু—'

যুগল ঠিক কী বলতে চায়, বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকল বিনু।

যুগল আবার বলল, 'শালারা এমুন আইল্‌সা (অলস) জাত যে সহজে লড়তে (নড়তে) চায় না; দিনের পর দিন এক জায়গায় শুইয়া থাকতে ভালবাসে। আমি যে কউঠ্যাটারে এট্টু আগে দেইখা আইছি, হেইটা ঠিকই থাকব। তয়—'

'তবে কী?'

'আর কারো নজরে পড়লে অন্য কথা।'

বিনু শুধলো, 'আর কেউ দেখলে কী হবে?'

যুগল হাতের অস্ত্রটা দেখিয়ে বলল, 'এইরকম টেটা দিয়া গাইথা নিয়া যাইব গা।'

একটু চুপ।

তারপর যুগলই আবার শুরু করল, 'জানেন ছুটোবাবু, নানান জাতের কাউঠ্যা আছে। জউলা কাউঠ্যা, কালি কাউঠ্যা, সুন্দি ক্যাউঠ্যা—'

এক নাগাড়ে কত নাম যে বলে গেল যুগল! শুনতে শুনতে অবাক হয়ে গিয়েছিল বিনু। বলল, 'এত রকম কচ্ছপ!'

'হ।'

'আমাকে চিনিয়ে দেবে?'

'নিযাস দিমু।'

যুগল আরো যা বলল, তা এইরকম। পূর্ববাংলার জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যত পশুপাখি ঘুরে বেড়ায়, উড়ে বেড়ায়, তাদের সবাইকে চেনে সে। কেমন তাদের স্বভাব, কোথায় তাদের বসতি, কিভাবে তাদের ধরতে হয়—এসব সম্বন্ধে তার বিপুল জ্ঞান, বিশাল অভিজ্ঞতা। নিজের অভিজ্ঞতার সমস্তটুকুই অকাতরে সে ছোটবাবুর হাতে তুলে দেবে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিনুরা স্টিমারঘাটার দিকে হাঁটছিল। কিছুক্ষণ হাঁটার পর সেই কাঠের পুলটার ওপর এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল যুগল; দেখাদেখি বিনুও দাঁড়াল।

যুগল বলল, 'আমরা আইসা গেছি ছুটোবাবু।'

বিনু বলল, 'এখানেই তোমার কচ্ছপ আছে?'

'হ। দেখবেন আসেন—'

পুলের তলা দিয়ে খাল গেছে। বিনুকে নিয়ে পুলের ডানদিকে একেবারে জলের ধারে এসে দাঁড়াল যুগল।

হেমন্তের মাঝামাঝি এই সময়টায় জল শান্ত, স্থির। কোথাও সামান্য ঢেউ পর্যন্ত নেই।

খালের দিকে আঙুল বাড়িয়ে যুগল বলল, 'উই দ্যাখেন ছুটোবাবু, শালার কাউঠ্যা উইখানে আরাম কইরা শুইয়া আছে।'

বিনু তাকাল। পলকহীন তীক্ষ্ণ চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও অঘ্রানের নিস্তরঙ্গ খালে অতল কালো জল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না।

পাশ থেকে সাগ্রহে যুগল শুধলো, 'দেখতে পাইছেন?'

বিনু মাথা নাড়ল, 'না।'

'ভাল কইরা ঠাওর করেন।'

চোখদুটো আরো শাণিত করল বিনু। কিন্তু কোথাও কচ্ছপের চিহ্ন নেই। সে বলল, 'কোথায় তোমার কচ্ছপ ?'

ধিক্কারের গলায় যুগল বলল, 'কী চোখ আপনের ছুটোবাবু! সামনে রইছে অথচ দেখতে পান না! ঐ যে দ্যাখেন—'

এবার বিনু দেখতে পেল, অনেকক্ষণ পর প' জলের অতল থেকে একটা দুটো করে বুদ্বুদ উঠে আসছে।

বিনু বলল, 'ওগুলো তো বুজগুড়ি—'

'হ। ঐগুলির তলেই শালার কাউঠ্যা শুইয়া রইছে আর গলা বাইর কইরা পুটুর পুটুর উয়াস ছাড়তে আছে। থাড় বউয়ার ভাই, এইবার তোমারে নীলা (লীলা) সাঙ্গ করি—'

যুগলের হাতে যে অস্ত্রটা ছিল, তার চেহারা মোটামুটি এইরকম। সরু মতন লম্বা একটা বাঁশের মাথায় ইস্পাতের ধারাল ফলা আটকানো। ফলার কাছাকাছি জায়গায় বাঁশটাকে ঘিরে সেই ভারী লোহার পাতটা পরিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিল যুগল। তারপর পুলের কিনারে এসে বুদ্বুদগুলি নিশানা করে খুব আস্তে টেটাটা ছুঁড়ে দিল।

আস্তে ছুঁড়লে কি হবে, লোহার পাতের ভারে অস্ত্রটা তীরের মতন জলের অতলে নেমে গেল।

একটু পর টেটার বাঁশ ধরে যুগল যখন টেনে তুলল, দেখা গেল, ফলার মাথায় সত্যি সত্যিই একটা কচ্ছপ। ফলাটা তার নরম মাংসল গলা ভেদ করে ওধারে চলে গেছে।

যুগল বলল, 'অঘ্রান পৌষ মাসে জল যখন থির হইয়া যায়, হেই সময় কউঠ্যারা কী করে জানেন ছুটোবাবু? জলের তলে গলা বাইর কইরা উয়াস ছাড়ে; হেই দেইখা ঠাওর করতে হয়। মনে থাকব তো?' বলতে বলতে ক্ষিপ্র হাতে টেটার ফলা খুলে দড়ি দিয়ে কচ্ছপটার পা বেঁধে হাতে ঝুলিয়ে নিল।

আজ থেকেই পাঠ শুরু করে দিয়েছে যুগল। বিনু বলল, 'থাকবে।'

'লন, এইবার বাড়িত্ যাই

বাড়ির দিকে সবে পা বাড়িয়েছে, হঠাৎ বিনু দেখতে পেল, ডান ধারে ঠিক খালের ওপারে অদ্ভুত ধরনের বড় বড় সাতখানা নৌকা দাঁড়িয়ে আছে।

রাজদিয়ায় আসার পর অনেক রকমের নৌকো দেখেছে বিনু—গাছি, শালতি, কোষ, মহাজনী ভর। কিন্তু এইরকম নৌকো এই প্রথম দেখল।

অপার বিস্ময়ে বিনু শুধলো, 'ওগুলো কিসের নৌকো যুগল?'

একপলক দেখে নিয়ে যুগল বলল, 'ঐগুলি বেবাইজ্যা (বেবাজিয়া) বহর। অনেক কাল পরে বেবাইজ্যারা রাইজদিয়া আইল। লন যাই, অগো ডাইকা বাড়িত্ নিয়া যাই—' বলেই ছুটল।

যুগলের পেছনে ছুটতে ছুটতে বিনু বলল, 'বেবাইজ্যা কী?'

'গেলেই বুঝতে পারবেন।'

খানিকটা ছুটবার পর ডান ধারে খালের ওপর দিয়ে বাঁশের সাঁকো। সেটা পেরুলেই ওপারে সারি সারি বেবাজিয়া নৌকোর বহর।

সাঁকোর কাছাকাছি এসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যুগল ডাকতে লাগল, 'বেবাইজ্যা হে-এ-এ-এ—'

ওপার থেকে কেউ সাড়া দিল, 'কিবা কও-ও-ও—'

'কার বহর?'

'আঞ্জুমান বেবাইজানীর।'

মুখ ফিরিয়ে এবার বিনুর দিকে তাকাল যুগল, 'চিনা (চেনা) মানুষ। আঞ্জুমান বেবাইজানীরা বচ্ছরে একবার আমাগো এইখানে আসে—'

সেই কৌতূহলটা মনের ভেতর টগবগ করছিল। বিনু আবার শুধলো, 'বেবাইজ্যা কী বললে না তো—'

ঈষৎ বিরক্ত হল যুগল, 'আপনের আর তর সয় না ছুটোবাবু। কইলাম, অগো বহরে গেলেই ট্যার পাইবেন। তা না—'

বিনু কিছু বলল না; ঘাড় গোজ করে রইল।

বিনুর চোখমুখ দেখে হয়তো করুণাই হয়ে থাকবে। যুগল বলল, 'বাইজ্যা কারে কয় জানেন তো?'

এতক্ষণে মনে পড়ে গেল। বেবাইজ্যা শব্দটা আজই প্রথম শুনছে না বিনু, আগেও একবার শুনেছে। সেদিন রাত্রিবেলা সুজনগঞ্জের হাট থেকে ফেরার সময় মাঝনদীতে তাদের একটা বহরও দেখেছিল। ঢেঁড়াওলা হরিন্দ তার দুই সাকরেদ কাগা-বগাকে নিয়ে সেই বহরে উঠে কোন্ এক ইসলামপুরের দিকে পাড়ি জমিয়েছিল।

শব্দটা ঠিক বেবাইজ্যা না, বেবাজিয়া। অর্থাৎ বেদে। এই জলের দেশে

বেদেদের যে বেবাজিয়া বলে, বিনু কেমন করে জানবে? সেদিন হাট থেকে ফেরার সময় হেমনাথ তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

কলকাতায় ইরানী যাযাবরদের দেখেছে বিনু, ভূগোল বইতে আরব বেদুইনদের কথাও পড়েছে। তারা সব স্থলচর জীব; হেঁটে হেঁটে অথবা উটের পিঠে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এই খাল-বিল-নদীর রাজ্যে তা তো আর সম্ভব না; নৌকোয় নৌকোয় জলচর পাখির মতন এখানকার বেবাজিয়ারা ভেসে বেড়ায়।

বিনু বলল, 'তোমাকে আর বুঝিয়ে দিতে হবে না। বেবাজিয়াদের আমি আগেও দেখেছি।'

যুগল বলল, 'আগে দেইখা থাকলে 'বেবাইজা কী' 'বেবাইজা কী' কইরা আমারে পাগল কইরা মারতে আছিলেন ক্যান?'

'আমার মনে পড়ছিল না যে।'

একটু নীরবতা।

'কাউঠ্যা নিয়া আর বেবাইজা বহরে যামু না। শালারে এইখানে বাইন্ধ্যা রাইখা যাই।' হাতের কচ্ছপটাকে সাঁকোর সঙ্গে দ্রুত বাঁধতে লাগল যুগল।

বিনু কিছু বলল না।

বাঁধাছাঁদা হয়ে গেলে যুগল শুধলো, 'সাঁকো পার হইতে পারবেন ছুটোবাবু?'

সরু একখানা বাঁশের ওপর দিয়ে ওপারে যেতে হবে। দু'ধারে যদিও ধরনি (ধরবার জন্য অন্য একটি বাঁশ) রয়েছে তবু বুক কাঁপতে লাগল বিনুর। আগে আর কখনও সাঁকো পার হয় নি সে।

অন্য সব ব্যাপারে যুগলের কাছে প্রচুর বীরত্ব দেখিয়েছে বিনু। কিন্তু সাঁকো পারাপারের কথায় তার মুখখানা ভারি করুণ দেখাল। মাথা নেড়ে আস্তে করে সে বলল, 'না।'

'আপনে কোন কামের না ছুটোবাবু। আসেন, আমার হাত ধইরা পার হইবেন।'

যুগলের হাত ধরে খাল পেরুতে পেরুতে তলার দিকে তাকাল বিনু। সাঁকোর অনেক নীচে অথৈ জল। একবার যদি হাত ফসকে যায়? যদিও সাঁতার শিখেছে, বুকের ভেতরটা ঢিব ঢিব করতে লাগল বিনুর।

ওপারে গিয়ে যুগল চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'কই গো বেবাইজা বেবাইজানীরা কই গেলা সগল? বাইর হও দেখি—'

যুগলের ডাকাডাকিতে নৌকোগুলোর ভেতর থেকে অদ্ভুত ধরনের জনকয়েক মেয়ে-পুরুষ বেরিয়ে এল।

সেদিন রাত্রিবেলা সুজনগঞ্জ থেকে ফেরার সময় মাঝনদীতে সেই বেদে-বহরটা সামনে পড়েছিল; একজন বেবাজিয়ার গলার আওয়াজও শোনা গিয়েছিল। কিন্তু অন্ধকারে তাদের স্পষ্ট দেখা যায় নি। আজ দিনের আলোয় জগতের বিচিত্র এক মানবগোষ্ঠীর দিকে অসীম বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল সে।

মেয়েগুলোর পরনে ইরানী নৌকোর পালের মতন চিত্র-বিচিত্র ঘাঘরা এবং খাটো খাটো জামা। রুক্ষ চুলে কাঠের কাকুই, টানা চোখে ছুরির ধার। হাত পায়ে মেহেদি মাখা। সারা গায়ে অঢেল উচ্ছৃঙ্খল যৌবন। পুরুষগুলির পরনে হয় ডোরাকাটা লুঙ্গি, নতুবা কুঁচি দেওয়া ঢোলা পা-জামা। মাথায় ধনেশ পাখির পালক গোঁজা। সারা গায়ে তাদের উল্কির আঁকিবুকি। পাখি, সাপ, গরু, ছাগল—কত রকমের ছবি যে আঁকা!

মেয়ে হোক পুরুষ হোক, সবাই অত্যন্ত নোংরা, অপরিচ্ছন্ন। তাদের চিটচিটে পোশাক থেকে দুর্গন্ধ উঠে আসছে। মুখটুখ ধোবার বোধহয় অভ্যাস নেই; দাঁতের ওপর এক ইঞ্চির মতন পুরু হলুদ রঙের সর পড়ে আছে। হাত-পায়ের নখ বড় বড়—সেগুলোর মাথা খানিক ভেঙেছে, খানিক ক্ষয়ে গেছে।

যুগল বলল, 'তোমরা রাইজদিয়া আসলা কবে?'

একটি বেদেনী উত্তর দিল, 'আজই; বিহান বেলায়—'

'থাকবা কয় দিন?'

'চকিদারে (চৌকিদারে) যা বাইন্ধা দিছে হেই আড়াই দিন। হের বেশি তো থাকনের উপায় নাই।'

'হ। হে তো ঠিক কথাই।' যুগল মাথা নাড়ল। তারপর চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলল, 'সগলরে দেখতে পাই; কিন্তুক এই বহর যার হেই আঞ্জুমান বেবাইজানীরে তো দেখি না। হ্যায় গেল কই?

'এই যে আমি—'পেছন দিক থেকে চিলের মতন তীক্ষ্ণ সরু গলায় কেউ চেঁচিয়ে উঠল।

মুখ ফেরাতেই বিনু দেখতে পেল, সবচাইতে বড় নৌকোটার গলুইতে একটা বুড়ি দাঁড়িয়ে আছে। চুলগুলো পাটের ফেঁসোর মতন লালচে, জট পাকানো। গায়ের চামড়া কুঁচকে কুঁচকে শিথিল। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, ঢিলে একটা খোলসই বুঝি পরে আছে। সারা গায়ে বেবাজিয়া পুরুষদের মতন উল্কি এবং রুপোর ভারী ভারী গয়না—পৈছা, তেঁতুলপাতাহার, চুটকি, কানের চাকতি।

এত বয়েস হয়েছে তবু চোখের দৃষ্টি আশ্চর্য সজীব। যেমন ধারাল তেমনি দূরভেদী। চিকণ তীরের মতন তা বুঝি বুকের ভিতরে বিঁধে যায়।

যুগলও ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। এক মুখ হেসে বলল, 'আরে, এই যে তুমি! আছ কেমুন?'

আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী বলল, 'ভালই।' বলেই ভুরুর ওপর হাত রেখে শুধলো, 'তুমি কেউগা (কে)? চিনা-চিনা (চেনা-চেনা) লাগে—'

'আমার নাম যুগল—'

'যুগল!' চোখমুখ কুঁচকে স্মৃতির ভেতর কিছুক্ষণ হাতড়ে বেড়াল আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী। তারপর বলল, 'তোমারে কই দেখছি কও তো বাসী—'

যুগল বলল, 'হ্যামকত্তার বাড়িত্। আমি তেনার (তাঁর) ঐখানে কামলা খাটি।'

'হ-হ, এইবার মনে পড়ছে।' চোখের তারায় হঠাৎ যেন আলো খেলে গেল আঞ্জুমান বেবাজিয়ানীর। সাগ্রহে শুধলো, 'হ্যামকত্তায় কেমুন আছে?'

যুগল বলল, 'ভাল, হ্যামকত্তায় কোন সময়ে মোন্দ থাকে না।'

দেখা যাচ্ছে, এই ভবঘুরে যাযাবরের দলও হেমনাথকে চেনে। বিনু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার চোখ এসে পড়ল বিনুর ওপর। কিছুক্ষণ পলকহীন তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'অ যুগলা এই পোলাগা (ছেলেটা) কে?'

যুগল বলল, 'হ্যামকত্তার নাতি।'

'তাই নিহি?'

'হ।'

'কেমুন নাতি? আমি জানতাম হ্যামকত্তার পোলা-মাইয়া নাই। তয় এই নাতিখান আইল কই থনে?'

আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী সোজা সহজ হিসেবটাই ধরে নিয়েছে। অর্থাৎ ছেলে-মেয়ে থাকলে তবেই তো নাতি-নাতনীর সম্ভাবনা। যার নেই তার ওসব আসবে কোত্থেকে? আকাশ থেকে নিশ্চয়ই পড়তে পারে না।

বিনুর সঙ্গে হেমনাথের সম্পর্কটা বুঝিয়ে দিল যুগল।

আঞ্জুমান বলল, 'হেই কও। ভাগ্নীর পোলা। কিন্তুক—'

'কী?'

'আমরা তো বচ্ছর বচ্ছর রাইজদিয়া আসি। আইলেই হ্যামকত্তার বাড়িত্ যাই। কিন্তুক তেনার (তাঁর) ভাগ্নী, ভাগ্নীর ঘরের নাতি-নাতকুড়েরে তো দেখি নাই।'

যুগল বলল, 'দেখবা কেমনে? ওনারা তো এইখানে এই পরথম আইল।'

আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী শুধলো, 'আগে আছিল কই?'

বিনুরা কোথায় ছিল, যুগল জানিয়ে দিল।

এবার বিনুর দিকে ফিরে আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী সস্নেহে ডাকল, 'আসো গো ভাই, আমাগো নায়ে আসো—

দেশ-দেশান্তরের বেদেদের সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অনেক গল্প শুনেছে বিনু। আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী ডাকতে তার বুকের ভেতরটা গুরগুর করে উঠল। নিজের অজান্তে সে গিয়ে দাঁড়াল যুগলের পেছনে। ভীরু গলায় বলল, 'না।'

'এইটা কেমুন কথা হইল! তুমি আমাগো হ্যামকত্তার নাতি। এই তরি (এখান পর্যন্ত) আইসা বইরে না আইলে মন নি ভাল লাগে? আসো—আসো, এট্টু মিঠাই খাইয়া যাও। তোমার নানার (দাদুর) বাড়িত্ গিয়া আমরা কত কী খাইয়া আসি। কত আদর-যত্ন পাই।'

বিনু উত্তর দিল না; চুপ করে থাকল। তার মনোভাব বুঝতে পেরেছিল যুগল। বলল, 'আপনে কইলকাতার পোলা, বেবাইজা দেইখা ডরান?'

বিনু এবারও চুপ।

যুগল বলল, 'অরা চিনা মানুষ। লন যাই আহ্লাদ কইরা ডাকলে যাইতে হয়।

ভয়ও হচ্ছিল, আবার বেদেবহর সম্বন্ধে অপার কৌতূহলও বোধ করছিল বিনু। সেদিন সুজনগঞ্জ থেকে ফেরার সময় হেমনাথ জানিয়েছিলেন, এই জলের দেশে বেবাজিয়ারা নৌকোয় নৌকোয় ভেসে বেড়ায়। নৌকোতেই তাদের ঘর-সংসার। এখানে শিশু জন্মায়, বুড়োরা মরে। যৌবন অসীম সম্ভাবনায় এখানেই পুষ্পিত হয়ে ওঠে। জগতের বিচিত্র ভাসমান এই মানবগোষ্ঠী নৌকোর ওপরেই জীবনের ধারা অব্যাহত রাখে। শোক-দুঃখ, সুখ-আনন্দ, জন্ম-মৃত্যু— জীবনের এমন কোন লীলাই নেই যা পাঁচ-সাতখানা হাজার মণী বিশাল নৌকোর মধ্যে ঘটে না যায়।

আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী আবার ডাকল, 'আসো গো হেমকত্তার নাতি। আমাগো ঘর-গিরস্থালী দেইখা যাও। ডরের কিছু নাই—'

বুড়ী বেদেনী কি অন্তর্যামী? বেদেবহরের ভেতরটা দেখার খুবই ইচ্ছা, তবু

নিজের থেকে বিনু হয়তো যেত না। যুগলই একরকম জোর করে তাকে বেদে-বহরে নিয়ে তুলল।

আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী শুধলো, 'আগে কী করবা কও?'

বেদেনী কী বলতে চায়, বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকল বিনু।

আঞ্জুমান এবার বুঝিয়ে দিল, 'আগে পান-তামুক-মিঠাই খাইবা, না আমাগো ঘর-গিরস্থালি দেখবা?'

বিনু বলল, 'পান-তামাক আমি খাই না।'

বুড়ী বেদেনী বেশ রঙ্গিণী। কপালে একটা চাপড় মেরে বলল, 'আ আমার কপাল!'

ভয়ে ভয়ে বিনু শুধলো, 'কী হল?'

রসালো কৌতুকের গলায় আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী বলল, 'পান খাও না, তামুক খাও না, কেমনতরো পুরুষ তুমি!' বলতে বলতে বাদামী ভুরুর তলায় তার নীলচে চোখের মণি খাঁচার পাখির মতন ছটফট করতে লাগল।

বিনু এবার আর কিছু বলল না। তার মুখ-চোখ দেখে আঞ্জুমান কী-বুঝল কে জানে। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'থাউক থাউক, পান-তামুক খাইতে হইব না।' বলতে বলতে আঙুলের ডগায় বিনুর থুতনিটা তুলে অল্প অল্প নাড়তে, লাগল,'অখনও মোচ গজায় নাই; এক্কেরে পোলাপান। আগে দাড়ি-মোচ গজাউক, পুরুষমানুষ হও। হের পর পান-তামুক খাইও। অহন মিঠাই-ই খাও।'

শুধু মিঠাই না, পাকা অমৃতসাগর কলা আর ক্ষীরাইও বিনুদের খেতে দিল আঞ্জুমান। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে সারা বহর ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে নিজেদের ঘর-সংসার দেখাতে লাগল।

মোট সাতখানা নৌকো। কোন নৌকোয় শুধু সাপের ঝাঁপি। ছোটবড়, চৌকো-গোল—নানা আকারের অগণিত বেতের ডালা পর পর সাজানো। সেগুলোর ভেতর অসংখ্য রকমের সাপ—শঙ্খচূড়, কালজাতি, দুধরাজ, খরিস, লাউডগা, পাহাড়ী অজগর, শামুকভাঙা, চন্দ্রবোড়া। আরো কত কি!

একেকটা ডালা খোলে আঞ্জুমান, আর বিদ্যুতচমকের মতন সাঁ করে সাপগুলো লেজের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়। লিকলিকে সরু জিভ বার করে ফণা দোলাতে দোলাতে কুটিল চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে ত্যাখে। আঞ্জুমান তাদের নাম-ধাম বংশ-পরিচয় মুখস্থ বলার মতন গড় গড় করে বলে যায়। সাপ দেখতে দেখতে এবং তাদের ইতিহাস শুনতে শুনতে বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছিল বিনুর।

কোন নৌকোয় শুধু বিছানা। কালো কুটকুটে শতরঞ্জি-জড়ানো কাঁথা বালিশের স্তূপ একেবারে ছইয়ের মাথা পর্যন্ত ঠেকেছে। একটা নৌকোয় এসে দেখা গেল, সেখানে শুধু পশু আর পাখি। ছাগল, গরু, খচ্চর, ভেড়া, গোটা দুই বাঁদর এবং অগুনতি খাঁচার ভেতর নানারকম পাখি—শালিক, ময়না, টিয়া, মোহনচূড়া, ঝুটকলি, সিদ্ধিগুরু, কোড়াল, এমন কি বাজও রয়েছে।

আঞ্জুমানের পিছু পিছু ঘুরতে ঘুরতে শেষ নৌকোখানায় এসে পড়ল বিনুরা। বেবাজিয়া বহরের এটাই সবচাইতে ছোট নৌকো। আঞ্জুমান বলল, 'এইটা আমাগো পান্‌হা ঘর—'

আঞ্জুমানকে অনেকক্ষণ দেখছে। বুড়ী বেদেনীর সহজ আন্তরিক ব্যবহারে ভয় কেটে গিয়েছিল। বিনু শুধলো, 'পান্‌হা ঘর কী?'

'ত্যাখো—' সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল আঞ্জুমান।

দেখা গেল, উঁচু একটা বেদীর ওপর মাটির সপ্তনাগ। তার মাথায় দেবী মনসার সিংহাসন। এমন মনসা-মূর্তি আগে আর কখনও ত্যাখে নি বিনু। মাথার পেছন দিকে বরুণ ছত্র ধরেছে কালীয় নাগ। থরিস আর শঙ্খচূড় সাত লহর হার হয়ে বুকের কাছে ঝুলছে। মণিবন্ধে কঙ্কণ হয়েছে খৈজাতি। দেবীর সুডৌল বক্ষকুম্ভ কাঁচুলি হয়ে ঢেকেছে চক্রচূড় আর উদয়নাগ। লাউডগা আর কালচিতি, চন্দ্রবোড়া আর গোক্ষুর বুনে বুনে ঘাঘরা বানানো হয়েছে। দেবীর কটিতট থেকে তা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, আঙুলে আঙুলে অঙ্গুরী হয়েছে সুতোশঙ্খ। পায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে মল হয়েছে দাঁড়াস। কর্ণভূষণ হয়ে দোদুল দুলছে সাদাচিতির ফণা। দেবীর চোখে বিষের কাজল, নিশ্বাসে গরল ঝরছে যেন।

মনসামূর্তির সামনে অনেকগুলো ধুনুচি; সেগুলো থেকে ধূপের গন্ধ উঠে আসছে। খানকতক পেতলের সরাও চোখে পড়ল; তাতে কাঁচা দুধ আর সবরি কলা সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী বলল, 'এইটাই আমাগো আসল জায়গা। মনসার ঘরে আমরা কোন পাপ করি না; শত্তুরও যদি এইখানে আইসা আশ্‌শয় লয় তার গায়ে হাত তুলি না। রোজ সন্ধ্যায় মনসার নামে এইখানে ছদ্‌গা (উৎসর্গ) হয়। আমরা বেবাইজা মাইয়ারা তখন ল্যাংটা হইয়া ধূপতি (ধুনুচি) নাচ নাচি। 'ছদ্‌গা'র সময় পুরুষমানুষ এই ঘরে আসতে পারে না।'

সবটা বুঝতে না পারলেও বিনু এটুকু বুঝল, এই পান্‌হা ঘর বেদেদের কাছে

অতি পবিত্র জায়গা। এখানে এমন কিছু তারা করে না যা অশুচি, যা অন্যায়, যা ধর্মবিরুদ্ধ।

আরো কিছুক্ষণ গল্প-টল্প করার পর যুগল হঠাৎ বলল, 'অনেকখানি সময় তোমাগো এইখানে কাটাইয়া গেলাম। এইবার আমরা যাই।'

আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী বলল, 'আইচ্ছা—'

'আমাগো বাড়িত্ যাইবা তো?'

'নিয্যস যামু। রাইজদিয়ায় আইসা হ্যামকত্তার বাড়িত্ যামু না, আমার ঘাড়ে কয়টা মাথা! হেয়া (তা) ছাড়া—'

'কী?'

'কইলকাতা থনে তেনার নাতি আইছে, নাতনী আইছে, ভাগ্‌নী আইছে। যাইতে আমাগো হইবই। বিকালে যামু।'

'আইচ্ছা। এইবেলা ছোটবাবুরে কিছুই দেখাইলা না। ঐবেলা গিয়া সাপখেলা দেখাইবা কিলাম।'

'দেখামু।'

'মনসার গান শুনাইবা—'

'শুনামু।'

বিনু এইসময় বলে উঠল, 'যাবে কিন্তু। নিশ্চয়ই যাবে।'

কিছুক্ষণ পর বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে বেদেদের সম্বন্ধে আরো কিছু চমকপ্রদ খবর দিল যুগল। এরা অদ্ভুত জাত। মনসা পুজোও করে, আবার কেউ কেউ নামাজও পড়ে। অনেক খৃস্টানও এখানে এসে জুটেছে। সাপখেলা, বাঁদরখেলা ছাগলখেল, নানারকম শারীরিক কসরত এবং ভেল্কিবাজি দেখিয়ে ওরা পয়সা রোজগার করে। তা ছাড়া সাপে কামড়ালে ওঝাগিরিও করে। কিন্তু এসব দিনের আলোর ব্যাপার। রাতের অন্ধকারেই ওদের আসল খেলা—সেটা হল চুরি। যেখানে বেবাজিয়া বহর ভেড়ে সে জায়গায় বাসিন্দাদের চোখ থেকে ঘুম যায়; সর্বক্ষণ তারা তটস্থ অস্থির হয়ে থাকে।

আঞ্জুমান বেবাজিয়ানীরা এসেছে। রাজদিয়াতে এবার চুরির ধুম পড়ে যাবে।

বিকেলবেলা সত্যি সত্যিই আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী হেমনাথের বাড়ি এল। তার সঙ্গে এসেছে দুটো যুবতী বেদেনী। আঞ্জুমান এবং তার সঙ্গিনীদের মাথায় পর পর সাজানো অনেকগুলো করে সাপের ঝাঁপি।

বাগান-টাগান পেছনে ফেলে বার-বাড়ির উঠোনে পা দিয়েই আঞ্জুমান

বেবাজিয়ানী চিলের মতন সরু গলায় চেঁচিয়ে উঠল 'কই গেলা সগলে—'

বেদেনীরা যে আসবে সে খবর বাড়ি ফিরে ওবেলাই দিয়ে রেখেছিল বিনু। আঞ্জুমানের গলা পেয়ে সুরমা, সুধা, সুনীতি, স্নেহলতা, বিনু কিংবা যুগল—কেউ আর ঘরে বসে থাকতে পারল না। এ-ঘর থেকে ও-ঘর থেকে ছোটাছুটি করে বেরিয়ে এল।

মাথা থেকে সাপের ঝাঁপি মাটিতে নামাল আঞ্জুমান। তারপর স্নেহলতার দিকে ফিরে বলল, 'আইলাম গো বইনদিদি—' বলে হাসল।

স্নেহলতাও হাসলেন, 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'আইজই আমরা রাইজদিয়া আইছি।'

'শুনেছি।'

আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী বলতে লাগল, 'অন্য সগল বার এইখান থনে (থেকে) যাওনের দিন আপনেগো বাড়িত আসি। এইবার কিলাম পরথম দিনই আইলাম।'

স্নেহলতা উত্তর দিলেন না; হাসিটুকু তাঁর ঠোঁটে স্নিগ্ধ আভার মতন লেগে রইল।

আঞ্জুমান আবার বলল, 'এইবার রাইজদিয়া আইসা আমি আটাশ (অবাক)।'

স্নেহলতা উৎসুক হলেন, 'কেন?'

'বিহান বেলায় আপনেগো যুগলার লগে এউক্‌টা সোন্দর ফুটফুইটা পোলা আমাগো বহরে গেছিল। শুনলাম পোলাগা (ছেলেটা) নিহি আপনের নাতি। শুইনা আমার ধন্দ লাইগা গেল।'

'কেন?'

'আমি তো জানতাম আপনেগো পোলা, মাইয়া নাই। নাই-ই যদি নাতিখান আইল কই থনে? শ্যাষে যুগলাই কইল, পোলাগা আপনের ভাগ্‌নীর ঘরের। কইলকাতা থনে আইছে।'

স্নেহলতা মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ।'

আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী বলল, 'বিহান বেলায় নাতি গিয়া কইল সাপের খেলা দেখব; আমাগো আইতেও কইল। বড় মুখ কইরা নাতি দাওয়াত কইরা আইছে; হেই লেইগা পরথম দিনই আইলাম।'

'ভাল করেছ।'

টিয়াপাখির মতন লাল টুকটুকে ঠোঁট নেড়ে আঞ্জুমান বলল, 'মেলা

(অনেক) কথা তো হইল। এইবার ভাগ্‌নী ভাগ্‌নী-জামাই দেখান। নাত্তিরে দেখছি, নাতিন (নাতনী) দেখান।'

স্নেহলতা বললেন, 'ভাগ্‌নী-জামাই তো দেখাতে পারব না। ক'দিন হল সে কলকাতায় গেছে। অন্য সবাই আছে, তাদের দেখাচ্ছি।'

সুরমা-সুধা এবং সুনীতির সঙ্গে আঞ্জুমানের আলাপ-টালাপ করিয়ে দিলেন স্নেহলতা।

আঞ্জুমান বলল, 'সগলের লগে আলাপ-সালাপ হইল; ভাগ্‌নী-জামাইরেই খালি দেখলাম না। আ আমার কপাল!' বলতে বলতে তার চোখ সুরমার ওপর স্থির হল, 'আ গো বইনদিদি—'

স্নেহলতা তক্ষুনি সাড়া দিলেন, 'কী বলছ?'

'ভাগ্‌নী আমাগো এমুন কাহিল ক্যান? শরীলখানে কিচ্ছু নাই; য্যান (যেন) ফু দিলে উড়ব।'

'হ্যাঁ; ও ভারি রোগা। শরীরটা একেবারেই সারছে না। ওকে নিয়ে আমাদের বড্ড ভাবনা।'

একটু চুপ করে থেকে আঞ্জুমান বলল, 'বাতাস লাগছে মনে লয়।'

স্নেহলতা প্রায় হতাশার সুরেই বললেন, 'কী জানি; ক' বছর ধরেই তো এরকম চলছে। ডাক্তার-কবিরাজ ওষুধ-বিষুধ বারোমাস লেগেই আছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।'

আঞ্জুমান বলল, 'ভাগ্‌নীরে একখান শিকড় দিয়া যামু; তামার তাবিজে ভইরা ভাগ্‌নীর কমরে (কোমরে) পরাইয়া দিয়েন। সাইরা যাইব।'

'আচ্ছা।'

এবার সুধা-সুনীতিকে ভাল করে লক্ষ্য করল আঞ্জুমান। বলল, 'কপালে সিন্দুর নাই; নাতিন দুগা অবিয়াত মনে লাগে—'

'হ্যাঁ।'

'নাতিনগো বিয়ার সময় দাওয়াত য্যান পাই।' বলেই সুধা-সুনীতির কাছে গিয়ে হাত ঘুরিয়ে ছড়া কাটল,

'আইবা নি ভাই, যাইবা নি—
নাতিন খাওয়াইব সাধের মেজবানি!'

বেদেনীর রকমসকম দেখে সুধা-সুনীতি খিল খিল করে হেসে উঠল।

স্নেহলতা বললেন, 'নেমন্তন্ন তো করব; তোমাদের পাব কোথায়? ঘরদুয়ার কি কিছু আছে তোমাদের? সারা বছর শুধু ভেসে ভেসেই বেড়াও—'

'কাক-পক্ষীর কাছে খবর দিয়া দিয়েন ; ঠিক উড়াল দিয়া আইসা পড়ুম।' আঞ্জুমান হাসতে লাগল।

খানিক নীরবতা।

তারপর আঞ্জুমানই আবার শুরু করল, 'সগলের লগে দেখাশুনা হইল ; হ্যামকত্তারেই খালি দেখি না। তেনি কই ?'

স্নেহলতা বললেন, 'দুপুর বেলা আবদুলাপুর গেছে।'

'ফিরলে আমাগো কথা কইয়েন।'

'বলব।'

'পারলে আমাগো বহরে য্যান যায়।'

'আচ্ছা।'

আঞ্জুমান বলল,'আলাপ সালাপ হইয়া গেল। এইবার আমাগো পান-তামুক খাওয়ান গো বইনদিদি—'

তার মুখ থেকে কথা খসবার আগেই যুগল আর করিম ছুটে গিয়ে তামাকের ডিবে, পানের ডাবর, আগুনের মালসা, হুঁকো-টুকো নিয়ে এল। তারপর তামাক সেজে হুঁকোর মাথায় কলকে বসিয়ে আঞ্জুমানের হাতে দিল। আঞ্জুমান এবং তার দুই সহচারী পালা করে তামাক খেতে লাগল ; আয়েশ করে নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

বিনু অবাক হয়ে গিয়েছিল। বেদেনী হলেও আঞ্জুমানেরা মেয়েমানুষ। আগে আর কখনও মেয়েমানুষকে তামাক খেতে ত্থাখে নি বিনু। পায়ে পায়ে যুগলের কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাকল, 'এই—'

যুগল মুখ ফেরাল, 'কী ক'ন ?'

ফিস ফিস গলায় বিনু বলল, 'ঐ দেখ, বেবাজিয়ানীরা তামাক খাচ্ছে।'

বিনু ঠিক কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে যুগল তাকিয়ে থাকল।

পরে খুব সহজ গলায় যুগল বলল, 'খাইব না ক্যান ? নিশার (নেশার) জিনিস সগলেই খাইতে পারে। তার পুরুষমানুষ মাইয়ামানুষ নাই। খালি কি এই বাইদানীরাই—কামারপাড়ায়, যুগীপাড়ায় ঘুইরা ত্থাখেন গা ; সগল বাড়িতেই দুগা চাউরগা (দু-চারটে) কইরা মাইয়ামানুষ হুক্কা খায়।'

যত সহজে যুগল কথাগুলো বলল ঠিক তত সহজে মেনে নিতে পারল না বিনু। আবার কী বলতে যাচ্ছিল সে, ঠিক সেইসময় সাপের ঝাঁপি খুলল বেদেনীরা। তিনটে ঝাঁপি থেকে তিনটে কালকেঁউটে বিদ্যুতের মতন সাঁ করে লেজের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল।

এদিকে একটা বেদেনী তুমড়ি বাঁশি বার করে বাজাতে শুরু করেছে। বাঁশির তালে তালে সাপ তিনটে ফণা দোলাতে লাগল।

একজন বাঁশি বাজাচ্ছে। সাপের নাচের সঙ্গে সঙ্গে আঞ্জুমান সরু গলায় সুর করে গান ধরল—

চান্দ্ রাজার দাপট গেল বাতাসে মিশিয়া—

তৃতীয় বেদেনীটি গাইল—

হায় বিষহরির দোয়া !

আঞ্জুমান এক কলি করে গায়। তৃতীয় বেদেনীটি, 'হায় বিষহরির দোয়া' বলে ধুয়ো ধরে। এইভাবে গান চলতে লাগল।

বেউলা সতী কান্দে শোন আলুথালু হইয়া—

হায় বিষহরির দোয়া।

কালনাগিনী খাইল আজি সোনার লখাইরে—

হায় বিষহরির দোয়া।

সোনার অঙ্গ ভাসাইল গাঙুনীর নীরে –

হায় বিষহরির দোয়া।

তাহার দোয়ায় সূয্যি ওঠে পুবের আকাশে –

হায় বিষহরির দোয়া !

পরান পাইয়া ভেলায় বইসা লখাই হাসে –

হায় বিষহরির দোয়া !

গান চলছে। তার মধ্যেই যুগল ডেকে উঠল, 'ছুটোবাবু।

চোখকান ধ্যান-জ্ঞান বেদেনীদের দিকে রেখে সাড়া দিল বিনু।

যুগল শুধলো, 'এইটা কী গান জানেন ?'

'না।'

'ভাসানের গান। মা মনসা আছে না ?'

'হ্যাঁ।'

'মনসার গানেরে ভাসানের গান কয়। মনে কইরা রাইখেন।'

বিনু মাথা হেলিয়ে দিল ; মুখে কিছু বলল না।

যুগল আবার বলল, 'অহন থনে আপনেরা তো এই হানে থাকবেন। শাওন (শ্রাবণ) মাসের শ্যাষে যহন মনসা পূজা হইব তহন ঘরে ঘরে ভাসানের গান শুনতে পাইবেন।'

'তাই নাকি ?'

'হ।'

গান-টানের পর সাপ খেলা দেখিয়ে ক্ষীর-মুড়কীর ফলার করল বেদেনীরা। আরেক প্রস্থ পান-তামাক খেল। তারপর বখশিশ হিসেবে একডালা ধান, চার আনা পয়সা, কিছু আনাজপাতি আদায় করল।

পান চিবুতে চিবুতে আঞ্জুমান বলল, 'এইবার যাই গো বইনদিদি—'

স্নেহলতা বললেন, 'এখনই যাবে?'

'হ। চকিদারে (চৌকিদার) থাকতে তো দিব আড়াই দিন। এইর ভিতর রাইদিয়ার সগল বাড়িত্ যাইতে হইব। বাড়ি তো আর এউক্কা দুগা (একটা দুটো) না—'

বেবাজিয়ানীরা সাপের ঝাঁপি, ধানের ডালা-টালা মাথায় চাপিয়ে উঠে দাঁড়াল।

স্নেহলতা বললেন, 'আবার এসো।'

আঞ্জুমান বলল, 'এইবার আর আসন হইব না বইনদিদি; আইতে আইতে হেই ফিরা (আগামী) বচ্ছর।'

হঠাৎ সেই কথাটা মনে পড়ে গেল স্নেহলতার। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'চলে তো যাচ্ছ, ভাগ্নীকে শিকড় দিয়ে গেলে না?'

'আমার লগে তো নাই। নায়ে (নৌকায়) আছে। যুগলারে আমার লগে পাঠাইয়া দেন, দিয়া দিমু'অনে।'

আঞ্জুমানদের সঙ্গে যুগলকে বেদেবহরে পাঠিয়ে দিলেন স্নেহলতা।

॥ পাঁচ ॥

অবনীমোহন বলেছিলেন, দিন সাতেকের ভেতর কলকাতার সব ব্যবস্থা করে ফিরে আসবেন। ফিরতে ফিরতে দু সপ্তাহ কেটে গেল।

সন্ধ্যেবেলা পুবের ঘরের তক্তপোষে সুধা-সুনীতি-বিনু এবং ঝিনুক গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পড়তে বসেছিল। তাদের সামনে দুটো ঝকঝকে হারিকেন।

হেমনাথও এই ঘরেই আছেন। তক্তপোষের ধার ঘেঁষে একটা ক্যাম্প খাট। তার ওপর কাত হয়ে শুয়ে মূল বাল্মীকি রামায়ণ পড়ছেন।

সময়টা অঘ্রানের মাঝামাঝি। নিয়ম অনুযায়ী পৌষ থেকে শীত শুরু। নিয়ম

যা-ই থাক, এ বছর শীতের যেন আর তর সইছে না। তার বড় তাড়া। হেমন্ত থাকতে থাকতেই সে এসে দরজায় দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করেছে। ক'দিন ধরেই এলোমেলো উত্তুরে বাতাস ছেড়েছে। আজ যেন সেটা হিমালয়ের বরফ ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসছে। কাছেই বিনুরা চাদর বা কম্বল, যে যা পেয়েছে তাই জড়িয়ে পড়তে বসেছে।

সময়টা কৃষ্ণপক্ষ। বাইরে যতদূর চোখ যায় চাপ চাপ অন্ধকার। চাঁদটা আজ নিরুদ্দেশ। আকাশ, পুকুর বা ধানখেত—কিছুই বোঝা যায় না। সব অদৃশ্য, নিরবয়ব। শুধু কাছাকাছি যে জোনাকিরা উড়ছিল তাদের দেখা যাচ্ছে। আলোর ছুঁচের মতন এই পোকাগুলো অন্ধকারকে বিঁধে বিঁধে যাচ্ছিল।

হঠাৎ বাইরের উঠোন থেকে অবনীমোহনের গলা ভেসে এল, 'বিনু, সুধা —কে আছিস রে, একটা আলো-টালো নিয়ে আয়। বড্ড অন্ধকার—'

বিনু তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। তারপর চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'বাবা এসেছে, বাবা এসেছে—'

সুধা-সুনীতি সামনের হারিকেন দুটো নিয়ে বাইরে ছুটল। হেমনাথও রামায়ণ রেখে ব্যস্ত গলায় ডাকাডাকি শুরু করলেন, 'কোথায় গো, কোথায় গেলে সব! অবনী এসেছে—' বলতে বলতে বাইরে এলেন। তাঁর পিছু পিছু ঝিনুকও এল।

চেঁচামেচি শুনে রান্নাঘরের দিক থেকে স্নেহলতারাও ছুটে এলেন।

উঠোনের মাঝখানে অবনীমোহন দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর পেছনে তিন-চারটে কুলী। কুলীদের মাথায় গন্ধমাদন চাপানো।

হেমনাথ বললেন, 'বড্ড ঠাণ্ডা। এসো এসো—ঘরে এসো অবনী—'

আলো দেখিয়ে অবনীমোহনকে ঘরে আনা হল। কুলীরা বারান্দায় মালপত্র নামিয়ে ভাড়া-টাড়া নিয়ে চলে গেল।

এখন সবাই অবনীমোহনকে ঘিরে বসে আছে। স্নেহলতা বললেন, 'তুমি কেমন মানুষ বল তো অবনী। সাতদিনের নাম করে গিয়ে চোদ্দদিন কাটিয়ে এলে। না একটা খবর, না একটা কিছু।'

অবনীমোহন অপ্রতিভের মতন হাসলেন, 'ঝামেলা মেটাতে মেটাতে দেরি হয়ে গেল।'

হেমনাথ বললেন, 'আজ যে আসবে আগে জানালে না কেন? লালমোহন কি ভবতোষের ফীটন নিয়ে স্টিমারঘাটায় যেতাম। স্টিমারঘাটা থেকে আমাদের বাড়ি তো একটুখানি পথ নয়। শুধু শুধু কষ্ট করতে গেলে।'

অবনীমোহন বললেন, 'ভেবেছিলাম চিঠি লিখে জানাব, তারপর কেমন যেন আলস্য লেগে গেল। লিখি লিখি করে আর লেখা হল না।'

সুরমা এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন। এবার মুখ বাঁকালেন, 'চিরদিন ঐ এক স্বভাব।'

অবনীমোহন হাসতে লাগলেন।

একটু নীরবতা। তারপর হেমনাথ বললেন, 'কলকাতার সব কাজ হয়ে গেছে তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আর যাবার দরকার নেই?'

'আজ্ঞে না। সমস্ত ঝঞ্ঝাট চুকিয়েই এসেছি।'

খানিক ভেবে হেমনাথ এবার শুধোলেন, 'তারপর বল, কলকাতায় গিয়ে কী দেখলে। ওখানকার হালচাল কী?'

অবনীমোহন নড়েচড়ে বসলেন। তাঁকে রীতিমত উত্তেজিত দেখাল। বললেন, 'বাড়ি ফিরেই আপনাকে খবরটা দেব, তা নয়। কথায় কথায় একেবারে ভুলে গেছি।'

হেমনাথ উৎসুক হলেন, 'কী খবর?'

'আপনি যা ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, অক্ষরে অক্ষরে তা মিলে গেছে মামাবাবু।'

'কিরকম, কিরকম?'

'সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। ইওরোপের যুদ্ধ বাংলাদেশের দিকে ছুটে আসছে। পরশুদিন রাত্তিরে কলকাতায় প্রথম ব্ল্যাক-আউটের মহড়া হয়ে গেল। ট্রেঞ্চ খুঁড়ে খুঁড়ে শহরটার যা অবস্থা করেছে! পনের ষোল দিনের খবর-কাগজ এনেছি। পড়লেই বুঝতে পারবেন—'

উত্তেজনায় হেমনাথের গলা কাঁপতে লাগল, 'কোথায় খবর-কাগজ?'

'আমার স্যুটকেসে—'

অবনীমোহন উঠতে যাচ্ছিলেন; বাধা পড়ল। স্নেহলতা বললেন, 'উঁহু-উঁহু, এখন না। যুদ্ধ নিয়ে মাতলে রাত কাবার হয়ে যাবে। ট্রেনে-স্টিমারে দু'দিন কাটিয়ে এসেছে ছেলেটা; আগে হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিক। তারপর ওসব হবে।'

হেমনাথ তক্ষুনি সায় দিলেন, সেই ভাল, সেই ভাল। যাও অবনী; তাড়াতাড়ি খাওয়া-টাওয়া সেরে নাও।'

সারা গায়ে দু'দিনের ক্লান্তি মাখা। আর আছে ঘাম, ট্রেন-স্টিমারের ধুলো। অবনীমোহন একেবারে স্নানই সেরে নিলেন।

হেমনাথের ধৈর্য থাকছিল না। পুবের ঘর থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমার চান হয়েছে অবনী?'

ওধারের কোন একটা ঘর থেকে অবনীমোহনের গলা ভেসে এল, 'হয়েছে।'

'তা হলে এখানে চলে এসো।'

'যাই মামাবাবু।'

অবনীমোহন আবার যখন পুবের ঘরে এলেন তখন তাঁর গায়ে দু'দিনের ধুলোবালি-ঘাম-মাখা পোশাক নেই। তার বদলে পাটভাঙা ধবধবে ধুতি আর হাফ শার্ট। চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। গালে, গলায় এবং ঘাড়ের কাছে এখনও ফোঁটা ফোঁটা জল। স্নানের পর ভাল করে মোছেন নি বোধহয়।

এবার হেমনাথ গলা তুলে স্ত্রীকে ডাকলেন, 'স্নেহ—স্নেহ—' এই বয়সেও স্ত্রীকে তিনি নাম ধরে ডাকেন।

রান্নাঘরের দিক থেকে স্নেহলতা সাড়া দিলেন, 'কী বলছ?'

'অবনীর খাবার এ ঘরে দিয়ে যাও।'

'আচ্ছা।'

একটু পরে স্নেহলতা এলেন। তাঁর এক হাতে কাঁসার থালা, তাতে ঘি-মাখানো চিড়ে ভাজা, নারকেল-কোরা আর দুটো চমচম সাজানো। আরেক হাতে চায়ের কাপ।

স্নেহলতা বললেন, 'এখন তোমাকে ভাত দিলাম না অবনী—'

অবনীমোহন বললেন, 'না-না, এখনই ভাত খাব কি; সবে তো সন্ধ্যে। এখন চা-ই খাই।'

হেমনাথ অধীর হয়েই ছিলেন। বললেন, 'খেতে খেতে কলকাতার কথা বল। যুদ্ধের হালচাল কি রকম দেখে এলে, শোনাও—'

চায়ে চুমুক দিয়ে অবনীমোহন বললেন, 'অবস্থা খুব খারাপ মামাবাবু। পরশুর আগের দিন রাত্তির থেকে কলকাতায় ব্ল্যাক আউট আর এয়ার-রেড প্রিকসানের মহড়া চলছে। চারদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব।'

'এ কথা তো তুমি তখন বললে।'

'বলেছি নাকি?'

'হ্যাঁ।' হেমনাথ ঘাড় কাত করলেন। সাগ্রহে শুধোলেন, 'তা মহড়াটা কি রকম হচ্ছে ?'

অবনীমোহন বলতে লাগলেন, 'সন্ধ্যের পর কলকাতার সব আলো নিভিয়ে সাইরেন বাজানো হয়। শকুনের কান্নার মতন কেঁপে কেঁপে একটানা সুর। তখন রাস্তায় কেউ থাকতে পারে না। হয় কাছাকাছি কোন বাড়ির ভেতর ঢুকে যেতে হবে। নইলে পার্ক টার্কের ট্রেঞ্চে গিয়ে লুকোতে হবে। তা না হলে এ-আর-পি'র লোকেরা ধরে নিয়ে যাবে। এক ঘণ্টা কি দু ঘণ্টা বাদে অল ক্লিয়ার বাজলে আবার বাইরে বেরুনো চলবে।'

তক্তপোষের একধারে বসে দম বন্ধ করে শুনে যাচ্ছিল বিনু, চোখে পলক পড়ছিল না। রাত্রিবেলা সব আলো নিভে যাবার পর নির্জন রাস্তায় একটানা কান্নার মতন কোন সুর যদি বাজতে থাকে, কলকাতা শহর কতখানি ভীতিকর হয়ে উঠতে পারে ? ভয়ের সে ছবিটা পুরোপুরি কল্পনা করতে পারল না বিনু, তবে তার গা ছম-ছম করতে লাগল।

হঠাৎ বিনু বলে উঠল, 'সাইরেন কী ?'

অবনীমোহন তার দিকে ফিরে বললেন, 'শত্রুদের বিমান আক্রমণের আগে হুঁসিয়ার করে দেবার জন্যে একরকম সুর বাজানো হয়, তাকে বলে সাইরেন।'

বিনুর কৌতূহল অসীম। সে আবার বলল, 'এ-আর-পি কাকে বলে ? ট্রেঞ্চ কী ?'

অবনীমোহন বুঝিয়ে দিলেন।

একটু চুপ।

তারপর হেমনাথের দিকে আবার ঘুরে অবনীমোহন বললেন, 'আপনি শেষ কবে কলকাতায় গিয়েছিলেন মামাবাবু ?'

এক মুহূর্তও না ভেবে হেমনাথ বললেন, 'নাইনটিন টোয়েন্টি ফাইভে—সেই যেবার দেশবন্ধু মারা গেলেন। উঃ, কলকাতায় সে শোকের দৃশ্য কোনদিন ভুলব না।' বলতে বলতে অন্যমনস্ক, বিষণ্ণ হয়ে গেলেন হেমনাথ। তাঁর চোখের সামনে শোকাচ্ছন্ন বিহ্বল মহানগর যেন ছবির মতন ফুটে উঠেছে।

অবনীমোহন বললেন, 'সেই কলকাতাকে এখন চিনতেই পারবেন না। পার্ক আর ফাঁকা জায়গা যেখানে যতটুকু পেয়েছে, ট্রেঞ্চ খুঁড়ে খুঁড়ে সর্বনাশ করে রেখেছে। শুধু কি ট্রেঞ্চ, প্রায় প্রত্যেকটা বাড়ির সদরে ব্যাফল ওয়াল তোলা হয়েছে, তার সামনে বালির বস্তার স্তূপ। স্টেশনে, সিনেমা হাউসে, রাস্তায়-ঘাটে—যেখানে যাবেন শুধু গভর্ণমেণ্টের পোস্টার।"

'কিসের পোস্টার ?'

'নানা রকমের। যেমন 'গুজবে কান দেবেন না', 'গুজব রটাবেন না'। 'দলে দলে সেনাবাহিনীতে নাম লেখান'। 'দেশের স্বার্থবিরোধী কাজ করলে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হবেন' ইত্যাদি ইত্যাদি।'

হেমনাথকে বেশ চিন্তিত দেখাল। কপাল জুড়ে এলোমেলো গভীর রেখা ফুটতে লাগল তার। ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমার কী মনে হয় অবনী ?'

'কী ব্যাপারে ?' অবনীমোহন জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

'কলকাতায় বোমা-টোমা পড়তে পারে ?'

'তার খুবই সম্ভাবনা।'

'কেমন করে বুঝলে ?'

অবনীমোহন বলতে লাগলেন, 'এই তো পরশুর আগের দিন এক সরকারী বড়কর্তা মিস্টার সেমগু রেডিওতে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। ফার ইস্টে অবস্থা যেভাবে ঘোরালো হয়ে উঠছে, তাতে কলকাতায় যে কোনদিন বিমান আক্রমণ ঘটতে পারে। নইলে—'

হেমনাথ শুধোলেন, 'নইলে কী ?'

'এত ব্ল্যাক-আউট, এত ট্রেঞ্চ খোঁড়াখুঁড়ি আর এয়ার রেড-প্রিকসানের ঘটা চলতে পারে।'

অন্যমনস্কের মতন হেমনাথ বললেন, তা তো বটেই। একটু চুপ করে থেকে গম্ভীর মুখে আবার বললেন 'যুদ্ধ বাংলাদেশে এসে হাজির হলে সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। সব ছারখার হয়ে যাবে। ওয়ারের আফটার এফেক্ট যে কী ভাবতেও শিউরে উঠছি।'

অবনীমোহন এবার আর কিছু বললেন না।

হেমনাথ বললেন, 'কলকাতায় আর কী দেখলে বল।'

'চারদিকে মিলিটারি ছাউনি পড়েছে। যেখানে যাবেন সেখানেই মিলিটারি। রাস্তাঘাটে যত গাড়ি দেখবেন তার বেশির ভাগই মিলিটারির—হেভি ট্রাক আর জিপের জন্যে হাঁটাই মুশকিল। মনে হয়, সমস্ত শহরটা মিলিটারির হাতে চলে গেছে।' বলতে বলতে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গেল অবনীমোহনের, 'আরেকটা ব্যাপার চোখে পড়ল মামাবাবু—'

উৎসুক সুরে হেমনাথ জানতে চাইলেন, 'কী ?'

'ব্যাঙের ছাতার মতন অলিতে-গলিতে ব্যাঙ্ক গজাচ্ছে। পুজোর আগে যখন

এখানে এলাম তখনও এত ব্যাঙ্ক দেখিনি। আমার তো ধারণা রোজ একটা করে ব্যাঙ্ক জন্মাচ্ছে।'

'যুদ্ধ বেধেছে, ইনফ্লেসন আরম্ভ হয়ে গেছে। ব্যাঙ্ক তো গজাবেই। দেখবে, টাকা এখন হাওয়ায় উড়তে থাকবে।'

'থাকবে কি, উড়তে শুরু করে দিয়েছে।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। হেমনাথ তাড়া লাগালেন, 'এবার খবর-কাগজ বার কর অবনী—'

হিন্দুস্থানী কুলিরা বারান্দায় বাক্স টাঙ্ক মালপত্তর নামিয়ে রেখে গিয়েছিল। অবনীমোহন বাইরে গিয়ে সুটকেস খুলে মাসখানেকের খবর-কাগজ বার করলেন।

কাগজগুলো হাতে পাওয়া মাত্র হেমনাথ ঝুঁকে পড়লেন। তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে লাগলেন, '২রা নভেম্বর। গ্রীসে ইতালীয় বাহিনীর অগ্রগতি। বৃটেন কর্তৃক টিরানায় রোমাবর্ষণ। তুরস্ক বর্তমানে যুদ্ধ বর্জন করিয়া চলিবে—প্রেসিডেন্ট ইনেন্থর ঘোষণা।'

'৩রা নভেম্বর। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মস্থান কেনসিংটন প্রাসাদ বোমাবিধ্বস্ত। জার্মানীর উপর প্রবল আক্রমণ—রাজকীয় বিমান-বহরের দাবী। জাপান হইতে আমেরিকানদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। রাষ্ট্রপতি আজাদ কর্তৃক কংগ্রেসের জরুরি অধিবেশন আহ্বান। ভারতরক্ষা আইনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গ্রেপ্তার, কারা প্রাচীরের অন্তরালে বিচার।'

'৪ঠা নভেম্বর। গ্রীসের সাহায্যার্থে বৃটিশ সেনাবাহিনীর অগ্রগতি। জাপান কর্তৃক শত্রুপক্ষের নৌবহর বাজেয়াপ্ত। জার্মান-অধিকৃত দেশগুলিতে—পোল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, চেকোশ্লোভাকিয়া, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ইত্যাদি ইত্যাদি—নাৎসীদের নিদারুণ অত্যাচার।'

'৫ই নভেম্বর। দারদানেলেস সমস্যার সমাধান, জার্মানীর মধ্যস্থতা। সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত ইটালীর সঙ্ঘর্ষের সম্ভাবনা তিরোহিত। ডানিয়ুব সম্মেলন। বৃটিশ নোটের উত্তরে সোভিয়েট বক্তব্য এইরূপ, 'আমরা এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিব।' মলোটভের ইঙ্গিতপূর্ণ বার্লিন পরিদর্শন। দীর্ঘ ছাপ্পান্ন দিন পর লণ্ডন-বাসীদের একটি বোমাবর্ষণহীন রাত্রি অতিবাহিত।'

'৬ই নভেম্বর। প্রতিরক্ষা বাহিনীর সম্প্রসারণ; ভারতবর্ষের যুদ্ধকালীন পরিকল্পনা। সমর-প্রস্তুতির প্রাথমিক ব্যয় তেত্রিশ কোটি টাকা। পরবর্তী প্রতি বছরে ব্যয় ষোল কোটি টাকা। অর্থের জন্য নতুন কর বসানো হইবে।'

'৭ই নভেম্বর। রুজভেল্ট তৃতীয় বারের জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত। পশ্চিমের মরু-রণাঙ্গনে বৃটিশ ট্যাঙ্কবাহিনী।'

'৮ই নভেম্বর। কালিনিনের সতর্কবাণী, রাশিয়া যুদ্ধ বর্জন করিয়া চলিবে। তবে কেহ তাহার সীমানা অতিক্রম করিতে চাহিলে চূর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে।'

'৯ই নভেম্বর। আয়ারল্যাণ্ড নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া চলিবে—ডি ভ্যালেরার ঘোষণা। টাওয়ার অফ লণ্ডন বোমাবিধ্বস্ত। সোভিয়েট বাহিনীর প্রস্তুতি ; সারা দেশে আপৎকালীন অবস্থা। ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওরাকিং কমিটির জরুরি সভা। রাজেন্দ্র প্রসাদ, কৃপালনী, গান্ধীজী, পন্থ, রাজা গোপালাচারী, প্রফুল্ল ঘোষ, শঙ্কর রাও দেও প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি।'

'১০ই নভেম্বর। ফুয়েরার কর্তৃক সর্বপ্রকার সমর-সম্ভার দিয়া মুসোলিনিকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত। পরলোকে চেম্বারলেন। মিউনিক প্যাক্টের জনক, ইতিহাসে যাঁহাকে 'গৌরবময় ব্যর্থতা' আখ্যা দেওয়া হইয়েছে, তিনি আর নাই। নর্থের পর এমন দুর্বল প্রধানমন্ত্রী বৃটিশ সাম্রাজ্যে আর কখনও দেখা যায় নাই।'

'১১ই নভেম্বর। আফ্রিকার মরু অঞ্চলে যুদ্ধ সম্প্রসারিত। গাবান রক্ষার্থে ফরাসী সিদ্ধান্ত। জেনারেল দ্য গলরে দৃঢ়তা।'

'১২ই নভেম্বর। হিটলার কর্তৃক বার্লিনে মলোটভের সংবর্ধনা। রুদ্ধদ্বার কক্ষে দীর্ঘ আলোচনার সময় রিবেনট্রপের উপস্থিতি। ফুয়েরার কর্তৃক অক্ষশক্তির প্রতি সোভিয়েট সাহায্য প্রার্থনা। সোভিয়েট সংবাদপত্রগুলি এ ব্যাপারে নীরব। লণ্ডনে জল্পনা-কল্পনা।'

'পূর্ব রণাঙ্গনে ভয়াবহ জাপানী আক্রমণ। হাইনান ও ফরমোসায় বিপুল সৈন্য সমাবেশ। সায়গান, ফরাসী ইন্দোচীন ও কামরন উপসাগরে অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা। সিঙ্গাপুরে চাঞ্চল্য।'

'১৭ই নভেম্বর। দীর্ঘ বিরতির পর লণ্ডনে প্রবলতম বোমাবর্ষণ, প্রচণ্ড নৈশ আক্রমণ। লণ্ডনবাসীদের ভূগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ।'

'১৮ই নভেম্বর। সর্দার প্যাটেল কারারুদ্ধ। সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে মামলা। ভুলাভাই দেশাই কর্তৃক সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত।'

হেমনাথ পড়ে যেতে লাগলেন।

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল বিনু। কোথায় টিরানা, কোথায় আড্রিয়াটিক সাগর আর এজিয়ান সাগর, কোথায় দারদানেলেস আর ডানিয়ুব এবং ইন্দোচীন—ভূগোলের কোন প্রান্তে এই নামগুলো ছড়িয়ে আছে কে বলবে।

বিমুর কল্পনা অতদূর পৌঁছয় না। কালিনিন কি রিবেনট্রপ, ডি ভ্যালেরা কিংবা টিমোশেঙ্কো, গোয়েবলস অথবা ইনেন্থ—এই সব নাম যাঁদের, তাঁদের চেহারা-গুলো কতখানি ভয়াবহ তাই বা কে জানে।

কাগজ পড়া শেষ করে হেমনাথ মুখ তুললেন। অবনীমোহনের উদ্দেশে বললেন, 'অবস্থা তা হলে রীতিমত ঘোরালোই হয়ে উঠেছে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।' অবনীমোহন মাথা নাড়লেন।

'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় রাশিয়া এই যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে পারবে?'

'কি জানি, বুঝতে পারছি না।'

খানিক চিন্তা করে হেমনাথ বললেন, 'চারদিকে যে রকম বেড়া আগুন তাতে রাশিয়া কতদিন গা বাঁচিয়ে থাকতে পারবে, সেইটেই হচ্ছে কথা। টার্কি বা আয়ারল্যাণ্ড নিউট্রাল থাকুক বা যুদ্ধে নামুক, তার গুরুত্ব তেমন নয়। কিন্তু রাশিয়ার মতন এত বড় দেশ যদি যুদ্ধে নামে-ওয়ারের চেহারাই যাবে বদলে।'

সংশয়ের সুরে অবনীমোহন বললেন, 'এই তো সেদিন রাশিয়ার রেভোলিউ-শন হয়ে গেল, এর মধ্যে যুদ্ধ করার মতন শক্তি কি ওদের হয়েছে?'

'একটা ব্যাপার তুমি বোধহয় লক্ষ্য কর নি।'

'কী?'

'বৃটেন আর জার্মানী—দুই দেশই চাইছে, রাশিয়া নিউট্রাল থাক, এর অর্থ কী?'

অবনীমোহন উৎসুক চোখে তাকালেন।

হেমনাথ বলতে লাগলেন, নিশ্চয়ই তার শক্তি আছে। যে পক্ষে রাশিয়া যাবে তার পাল্লা ভারী হবে। শত্রুর পাল্লা ভারী হোক, কে-ই বা তা চায়।' একটু থেমে আবার বললেন, 'একটা কথা তোমার খেয়াল নেই অবনী—'

'কী?'

'রেভোলিউশনের পর রাশিযার খবর দুনিয়ার লোক বিশেষ কিছুই জানে না। চারদিকে আয়রন কারটেন ফেলে ভেতরে ভেতরে ওরা কতদূর এগিয়ে গেছে, কে বলবে। আমার তো ধারণা, ওরা খুবই শক্তিধর হয়ে উঠেছে।'

অবনীমোহন কিছু বললেন না, ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। হেমনাথের কথাগুলো খুবই যুক্তিসঙ্গত, তার বিপক্ষে বলবার মতন কিছুই নেই।

কিছুক্ষণ চুপ।

তারপর হেমনাথই আবার শুরু করলেন, 'আচ্ছা, এই যুদ্ধে বৃটেনের অবস্থা তোমার কী মনে হয় ?'

'খুবই সঙ্গীন।'

'আমারও তাই মনে হয়। ব্যাটারা দারুণ ঠ্যাঙানি খাচ্ছে; হিটলার ওদের হাড়গোড় একেবারে ভেঙে দিচ্ছে। রয়াল এয়ার ফোর্স বলছে আমরা টিরানায় বোমা ফেলেছি, বার্লিন উড়িয়ে দিয়ে এসেছি—সব মিথ্যে, সব বাজে। ধাপ্পা দিয়ে দুনিয়ার কাছে মুখ রাখতে চাইছে আর কি। কিন্তু লোকে যা বুঝবার ঠিকই বুঝবে।'

দেখা গেল, রাশিয়ার ব্যাপারে কিছু সংশয় থাকলেও বৃটেন সম্বন্ধে অবনীমোহন আর হেমনাথ সম্পূর্ণ একমত।

চিন্তিত গম্ভীর মুখে হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'ওয়ার বেধেছে, তা ঠেকাবার ক্ষমতা তো আমাদের নেই। তবে—'

'তবে কী ?'

'ওয়ারটা যদি ইওরোপেই আটকে থাকত, মন্দের ভাল। নিজেরা কাটাকাটি করে মরত, আমরা চেয়ে দেখতাম। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। আগুন একেবারে দরজার সামনে এসে পড়েছে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'এদেশে খুব দুর্দিন আসছে অবনী, খুবই দুর্দিন—' একই কথা দু'বার করে উচ্চারণ করলেন হেমনাথ।

অবনীমোহন বললেন, 'তা বুঝতে পারছি। এদিকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেস নেতাদের একে একে জেলে নিয়ে পুরছে, বিচারের নামে 'ফার্স' করছে। 'ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া রুল' একখানা করেছে বটে !'

'যা বলেছ।' হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'ওয়ারের খরচ চালাবার জন্য আবার ট্যাক্স বসাবে। হারামজাদারা ইণ্ডিয়াকে এবার ঝাঁঝরা করে ছাড়বে। সাধারণ মানুষের কী দুরবস্থা হয়, এবার দেখো।'

অবনীমোহন এবং হেমনাথ আসন্ন দুর্দিনের চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন যেন।

বিনু প্রায় কিছুই বুঝতে পারছিল না। তবু রাশিয়া-জাপান-হিটলার, চার্চিল, স্টালিন এবং মহাযুদ্ধ—এই শব্দগুলির মধ্যে এমন তীব্র প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে যে অন্যদিকে চোখ ফেরাতে পারছিল না সে, নিশ্বাস বন্ধ করে হেমনাথের আলোচনা শুনে যাচ্ছিল।

এদিকে আরেকটা ব্যাপার চলছিল। হেমনাথের পড়া খবর কাগজগুলো নিয়ে সুধা-সুনীতি তক্তপোষের আরেক ধারে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। বিনুর কানে এখন তাদের ফিসফিসানি ভেসে আসছে।

সুনীতি বলছে, 'ছাখ্ ছাখ্, 'বিজলী'তে 'পথ ভুলে' আরম্ভ হয়েছে। প্রতিমা, ডি-জি, পান্না, রণজিৎ রায় অভিনয় করছে। ইস, কলকাতায় থাকলে দেখতে পেতাম।'

সুধা বলল, 'উত্তরা'য় ন' সপ্তাহ ধরে 'শাপমুক্তি' চলছে। আসবার সময় দেখে এলাম না। আর কোনদিন দেখাই হবে না।'

ধীরে ধীরে ঘুরে বসল বিনু। দেখল, দুই বোন সিনেমার পাতায় মুখ গুঁজে আছে। যুদ্ধ নিয়ে এত যে আলোচনা চলছে, সেদিকে তাদের একটুকু লক্ষ্য নেই। তাদের দেখে মনে হয় না, পৃথিবীতে আদৌ কোন সমস্যা আছে, দুই গোলার্ধ ঘিরে একটানা ভয়াবহ আগুনের চাকা ঘুরে চলেছে।

সুনীতি বলল, 'ভবানীপুরে আমাদের বাড়ির কাছে 'রূপালী' সিনেমা। সেখানে 'হ্যাঞ্চব্যাক অফ নতরডাম' চলছে। নাম ভূমিকায় চার্লস লটন।'

সুধা বলল 'চার্লস লটনের অ্যাক্টিং আমার খুব ভাল লাগে।'

'আমারও।'

'ছাখ সুধা, কলকাতায় কত ছবি চলছে। প্যারাডাইসে 'বন্ধন', মধু বোস সাধনা বোসের 'রাজনর্তকী'। কিছুই দেখতে পারলাম না।'

কলকাতার মোহময় চিত্রজগৎ দুই বোনকে যেন হাতছানি দিয়ে চলেছে। নতুন নতুন কত বিচিত্র মনোহর ছবির মেলা বসেছে সেখানে অথচ কিছুই তাদের দেখা হল না। সুধা-সুনীতির কাছে এর চাইতে অপূরণীয় ক্ষতি আর কিছু নেই।

॥ ছয় ॥

অবনীমোহন কলকাতা-থেকে ফিরে এসেছেন। খবর পেয়েই মজিদ মিঞা কেতুগঞ্জ থেকে ছুটে এল। বলল, 'তাইলে আর দেরি করণের কাম নাই মিতা। আপনের জমিন বুইঝা লন। কবে রেজিস্টারি করবেন, ক'ন?'

হেমনাথ কাছেই ছিলেন। হেসে ফেললেন, 'জমিটা অবনীকে না দেওয়া পর্যন্ত তোর দেখি ঘুম আসছে না!'

'তা যা কইছেন।' মজিদ মিঞা বলতে লাগল, 'কুনো ব্যাপার একবার মাথার ভিতরে ঢুকলে যতক্ষণ হেইটা না হইতে আছে, আমার সোয়াস্তি নাই। হে কথা যাউক। আর কয়দিনের মধ্যে ধান কাটা আরম্ভ হইয়া যাইব। তহন আর উয়াস (নিশ্বাস) ফালানের সময় পামু না। ধানকাটার আগেই আমি জমিন রেজিস্টারি করতে চাই।'

স্নেহলতাও এ আসরে আছেন। তিনি বললেন, 'সেই ভাল। ধানকাটা শেষ হতে হতে পৌষ মাস হয়ে যাবে। পৌষ মাসে শুভ কাজ করতে হবে না। কেনাকাটা যা করবার এই অঘ্রানেই একটা ভাল দিনটিন দেখে সেরে ফেলা উচিত।'

তক্ষুনি একটা পঞ্জিকা এসে পড়ল। পাতা উল্টে উল্টে সপ্তাখানেক বাদে একটা শুভদিনও ঠিক করে ফেললেন হেমনাথ।

দিন তারিখ স্থির হবার পর মজিদ মিঞা বলল, 'এইর ভিতর একখান কথা আছে কিলাম মিতা—'

অবনীমোহন শুধোলেন, 'কী কথা?'

'যে জমিন আপনেরে দিমু হেয়াতে (তাতে) ধান আছে। এই সনের ধান কিন্তুক আপনে পাইবেন না, কারণটা হইল বর্গাদারেরে ঐ জমিন চাষ করতে দিছিলাম। আমি ছাইড়া দিলেও বর্গাদার তো ছাড়ব না। ধান উইঠা গেলে জমিনের দখল পাইবেন।'

অবনীমোহন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'কি আশ্চর্য, ও ধান আমি নেব কেন? যারা খেটেছে ও ফসল তাদেরই প্রাপ্য।'

'তাইলে কথা পাকা হইয়া গেল।'

জমি কেনার ব্যবস্থা পাকা হয়ে যাবার পর একদিন দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে সুধা-সুনীতি আর বিনু পুকুরঘাটে আঁচাতে যাচ্ছিল। হঠাৎ রাস্তার দিক থেকে উঁচু গলার ডাক ভেসে এল, 'হ্যামকত্তা আছেন, হ্যামকত্তা—'

বিনুরা দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটু পর রাস্তার দিক থেকে বাগানের ভেতর যে এসে পড়ল তার বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। মাথার চুল কাঁচায়-পাকায় মেশানো। শরীরের কোথাও বিন্দুমাত্র মেদ নেই। ছোটখাট মানুষটি। চোখের দৃষ্টি কিছুটা

অন্যমনস্ক, অনেকখানি উদাস। পোশাক-আশাক আর কাঁধের ঝোলাখানা দেখে টের পাওয়া গেল, সে ডাক-পিওন।

বিনুদের দেখে লোকটা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনেরা ?'

লোকটা কী জানতে চায় বুঝতে পেরেছিল সুনীতি। নিজেদের পরিচয় দিল সে। হেমনাথের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কী, তাও বলল।

লোকটার চোখ-মুখ আলো হয়ে উঠল, 'তিন মাস আমি এই বাড়িত আসি নাই। তাই জাঁনতে পারি নাই। আগে আইলে আপনেগো লগে চিনা পরিচয় হইত। আমার নামখান কইয়া রাখি—নিবারণ ভুইমালী। আমি ডাক-পিওন। হে যাউক, একখান কথা জিগাই—'

'কী ?'

'আপনাগো ভিতর কেউ সুনীতি রাণী বসু আছে ?'

সুনীতি যেন চমকে উঠল, 'কেন ?'

নিবারণ বলল, 'একখান চিঠি আইছে—'

কাঁপা গলায় সুনীতি এবার বলল, 'দিন, আমার নাম সুনীতি—'

ঝোলার ভেতর থেকে একটা খাম বার করল নিবারণ। সুনীতির ডান হাত এঁটো ; ভাত-টাত মাখানো রয়েছে। কাজেই বাঁ-হাতে খামটা নিল সুনীতি, খামের ওপরকার নাম-ঠিকানায় চোখ পড়তেই তার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে যেতে লাগল।

বিনু পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সুনীতির মুখের দ্রুত রংবদল দেখতে দেখতে সে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। ভেবেই পেল না, সুনীতিকে কে চিঠি লিখতে পারে।

নিবারণ এইসময় বলে উঠল, 'হ্যামকত্তায় বাড়িত্ আছেন ?'

সুনীতি বুঝিবা শুনতে পেল না। হাতের খামটার দিকে পলকহীন তাকিয়েই ছিল, তার মুখে নানা রঙের খেলা চলতে লাগল।

ওধার থেকে সুধা উত্তর দিল, 'দাদু নেই। সকালবেলা উঠে বেরিয়ে গেছেন, সন্ধ্যের আগে ফিরবেন না।'

নিবারণ এবার শুধলো, 'বৌ-ঠাইন (বৌ-ঠাকরুন) আছে তো ?'

নিবারণ যে স্নেহলতার কথা বলছে, সুধা বুঝতে পারল। বলল, 'আছেন।'

'যাই, বৌ-ঠাইনের লগে দেখা করি গা। ঘরের দুয়ারে আইসা তেনার লগে দেখা না করলে রক্ষা নাই। নিযাস (নিশ্চয়ই) আমার গর্দান যাইব।' নিবারণ বড় বড় পা ফেলে ভেতর-বাড়ির দিকে চলে গেল।

একটু নীরবতা।

তারপর সুনীতির দিকে ঝুঁকে সুধা বলল, 'কার চিঠি রে দিদি?' তার মুখ-চোখ থেকে কৌতূহল যেন উপচে পড়ছিল।

সুনীতি চকিত হয়ে বলল, 'কারো না। বলে শাড়ির ভেতর খামটা লুকোতে যাবে তার আগেই ডিঙি মেরে দেখে নিল সুধা।

বিনুরও খুব ইচ্ছে করছিল, সুধার মতন পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে দেখে নেয় কিন্তু একটু দেরি হয়ে গেল। ততক্ষণে চিঠিটা অদৃশ্য হয়েছে।

এদিকে সুধার চোখ কৌতুক এবং দুষ্টুমিতে ঝকঝকিয়ে উঠেছে। ঠোঁট ছুঁচলো করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে খুব রগড়ের গলায় সে বলল, 'শ্রুম আনন্দ ঘোষ। আনন্দচন্দ্র তা হলে কথা রাখলে! চিঠি দেবে বলেছিল, ঠিক দিয়েছে।'

শিউরে ওঠার মতন করে চারদিক একবার দেখে নিল সুনীতি। তারপর ভীতু গলায় বলল, 'অ্যাই সুধা, অ্যাই—চ্যাঁচাচ্ছিস কেন? কেউ শুনতে পারে।

'শুনবে না। আমরা ছাড়া এখানে কেউ নেই।'

'না থাক। তুই মোটে চাঁচাবি না।'

'এক শর্তে চ্যাঁচানো থামাতে পারি।'

সংশয়ের গলায় সুনীতি শুধালো, 'কী?'

সুধা বলল, 'আমাকে চিঠিটা পড়াবি। আনন্দ মহাপ্রভু কেমন করে তোর ভজনা করেছে, দেখতে হবে।'

জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা নেড়ে সুনীতি বলল, 'ও মা, না-না—'

'তা হলে কিন্তু আমি সব্বাইকে বলে দেব।'

সুনীতি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'হাত শুকিয়ে কড়কড়ি হয়ে গেল। চল্ আঁচিয়ে আসি।'

সুধা বলল, 'আঁচাবার পর কিন্তু পড়াবি। না পড়ালে ছাড়ছি না।'

পুকুরঘাটের দিকে যেতে যেতে সুনীতি ফিস ফিস করল, 'কী অসভ্য লোক ভাই—'

'কার কথা বলছিস?'

'আহা, কার কথা যেন বুঝতে পারছে না।'

সুধা বলল, 'আনন্দদার কথা?'

আস্তে করে ঘাড় কাত করল সুনীতি।

সুধা আবার বলল, 'অসভ্যের কী হল?'

'এমন করে চিঠি কেউ লেখে!'

'ঢঙ করিস না দিদি।'

'ঢঙের কী হল?'

'আনন্দদার চিঠির জন্যে তো হা-পিত্যেশ করে বসে ছিলি!'

'তোকে বলেছে!'

'বলিস নি। তবে—'

'তবে কী?'

চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুধা বলল, 'যেরকম উদাস-উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতিস আর ফোঁত ফোঁত করে দীর্ঘশ্বাস ফেলতিস তাতে মনে হচ্ছিল আনন্দদার চিঠি না এলে বুঝি আত্মহত্যাই করে বসবি।'

'তবে রে বাঁদর মেয়ে—' সুনীতি করল কি, এঁটো হাতেই সুধার পিঠে দুম করে কিল বসিয়ে দিল।

পিঠ বাঁকিয়ে নাকি সুরে উঁ-উঁ করতে করতে সুধা বলল, 'পেটে খিদে মুখে লাজ। সত্যি কথা বললেই দোষ।'

'সত্যি কথা তোকে বলাচ্ছি। আয়—'

দ্বিতীয় কিলটি পড়বার আগেই ছুটে দূরে সরে গেল সুধা।

পুকুরঘাটে আঁচাতে আঁচাতে সুনীতি বলল, 'ভাগ্যিস পিওনটার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে গিয়েছিল। বাবা কি দাদু-টাদুর হাতে চিঠিটা পড়লে কী হ'ত বল্ দেখি!'

এক মুখ জল নিয়ে পিচকিরির মতন ছুঁড়ে দিল সুধা। তারপর বলল, 'খুব ভাল হত। ওঁরা বুঝতে পারতেন কী পাকাটাই না তুই পেকেছিস।'

'আমাকে নিয়ে বেশি মজা করো না, নিজের কথাটা একটু ভেবে দেখো।'

'আমার আবার কী কথা?' সুধার চোখ কুঁচকে গেল।

সুনীতি বলল, 'শ্রীমান হিরণকুমার ঢাকায় বসে আছেন। তিনিও এইরকম চিঠি ছাড়তে পারেন। আর তা দাদু কি বাবার হাতে পড়তে পারে।'

চমকে ওঠার মতন করে সুধা বলল, 'কক্ষনো না, কক্ষনো না—'

'না নয়, হ্যাঁ।'

সুধাকে এবার চিন্তিত দেখাল, 'তাই তো রে দিদি, কী করা যায় বল্ দেখি—'

নারকেল-গুঁড়ি দিয়ে বাঁধানো ঘাটে দুই বোন পাশাপাশি বসল। বিনু তাদের সঙ্গেই ছিল, হাত নেড়ে নেড়ে হেমন্তের স্থির জলে ঢেউ তুলতে লাগল। কান দুটো কিন্তু তার সুধা-সুনীতির দিকেই ফেরানো।

সুনীতি বলল, 'আজই কলকাতায় চিঠি লিখে জানিয়ে দেব, আমাকে যেন আর চিঠি-টিঠি না লেখে —'

সুধা বলল, 'তোর কথা শুনবার জন্যে বসে আছে আনন্দদা !'

'তা হলে হিরণকুমারও তা-ই।'

'যা বলেছিস। বারণ করলে ওরা আরো বেশি করে করে চিঠি লিখবে।'

একটু ভেবে সুনীতি হঠাৎ খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'একটা ফন্দি মাথায় এসেছে রে সুধা—'

সুধা উৎসুক চোখে তাকাল, কী ?'

উত্তর না দিয়ে সুনীতি বিনুকে ডাকল। বিনু তাকাতেই বলল, 'পোস্ট অফিসটা কোথায় জানিস ?'

বিনু ঘাড় কাত করল, অর্থাৎ জানে।

'দু'দিন পর পর একবার করে পোস্ট অফিসে যাবি ভাই ?'

'কেন ?'

'সুধার কি আমার চিঠি থাকলে নিয়ে আসবি।'

চোখ কুঁচকে একটু ভাবল বিনু। তারপর বলল, 'যেতে পারি। কিন্তু—'

সুনীতি উঠে এসে বিনুর গা ঘেঁষে বসে পড়ল, 'কিন্তু কী ?'

'আমাকে কী দিবি ?'

'কী আবার দেব ? যাবি তো বাবা এখান থেকে এখানে—'

'এখান থেকে এখানে' ! সেই স্টিমারঘাটা বরফকল ছাড়িয়ে তবে পোস্ট অফিস। পাক্কা দেড়-দু' মাইল রাস্তা। এমনি-এমনি অতখানি পথ আমি যেতে পারব না।'

সুনীতি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আচ্ছা আচ্ছা, কী নিবি বল্—'

বিনু বলল, 'যেদিন পোস্ট অফিসে যাব সেদিন দু' আনা পয়সা দিবি।'

'দু' আনা !' সুর টেনে সুনীতি বলল, 'তুই কী ডাকাত রে—'

'তা হলে যেতে পারব না।'

'আচ্ছা আচ্ছা, দু' আনাই দেব।'

ওদিক থেকে সুধা ডাকল, 'দিদি—'

সুনীতি আবার সুধার কাছে ফিরে গেল, 'কী বলছিস ?'

'পোস্ট অফিসের ব্যাপারটা তো মিটল। এবার আনন্দদার চিঠি বার কর।'

'না-না—'

'না বললে শুনছি না। বার কর—' সুনীতির আঁচল ধরে টানাটানি করতে লাগল সুধা।

'অ্যাই সুধা, অ্যাই—' বিব্রত বিপন্ন সুনীতি শাড়ি সামলাতে সামলাতে চ্যাচামেচি জুড়ে দিল।

সুধার এক কথা, 'বার কর, বার কর—'

আত্মরক্ষার জন্য সুনীতি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ছাড়্-ছাড়্, কী ছেলেমানুষি করছিস! বিনু রয়েছে না?'

'বিনু গেলে চিঠি দেখাবি?'

'সে দেখা যাবে।'

সুধা এবার বিনুর উদ্দেশে বলল, 'তুই এখন যা তো বিনু—'

বিনুর যাবার ইচ্ছে নেই। আনন্দদা সুনীতিকে কী লিখেছে, জানবার ভারি কৌতূহল হচ্ছিল। সে বলল, 'না, যাব না।'

'যাবি—'

'না।'

একটা ছোটখাটো খণ্ডযুদ্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। তার বদলে অগ্নিদৃষ্টিতে একবার বিনুকে দেখে নিয়ে সুধা বলল, 'চল্ দিদি, আমরা ওদিকে যাই। হনুমান ছেলে এখানে বসে থাক।' সুনীতিকে সঙ্গে নিয়ে বাগানের উত্তর দিকে ঘন রোয়াইল আর সিনজুরি ঝোপের ভেতর চলে গেল।

একা-একা ক্ষুণ্ণ মনে কিছুক্ষণ পুকুরঘাটে বসে থাকল বিনু। একসময় টুক করে উঠে পড়ে চঞ্চল পাখির মতন অস্থির পায়ে বাগানের ভেতর ঘুরে বেড়াতে লাগল। একবার ইচ্ছে হল রোয়াইল আর সিনজুরি বনে ঘন ছায়ার ভেতর সুধা-সুনীতি যেখানে বসে আছে সেখানে চলে যায়। পরক্ষণেই ভাবল ওরা যখন তাকে ফেলে চলেই গেছে তখন আর হ্যাংলার মতন যাবে না।

অনেকক্ষণ পর বাড়ির ভেতর চলে এল বিনু। এসেই অবাক।

রান্নাঘরের দাওয়ায় নিবারণ পিওন একটা মোটা গামছা পরে প্রায় খালি গায়ে তেল মাখছিল। কোথায়ই-বা তার ইউনিফর্ম, কোথায়ই-বা তার চিঠি-পত্তরের ঝোলা! তার মুখে অনবরত খই ফোটার মতন কথা ফুটছিল।

স্নেহলতা-সুরমা-শিবানী-অবনীমোহন, বাড়ির প্রায় সবাই নিবারণের সামনে দাঁড়িয়ে। পায়ে পায়ে বিনুও গিয়ে সেখানে দাঁড়াল। তার মনে হল, এত যখন তেল মাখার ঘটা, নিবারণ এখানে খাবেও।

নিবারণ বলছিল, 'চিঠি লইয়া এই বাড়িত্ যেদিনই আসি হেইদিনই ছান-

খাওয়া (স্নান-খাওয়া) সাইরা যাই। হেইদিন খাওন আমার বান্ধা। না খাইয়া গেলে হ্যামকত্তা আর বৌ-ঠাইনে আস্তা রাখব না।'

কথাগুলো অবনীমোহনের উদ্দেশে বলা। অবনীমোহন উত্তর দিলেন না, নিঃশব্দে হাসলেন শুধু।

নিবারণ বলতে লাগল, 'রাইজদিয়ায় হ্যামকত্তার বাড়ি, বাজিতপুরে অভয় কবিরাজের বাড়ি, সুনামগঞ্জে ইসমাইল মেরধার (মৃধা) বাড়ি, গিরিগঞ্জে ছোভান (সোভান) আলি মৌলবীর বাড়ি, হাসাড়ায় মল্লিকগো বাড়ি—এই কয় বাড়িতে চিঠি লইয়া গেলে খাইতে হইবই।'

অবনীমোহন এবার ঈষৎ বিস্ময়ের স্বরে বললেন, 'আপনি তো অনেকগুলো গ্রামের নাম করলেন—'

'হ।'

'এত এত গ্রামে আপনাকে ঘুরতে হয়?'

'মোটে তো চাইরখান গেরামের নাম কইলাম। আমারে বিশখান গেরামে ঘুরতে হয় জামাইকত্তা—'

অবনীমোহন হেমনাথের ভাগনী-জামাই। সেই সুবাদে এরই ভেতর 'জামাই-কত্তা' ডাকতে শুরু করেছে নিবারণ।

অবনীমোহন বললেন, 'বিশখানা গ্রামে একদিনে যান কী করে?'

'একদিনে কেঠা যায়!'

'তবে?'

নিবারণ এবার যা উত্তর দিল, সংক্ষেপে এইরকম। রাজদিয়া এবং আশে-পাশের কুড়িখানা গ্রাম নিয়ে একটা মাত্র পোস্ট অফিস, আর ডাক-পিওন বলতে একা নিবারণ। মস্ত ঝোলায় চিঠিপত্র বোঝাই করে প্রতি সোমবার সে বেরিয়ে পড়ে। পথে নদী-খাল-বিল পড়লে নৌকোর মাঝিদের ডেকে ডেকে পাড়ি জমায়, কখনও বা 'গয়নার নৌকো' ধরে নেয়। সেখানেই যাক, এই জলের দেশে মানুষ বড় ভাল, বড় দয়ালু। দু'মুঠো না খাইয়ে কেউ ছাড়তে চায় না। রাত্তি-বেলা কোথাও না কোথাও একটা আশ্রয় জুটে যায়ই।

সোম থেকে শনি, একটানা ছ'দিন চিঠি বিলির পর রাজদিয়ায় ফিরে আসে নিবারণ। মাঝখানে রবিবারটা বিশ্রাম। তারপর আবার সোমবারে দূরের গ্রাম-গঞ্জ-জনপদে বেরিয়ে পড়া। পচিশ-তিরিশ বছর ধরে এই রকমই চলছে।

সব শুনে অবনীমোহন কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই স্নেহলতা বলে

উঠলেন, 'বকবকানি থামিয়ে এখন চান করতে যা নিবারণ। তোকে খেতে দেবার পর আমরা খাব।'

'এই যাই—' ব্যস্তভাবে নিবারণ পুকুরঘাটের দিকে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এসে যখন খেতে বসল তখনও তার কথার শেষ নেই। খেতে খেতে গল্প করতে লাগল সে।

একধারে দাঁড়িয়ে বিনুর মনে হল, লোকটা যেন বকবক করার কল। দম দেওয়াই আছে, সব সময় গলগল করে কথা বেরিয়ে আসছেই।

খাওয়া-দাওয়ার পর নিবারণ বিনুকে নিয়ে পড়ল, 'তোমার লগে ভাল কইরা আলাপই হইল না নাতিবাবু। লও যাই এট্টু গপ-সপ (গল্প-সল্প) করি।' বিনুকে সঙ্গে নিয়ে যুগলের ঘরে গিয়ে ঢুকল সে। বোঝা গেল এ বাড়ির সব অন্ধি-সন্ধিই তার চেনা। টের পাওয়া গেল, এতক্ষণ বকবক করেও তার সাধ মেটেনি, আরো কিছুক্ষণ সে গল্প করতে চায়।

লোকটাকে খুব খারাপ লাগছিল না বিনুর। যুগলের নীচু তক্তপোশে নিবারণের পাশাপাশি বসে উন্মুখ হয়ে থাকল সে।

একটা বিড়ি ধরিয়ে নিবারণ বলল, 'তোমরা তো কইলকাত্তার পোলা?'

বিনু মাথা নাড়ল।

'কইলকাত্তা জ্যাশখান কেমুন কইবা—'

কলকাতা কেমন শহর, কথায় কথায় তার মোটামুটি ছবি এঁকে নিবারণের চোখের সামনে যেন এঁটে দিল বিনু।

শুনে কিছুক্ষণ বোবা হয়ে থাকল নিবারণ। তারপর বলল, 'আলিসান (দারুণ) ব্যাপার, না?'

'হ্যাঁ।'

'কইলকাত্তার কথা তো শুনলাম, এইবার আমাগো জলের জ্যাশের গপ (গল্প) শোন।'

'বলুন—'

দেখা গেল নিবারণ লোকটা সত্যি-সত্যি গল্পের খনি। বিপুল অভিজ্ঞতা তার জীবনের। কবে কার্তিক মাসের ঝড়ে বড় গাঙে 'গয়নার নৌকো' উল্টে গিয়ে মরতে বসেছিল, তারপর দু'খানা মোটে হাতের ভরসায় দু' মাইল উথল-পাথল নদী পাড়ি দিয়েছিল, কবে চরের মুসলমানদের সঙ্গে শুধু লাঠি পেটা করে একটা প্রকাণ্ড কুমির মেরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছ থেকে দশ টাকা পুরস্কার পেয়েছিল, কবে কোথায় সাক্ষাৎ যমের মতন ডানাওলা উড়ন্ত সাপ দেখেছিল,

কোথায় দু'শ বছরের এক বুড়ো ফকিরের অলৌকিক মন্ত্রবলে বিশাল দীঘির সব জল দুধ হয়ে গিয়েছিল—হাত-পা চোখ-মুখ নেড়ে কত বিচিত্র বিস্ময়কর গল্প যে নিবারণ বলে গেল হিসেব নেই।

গল্প বলতে জানে বটে লোকটা। মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনে যাচ্ছিল বিনু; তার চোখে পলক পড়ছিল না।

গল্পে গল্পে বিনুকে জয় করে বিকেলের খানিক আগে নিবারণ চলে গেল। এখান থেকে কারো নৌকো ধরে সোজা সুজনগঞ্জ যাবে সে।

নিবারণ চলে যাবার কিছুক্ষণ পর হেমন্তের ছায়া যখন আরো দীর্ঘ এবং ঘন হল সেই সময় সিনজুরি বন থেকে বেরিয়ে সুধা-সুনীতি বাড়ি চলে এল।

পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে সুরমা চুল বাঁধছিলেন। বিনু তাঁর কাছেই ছিল। মেয়েদের দেখে সুরমা বললেন, 'কোথায় ছিলি রে তোরা এতক্ষণ?'

সুনীতি বলল, 'বাগানে—'

'কী করছিলি?'

'গল্প।'

'কলকাতা থেকে নাকি চিঠি এসেছে?'

সুনীতি চমকে উঠল। আধফোটা গলায় বলল, 'হ্যাঁ।'

সুরমা শুধোলেন, 'কার চিঠি?'

'আমার—'

'তোকে আবার কে চিঠি দিলে?'

'আমার কলেজের এক বন্ধু—সেই যে বেলা বলে মেয়েটা, কলকাতায় আমাদের বাড়ি আসত—'

সুরমা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

বিনু লক্ষ্য করল, সুধা-সুনীতি চোরা চাহনিতে পরস্পরকে দেখতে দেখতে ঠোঁট টিপে হাসছে। বিনুর একবার ইচ্ছে হল, চিঠির আসল রহস্যটা ফাঁস করে দেয়। কী ভেবে শেষ পর্যন্ত চুপ করে থাকল, কিছু বলল না।

॥ সাত ॥

অঘ্রানের মাঝামাঝি বিনুদের জমি কেনা হয়ে গেল।

রেজিস্ট্রি হবার পর অবনীমোহন, বিনু আর সুরমা রেজিস্ট্রি অফিস থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। মজিদ মিঞা, হেমনাথ তখনও অফিসের ভেতর। সুরমাকেও এতদূর আসিতে হয়েছে; কেননা জমি তাঁর নামেই কিনেছেন অবনীমোহন।

হঠাৎ একটা লোক—মাথার চুল জট বাঁধা, মুখময় দাঁড়ি-গোঁফ, ভাঙা-ভাঙা নখ, পায়ে হাজা, লালচে উদ্‌ভ্রান্ত চোখ, সব মিলিয়ে পাগলাটে চেহারা—অবনীমোহনের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'সালাম বাবু। আপনে বুঝি জমিন কিনলেন?'

অবনীমোহন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, কেন?'

'আপনার লগে একখান কথা।'

অবনীমোহন বললেন, 'কী কথা?'

হলদে হলদে অসমান দাঁত বার করে লোকটা বলল, 'কার জমিন কিনলেন?'

'মজিদ মিঞার।'

চোখের উপর হাত রেখে ভুরু কুঁচকে লোকটা ভাবতে চেষ্টা করল যেন। বলল, 'কোন্ মজিদ মেয়া ক'ন দেখি? বাড়ি কোনখানে?'

অবনীমোহন বললেন, 'কেতুগঞ্জের।'

'কেতুগঞ্জের মজিদ মেয়া বড় ভাল মানুষ।' লোকটার চোখমুখ আলো হয়ে উঠল, 'মেয়াভাইর কোন জমিন কিনলেন?'

'উত্তরের দিকের মাঠের।'

'উত্তরের চকের জমিন? বড় বাহারের জমিন। হেই ধারে সুনামগঞ্জের হাট, আর এইধারে ধলেশ্বরীর গাঙ—এইর ভিতর এমুন ভাল জমিন আর নাই।'

অবনীমোহন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, তুমি এখানকার সব জমি চেন নাকি!'

'চিনি আবার না! সগ্‌গল চিনি। মেয়াভাইর যেই জমিন আপনে

কিনলেন হেয়াতে ধান হ্যান, পাট হ্যান, মুঙ (মুগ)-মুসৈর-কলাই—যা ইচ্ছা হ্যান ফলন যা হইব না। চোমৎকার—চোমৎকার—'

একটু চুপ।

তারপর লোকটা আবার বলল, 'আপনের লগে এত কথা কইলাম, আপনে কে, হেয়াই জানলাম না।'

অবনীমোহন নিজের পরিচয়-টরিচয় দিলেন।

অপার বিস্ময়ে লোকটা খানিকক্ষণ হাঁ করে থাকল। তারপর বলল, 'আপনে হ্যামকত্তার জামাই!'

অবনীমোহন আস্তে করে মাথা নাড়লেন। হেমনাথের সঙ্গে সম্পর্ক থাকাটাই যেন এখানে পরমাশ্চর্য ঘটনা। এ লোকটার চোখেমুখে যে বিস্ময় তা রাজদিয়া-বাসী প্রতিটি মানুষের চোখেই আগে দেখেছেন অবনীমোহন।

লোকটা বলল, 'আপনি নিয্যস কইলকাত্তায় থাকতেন?'

'হ্যাঁ। তোমায় কে বললে?'

'কে কইছিল মনে নাই। তয় শুনছিলাম, কইলকাত্তার থনে হ্যামকত্তার কেঠা (কেউ) যিনি আইছে। ভাবছিলাম আপনেরে দেখতে যামু—'

'যাও নি তো—'

'না।'

'গেলেই পারতে।'

একটু ভেবে লোকটা বলল, 'যাওনের সময় কই? চকে চকে মাঠে-ঘাটে ঘুইরা দিন কাইটা যায়। কোনোখানে যাওনের ফুরসুত নাই।'

বিনু একধারে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ভেবেই পেল না, মাঠে-ঘাটে এত কী কাজ লোকটার। ইচ্ছে হল, একবার জিজ্ঞেস করে; কী ভেবে আর করল না।

অবনীমোহন বললেন, 'নামটা কী ভাই?'

'তালেব—তালেব মেয়া—'

'তুমি এই রাজদিয়াতেই থাকো?'

'না।'

'তবে?'

তালেব কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর উদাস গলায় অন্যমনস্কের মতন বলল, 'বাড়ি আমার এই হ্যাশে না।'

অবনীমোহন শুধোলেন, 'কোথায়?'

'হেই ম্যাঘনার পারে। তয়—'

'কী ?'

'স্বাশ কইতে কিছু নাই আমার। ম্যাবনায় ঘরবাড়ি খাইছে ; ভাসতে ভাসতে এইখানে চইলা আইলাম। দশ বিশ বচ্ছর ধইরা এইখানেই আছি।'

'তোমার কে কে আছে ?'

'কেউ না। এক্কেরে ঝাড়া হাত-পা।'

অবনীমোহন হয়তো কৌতূহল বোধ করছিলেন, 'এখানে কোথায় থাকো তুমি ?'

তালেব বলল, 'থাকনের ঠিক-ঠিকানা নাই। যহন যেইখানে পারি হেইখানে পইড়া থাকি। তয় মাঠে-ঘাটেই থাকি বেশি।'

'রাত্তিরেও ?'

'হ।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না অবনীমোহন।

তালেব আবার কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় মজিদ মিঞাকে নিয়ে হেমনাথ এসে পড়লেন। এতক্ষণ রেজিস্ট্রি অফিসের ভেতরে মুহুরি আর উকিলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন তারা।

হেমনাথকে দেখে অনেকখানি ঝুঁকে সম্ভ্রমের গলায় তালেব বলল, 'ছালাম (সেলাম) বড়কত্তা, শরীল-গতিক ভাল তো ?'

হেমনাথ বললেন, 'ভাল। তুই কেমন আছিস তালেব ?'

'আপনারা যেমন রাখছেন।'

'আমরা রাখবার কে ?' আকাশের দিক দেখিয়ে হেমনাথ বললেন, 'ভাল মন্দ যা রাখবার ঐ ওপরওলাই রাখবেন।'

তালেব জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'লাখ কথার এক কথা। খোদা-তাল্লা ছাড়া কে আর রাখতে পারে।'

ওপাশ থেকে মজিদ মিঞা বলে উঠল, 'জমিন রেজিস্টারির খবর বুঝি পাইয়া গেছস ?'

নোংরা জট-পাকানো দাড়ি-গোঁফের ভেতর জগতের সরলতম হাসিটি ফুটিয়ে তালেব মাথা হেলিয়ে দিল।

মজিদ মিঞা আবার বলল, 'গন্ধ পাইয়াই বুঝি দৌড়াইয়া (দৌড়ে) আইছস ?'

'হ।'

হেমনাথ এই সময় তাড়া দিলেন, 'এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। বেলা হেলতে চলল, এবার বাড়ি ফেরা যাক।'

মজিদ মিঞা ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'হ-হ; শুদাশুদি খাড়াইয়া থাকনের কোন কাম? লন (চলুন) যাই।'

সুরমার নামে জমি রেজিস্ট্রি হয়েছে। কাজেই সবার সঙ্গে তাঁকেও আসতে হয়েছিল।' রাজদিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত, এতখানি রাস্তা তাঁর মতন দুর্বল রোগা মানুষের পক্ষে একবার হেঁটে এসে আবার ফিরে যাওয়া অসম্ভব। শরীরে তা হলে আর কিছুই থাকবে না। তাই সকাল বেলাতেই লারমোরের ফীটনখানা আনিয়ে রেখেছিলেন হেমনাথ। গাড়িতে করেই সবাই রেজিস্ট্রি অফিসে এসেছেন।

সামনের দিকে একটা ডালপালা-ওলা বিশাল জামরুল গাছের তলায় লারমোরের ফীটনটা দাঁড়িয়ে ছিল। বয়স্ক রুগ্ন ঘোড়াটা আর কোচোয়ান কাদের; যে যার জায়গায় ঝিমুচ্ছিল। হেমনাথরা সোজা সেখানে চলে এলেন।

মজিদ মিঞা গলা চড়িয়ে ডাকল, 'কাদের—'

অতি কষ্টে চোখের পাতা দুটো ওপর দিকে টেনে তুলল কাদের। ঘুমন্ত গলায় সাড়া দিল, 'অ—'

'ঘুমাস নিহি?'

'না।' বলতেই বলতেই আবার কাদেরের চোখ বুঁজে এল।

ঘুমাস না তো চোখ বুইজ্জা আছস ক্যান?' মজিদ মিঞা বলতে লাগল, 'নে, চোখ টান কর। তর ঘোড়ারে জাগা। আমাগো কাম হইয়া গেছে। এইবার বাড়িত্ যামু।'

একে একে সবাই ফীটনে উঠল।

হেমনাথের সঙ্গে জামরুল তলায় তালেবও এসেছিল। সবাইকে গাড়িতে উঠতে দেখে সে উৎকণ্ঠিত হল। ফীটন ছাড়বার মুখে তাড়াতাড়ি অবনীমোহনকে ডাকল, 'জামাইকত্তা--'

অবনীমোহন তাকালেন, 'কী বলছ?'

'আমার সেই কথাখান কিলাম কওয়া হয় নাই।'

অবনীমোহনের মনে পড়ে গেল। সাগ্রহে বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বল—'

তালেব বলল, 'জমিন কিনলেন; ধান রুইবেন তো?'

'সেইরকমই ইচ্ছে।' অবনীমোহন হাসলেন।

'অঘ্ঘান পৌষ মাসে ধান কাটার পর—' তালেব বলতে লাগল, 'আপনের জমিনে যা দুই-চাইর দানা পইড়া থাকব, হেগুলান (সেগুলো) কিলাম আমার। ইন্দুরের গাদে (ইঁদুরের গর্তে) যা ধান থাকব তা-ও আমার।'

‘কিন্তু—’

‘কী ?’

‘মাটির সঙ্গে যে ধান মিশে থাকবে তা তুলবে কী করে ?’

‘হে (তা) আমি যেমনে পারি। আপনে খালি কথা ছান, ঐ ধান আমারে দিবেন।’

সংশয়ের গলায় অবনীমোহন বললেন, ‘তুমি যদি তুলে নিতে পার, আমার আপত্তি নেই।’

তালেবের চোখ-মুখ থেকে আনন্দ যেন উথলে পড়তে লাগল। এত বড় জয় যেন আর কখনও হয়নি তার। উৎফুল্ল স্বরে মাথা হেলিয়ে হেলিয়ে সে বলতে লাগল, ‘কথা দিলেন কিলাম, পাকা কথা—’

‘হ্যাঁ-হ্যাঁ, পাকা কথা বৈকি—’

এক সময় ফীটন চলতে শুরু করল।

অবনীমোহনের বিস্ময় আর কাটছিল না। বললেন, ‘অদ্ভুত লোক—’

হেমনাথ বললেন, ‘হ্যা, অদ্ভুতই। প্রায়ই এই রেজেস্ট্রি অফিসে এসে বসে থাকে। আর যে জমি কেনে তাকে গিয়ে ধরে ; যাতে ধান ওঠার পর ঝড়তি-পড়তি ফসল ও কুড়িয়ে নিতে পারে।’

‘আর কিছু করে না ?’

‘না। করতে তো অনেকেই বলে। আমি বলেছি, মজিদ বলেছে, রাম-কেশব বলেছে, গুয়াখোলার রহিম মিয়া বলেছে। কামলার তো সবারই দরকার ; আমরা ওকে বাড়িতে এসে থাকতে বলেছি। কিন্তু কে কার কথা শোনে।’

‘ধান কুড়িয়ে দিন চলে ?’

‘ভগবান জানে।’

সারা রাস্তা তালেবের কথাই হল। কথায় কথায় একসময় বরফ কল, স্টিমারঘাটা, সারি সারি মিঠাইর দোকান পেরিয়ে ফীটন হেমনাথের বাড়ি এসে থামল।

॥ আট ॥

পুজোর আগে সেই যে ঝিনুক এ বাড়ি এসেছিল, এখনও যায়নি। ভবতো অবশ্য মাঝে-মধ্যে এসে মেয়েকে দেখে গেছেন। ঠিক হয়েছে এখানে থেকেই পড়াশোনা করবে ঝিনুক। ইংরেজি নতুন বছর পড়লে স্কুলে ভর্তি হবে।

এখনও মাছের বড় টুকরোটা নিয়ে, দাদুর কাছে শোওয়া নিয়ে, স্নেহলতার ভাগ নিয়ে বিনুর সঙ্গে সমানে হিংসে করে যাচ্ছে ঝিনুক। তবে পুজোর ছুটিতে কলকাতা থেকে ঝুমারা আসার পর ঝিনুক যেমন হয়ে উঠেছিল, এখন আর তেমন নেই। তখন সবসময় বিনুর দিকে তাকিয়ে থাকত সে। বিনু কী করে, কোথায় যায়—সব তীক্ষ্ণ ধারাল চোখে লক্ষ্য করত। ঝুমার সঙ্গে বিনু খেলা করলে, কথা বললে, কিংবা বেড়াতে গেলে রাগে-আক্রোশে-বিদ্বেষে জর্জরিত হয়ে যেত ঝিনুক। আজকাল সে ভাবটা নেই তার।

একটা ব্যাপার বিনু লক্ষ্য করেছে; লেখাপড়া খেলাধুলো কিংবা তার সঙ্গে হিংসের ফাঁকে ফাঁকে কখনও পুবের ঘরের দাওয়ায় চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে ঝিনুক; উদাস চোখে হেমন্তের অনুজ্জ্বল ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। যে ঝিনুক হিংসে করে, যে ঝিনুক দাদু-দিদার ভাগ নিয়ে গাল ফুলিয়ে দুর্বিনীত ঘাড় বাঁকিয়ে থাকে, তাকে তবু চেনা যায়। কিন্তু উদাসিনী এই মেয়েটা বড় অচেনা; তাকে বড় দূরের মনে হয় তখন।

এমনিতে ঝিনুককে বিশেষ পছন্দ করে না বিনু; আবার অপছন্দও করে না। কিন্তু নির্বাক বিষণ্ণ প্রতিমার মতন এই সুদূর অচেনা মেয়েটা তাকে যেন অসীম আকর্ষণে টানতে থাকে।

একেক সময় বিনু তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, 'এখানে বসে কী করছ?'

প্রথমটা হয়তো শুনতেই পায় না ঝিনুক। দু-চারবার ডাকাডাকির পর সে চমকে তাকায়। বিনু আগের প্রশ্নটাই আবার করে, 'এখানে কী করছ?'

গাঢ় বিষাদের গলায় ঝিনুক বলে, 'মা'র কথা ভাবছি।'

দুঃখী মেয়েটা নিমেষে যেন বিনুকে অভিভূত করে ফেলে। তার অনেকখানি কাছে গিয়ে অপার সহানুভূতির সুরে সে শুধোয়, 'মা'র জন্যে মন কেমন করছে?'

আস্তে আস্তে কোঁকড়ানো চুলে-ভরা মাথাটা নেড়ে অস্ফুট গলায় ঝিনুক বলে, 'হুঁ—'কালো টিপ-পরানো রূপোর কাজললতার মতন বড় বড় চোখদুটো প্রথমে জলে ভরে যায় ; তারপর ফোঁটায় ফোঁটায় টপ-টপ পড়তে থাকে।

এই সময়টা একেবারে দিশেহারা হয়ে যায় বিনু। কিভাবে ঝিনুককে সান্ত্বনা দেবে, কেমন করে কোন্ সমবেদনার কথা বললে মেয়েটা শান্ত হবে, সে ভেবেই পায় না। বিমূঢ়ের মতন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে গম্ভীর ভারী গলায় বিনু বলে, 'কেঁদো না, কেঁদো না।'

কান্না থামে না। ঝিনুক ফুলে ফুলে ফোঁপাতেই থাকে আর ভাঙা-ভাঙা গলায় বলে, 'মাকে আমি আর কখখনো দেখতে পাব না।'

গলার কাছটা, বুকের ভেতরটা কেমন ভারী হয়ে আসে বিনুর। কান্নার মতন কিছু একটা উথলে বেরিয়ে আসতে চায় কিন্তু পথ পায় না। ফিসফিস করে বিনু এবার যা বলে, ঝিনুক তো নয়ই, নিজেও স্পষ্ট বুঝতে পারে না।

॥ নয় ॥

অঘ্রানের শেষাশেষি একদিন হেমনাথ বললেন, 'মাঠের ধান তো পেকে এল। আর ক'দিন পর কাটা শুরু হবে। তার আগে একটা কাজ করা দরকার।'

স্নেহলতা-অবনীমোহন-সুধা-সুনীতি-বিনু, এমনকি যুগলও কাছাকাছি ছিল। সবাই জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, 'কী ?'

'ধানকাটার পরই তো যুগলের বিয়ে। তার আগে একখানা ঘর তুলতে হবে। নইলে—'

স্নেহলতা বললেন, 'নইলে কী ?'

হেমলতা বললেন, 'নতুন বৌ এসে থাকবে কোথায় ? যুগল যে ঘরে থাকে সেখানে নতুন বৌকে তোলা যায় না।'

'সে তো ঠিকই।' স্নেহলতা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, 'তা ঘর উঠবে কোথায় ?'

উত্তর না দিয়ে হেমনাথ যুগলের দিকে তাকালেন, 'কি রে, কোথায় ঘর তুলবি ?'

যুগল ঘাড় গুঁজে একমনে নখ খুঁটে যাচ্ছিল। আরো ঝুঁকে পড়ল সে; জবাব দিল না।

হেমনাথ বললেন, 'লজ্জায় তো একেবারে গেলি! বল্, বল্ তাড়াতাড়ি, কাল থেকে কামলা লাগবে।'

যুগল আর বসে থাকতে পারল না, উঠে বার-বাড়ির দিকে ছুট লাগাল।

হেমনাথ হেসে উঠলেন, দেখাদেখি অন্য সবাইও হাসল।

যাই হোক সেইদিনই ঘুরে ঘুরে যুগলের ঘরের জন্য জায়গা ঠিক করে ফেললেন হেমনাথ। দক্ষিণের ঘরের গা ঘেঁষে ঢেঁকিঘর। তার পেছন দিকে কইওকড়া আর চোখ-উদানে গাছের ঝুপসি জঙ্গল। স্থির হল এই জায়গাটা সাফ-টাফ করে কাল থেকে ঘর তোলা হবে। পঁচিশের বন্দ'র মস্ত ঘর।

হেমনাথ যা বলেছিলেন তাই করলেন। পরের দিনই মজুর লাগিয়ে দিলেন।

ঢেঁকিঘরের পাশে যুগলের জন্য নতুন ঘর উঠতে লাগল। আর এদিকে হেমনাথ তাঁর পুকুরে 'মাছধরা' দিলেন।

অঘ্রান মাসের শুরু থেকেই এদেশের পুকুরগুলো খারাপ হয়ে যায়। যত কচুরিপানা, টোপাপানা, বাইচা (এক জাতের জলজ আগাছা) পচতে শুরু করে। ফলে জল যায় নষ্ট হয়ে, তার রঙও যায় বদলে। কালচে দূষিত জল থেকে দুর্গন্ধ উঠতে থাকে। এই সময় জলের ভেতর মাছেদের বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব। পাবদা-ট্যাংরা-ফলুই-নলা-গরমা-বোয়াল-বজুরি-ভাগ্না—ঝাঁক বেঁধে পুকুরের সব মাছ জলতল থেকে আধমরার মতন ওপরে উঠে ভাসতে থাকে। এদেশে একে বলে 'মাছ গাবানো'।

মাছ গাবাতে শুরু করলে ধরে ফেলতেই হবে। নইলে জলজ আগাছার সঙ্গে মাছ মরে পচতে থাকলে আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু একসঙ্গে এত মাছ দিয়ে কী হবে? তাই বড় বড় গৃহস্থরা 'মাছধরা' দেয়। রাজ্যের লোক জুটিয়ে এনে 'গাবানো মাছ' ধরিয়ে ফেলে। যে যতটা ধরতে পারে সবটাই তার। এর জন্য পুকুরের মালিককে ভাগ দিতে হয় না।

'মাছধরা' দিলে দু' দিক থেকে সুবিধে। এক, মরা-আধমরা মাছগুলো জল থেকে ছেঁকে আনা যায়। দুই, অসংখ্য মানুষ মাছধরার ফলে পুকুরের সমস্ত আগাছা যায় সাফ হয়ে।

'মাছধরা' দেবার জন্য ঢ্যাঁড়া দিতে হয় না। দু'চারজনের কানে তুলে দিলেই হল। তারাই খবরটা দিগ্‌দিগন্তে পৌঁছে দেয়।

একদিন সকালবেলা বিনু দেখল, কয়েক শ' মানুষ পলো, ধর্মজাল ঝাঁকিজাল নিয়ে তাদের পুকুরে এসে পড়েছে। তারপর সমস্ত দিন ধরে জল তোলপাড় করে চলল মাছধরা। মানুষের সঙ্গে মাছরাঙা আর শঙ্খচিলেরাও মাছ ধরবার জন্য পাল্লা দিতে লাগল।

বেলা একটু বাড়লে বিনুও বায়না ধরে যুগলের সঙ্গে পুকুরে নামল। এবং কি আশ্চর্য, সারা গায়ে জল আর পাঁক মেখে দুটো মেনি আর একটা সরপুঁটি মাছ ধরেও ফেলল।

শুধু হেমনাথের পুকুরেই না। পর পর ক'দিন রাজদিয়ার আরো অনেক পুকুরে মাছ ধরা চলল। যুগলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সে-সব জায়গা থেকেও মাছ নিয়ে এল বিনু।

দেখতে দেখতে পৌষ মাস পড়ে গেল।

আশ্বিনের শুরুতে মাঠময় শুধু ছিল জল। অথৈ অপার সমুদ্র হয়ে শরতের মাঠ দিগ্‌দিগন্তে জুড়ে দুলতে থাকত। তার ওপর আমন ধানের চারাগুলো মাথা তুলে দিল। তখন যেদিকে চোখ যেত, সবুজ আর সবুজ।

কার্তিকের গোড়াতেই জলে টান ধরেছিল। পৌষ মাস পড়তে-না-পড়তেই মাঠ একেবারে শুকনো; এক ফোঁটাও জল নেই। অবশ্য মাটি এখনও নরম, কোথাও কোথাও কাদা জমে আছে।

তবে সব চাইতে বিস্ময়কর যা তা হল ধানগাছগুলো। কোন এক জাদুকরের ছোঁয়ায় সেগুলো এখন সোনা হয়ে গেছে। মাঠের ঝাঁপি ফসলের লাবণ্যে ভরে উঠেছে।

হেমনাথ একদিন বললেন, 'আর দেরি করা যাবে না। দু' একদিনের মধ্যে ধানকাটা শুরু করতে হবে।'

একটু চিন্তা করে অবনীমোহন বললেন' 'কিন্তু মামাবাবু—'

হেমনাথ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

অবনীমোহন বলতে লাগলেন, 'আপনার জমি এক শ' কানির মতন। বারো মাসের লোক বলতে মোটে দু'জন—যুগল আর করিম। দুটো লোকের পক্ষে এত জমির ধান কেটে ঘরে তোলা অসম্ভব। আরো একজন তো দরকার।'

হেমনাথ কিন্তু আদৌ চিন্তিত নন। ব্যাপারটা যেন কোন সমস্যাই নয় এমনভাবে বললেন, 'তা দরকার।'

'দু-একদিনের মধ্যে যদি ধানকাটা শুরু করেন অন্তত আজকালের ভেতর লোকজন যোগাড় করে নিতে হবে।'

'সে ঠিক জুটে যাবে।'

হেমনাথকে যতখানি ভাবনাশূন্য দেখাল, অবনীমোহন কিন্তু ততখানি নিশ্চিন্ত নন। কিভাবে কোত্থেকে এত লোক যোগাড় হবে তিনি ভেবে উঠতে পারছিলেন না। যাই হোক, এ প্রসঙ্গে তিনি আর কোন প্রশ্ন করলেন না।

হেমনাথ বুঝিবা অবনীমোহনের মনোভাব টের পেয়েছিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'দেখো, লোক বাড়িতে এসে হাজির হবে।'

'আপনি আগেই ঠিক করে রেখেছেন?'

'না।'

'তবে?' অবনীমোহনকে ঈষৎ বিমূঢ় দেখাল।

হেমনাথ বললেন, 'আগে থেকে ঠিক করার দরকার নেই। সময় মতন ওদের পাওয়া গেলেই তো হল।'

হেমনাথ যা বলেছিলেন তাই। লোক যোগাড় করতে হিল্লী-দিল্লী ছুটতে হল না, ঘরে বসেই পাওয়া গেল।

সেইদিনই বিকেলবেলা লক্ষীছাড়া চেহারার একদল মানুষ এসে হাজির। হাত-পা তাদের ফাটা ফাটা, চামড়া থেকে খই উড়ছে। চুল জট-পাকানো; চিরুনি এবং তেলের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। পরনে চিটচিটে লুঙ্গি আর চেককাটা জামা কিংবা গেঞ্জি। সবার হাতেই দুটো করে ধানকাটা কাস্তে। চেহারা এবং পোশাক-আশাক দেখে এক পলকেই বোঝা গেল ওরা খুব গরীব মুসলমান।

সবার আগে ছিল বুড়োমতন একটা লোক, সম্ভবত সে-ই দলপতি। হেমনাথের কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'আদাব হ্যামকত্তা—'

অন্য লোকগুলোও বিনীত স্বরে বলে উঠল, 'আদাব আদাব—'

হেমনাথও হাত জোড় করে বললেন, 'আদাব, তারপর কী খবর বল। আজই এলে নাকি?'

'আইজ্ঞা—' সবার প্রতিনিধি হিসেবে বুড়ো লোকটা বলল, 'দেরি নি হইয়া গেল কত্তা?'

'না, ঠিক সময়েই এসেছ।'

'ধানকাটা কামলা রাখেন নাই তো?'

'না। তবে আজ-কালের মধ্যে তোমরা না এলে অন্য লোক দেখতে হ'ত।

'নসীব ভাল ; আইজই আমরা আইছি। তা ধানকাটা আরম্ভ হইব কবে ?'

'এসেই যখন পড়েছ তখন কাল থেকেই আরম্ভ করব ভাবছি।'

'হেই ভাল। আইলসা (অলস) বইসা থাইকা লাভ কী ?'

হেমনাথ শুধোলেন ' তোমরা ক'জন এসেছ ?'

'বুড়ো লোকটা জানাল,, 'পঁচিশ জন।'

'ঠিক আছে। পঁচিশ জনই আমার দরকার।' হেমনাথ গলা তুলে ডাকলেন, 'যুগল, যুগল—'

যুগল বার-বাড়ির দিক থেকে ছুটে এল। হেমনাথ দলটাকে দেখিয়ে বললেন, 'এদের থাকার ব্যবস্থা করে দে।'

আরেক প্রস্থ আদাব জানিয়ে লোকগুলো যুগলের সঙ্গে চলে গেল।

অবনীমোহন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'এরা কারা ?'

হেমনাথ বললেন, 'চরের কৃষাণ।'

'আপনি জানতেন ওরা আসবে ?'

'জানতাম। সব বারই ওরা আসে।' হেমনাথ এরপর যা বললেন সংক্ষেপে এইরকম :

অঘ্রানের শেষাশেষি ধলেশ্বরীর চরগুলো থেকে এবং সুদূর ভাটির দেশ থেকে দলে দলে ভূমিহীন নিরন্ন কৃষাণ রাজদিয়ার দুয়ারে দুয়ারে এসে হানা দেয়। প্রতি বছরই এই সময়টা ওরা এখানে আসে। শুধু অঘ্রানেই না, বৈশাখ-জষ্ঠি-আষাঢে—ধান-পাট বোয়ার দিনগুলোতেও আসে। দরকার মতন সম্পন্ন গৃহস্থেরা তাদের কাজে লাগায় ; সাময়িক প্রয়োজন ফুরোলে তারা আবার দল বেঁধে ফিরে যায়। যে লোকগুলোকে আজ হেমনাথ রেখেছেন তারাও নির্ভূম নিরন্ন চাষী।

অবনীমোহন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। এই বিশাল দেশে যেখানে এত প্রাচুর্য, জিনিসপত্র এত অকল্পনীয় রকমের সস্তা, সেখানেও মানুষের দু-মুঠো ভাত জোটে না ? পূর্ব বাঙলার দিগ্‌দিগন্ত জুড়ে ফসলের মাঠ ছড়ানো। অথচ এদেশে বেশির ভাগ মানুষই নাকি ভূমিহীন ! অবনীমোহন আরও জানতে পারলেন, ভাগ্যবান গৃহস্থের বাড়িতে বছরে মোটে চার মাসের মতন তারা কাজ পায়।

অবনীমোহন শুধোলেন, বাকি আট মাস ওদের কিভাবে কাটে ?'

'আন্দাজ কর না—'হেমনাথ হাসলেন।

'বুঝতে পারছি না।'

হেমনাথ এবার বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন। চার মাস লোকের জমিতে ধান-পাট বুনে এবং খেটে ওদের কাটে। সারা বছরে এই সময়টাই যা একটু সুখের মুখ ওরা দেখতে পায়। একমাস কাজ করে পানের 'বরজে'। মাস-দুয়েকের মতন মুত্রা আর বাঁশ দিয়ে ধামা-কুলো-পাটি এই সব বুনে হাটে হাটে বেচে। তা ছাড়া খালে-বিলে-নদীতে মাছমারা তো আছেই। জীবন-ধারণের জন্য তাদের নির্দিষ্ট সম্মানজনক কোন জীবিকা নেই; আছে হাজার রকমের উঞ্ছবৃত্তি।

হেমনাথ বলে যাচ্ছিলেন, 'দু চারটে মাস বাদ দিলে দুর্ভিক্ষ ওদের নিত্য সঙ্গী। কত কষ্টে যে ওরা দিন কাটায় ভাবতে পারবে না।'

একটু ভেবে অবনীমোহন বললেন, 'আমার ধারণা ছিল, এ দেশের সব মানুষ খুব সুখে আছে।'

'ধারণাটা ঠিক না।'

'তাই তো দেখছি।'

একটু নীরবতা। তারপর অবনীমোহনই আবার শুরু করলেন, 'এত প্রচুর ফসল এদেশে, এত সস্তাগণ্ডা, তবু লোকে খেতে পায় না! আশ্চর্য ব্যাপার।'

হেমনাথ আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন। আবছা গলায় বললেন, 'সত্যিই আশ্চর্য।'

'আচ্ছা মামাবাবু—'

'বল—'

'এভাবে এত কষ্টের ভেতর কতদিন মানুষ বাঁচতে পারে?'

'বংশ-পরম্পরায় ওরা বেঁচে আছে। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাই এইরকম, কি আর করা যাবে।'

অবনীমোহন উত্তর দিলেন না।

একধারে চুপচাপ বসে দাদু আর বাবার কথাগুলো শুনছিল বিনু। সব বোঝে নি সে। তবু গরীব নিরন্ন ঐ মানুষগুলোর জন্য অসীম দুঃখে তার বুক ভারী হয়ে গেল।

পঁচিশজন লোক রেখেছেন হেমনাথ; তারা সবাই ধলেশ্বরীর চর থেকে এসেছে। উদয়াস্ত খাটলেও একশ' কানি জমির ধান কাটতে, সেই ধান ঝেড়ে শুকিয়ে ডোলে তুলতে কম করেও মাস দুই লাগবে। নতুন লোকগুলো ততদিন এখানেই থাকবে। অর্থাৎ যেতে যেতে তাদের সেই ফাল্গুন মাস।

যতদিন ধানকাটা চলবে ততদিন খোরাকি পাবে লোকগুলো। মজুরি হিসেবে টাকা-পয়সা অবশ্য দেবেন না হেমনাথ; দু' মাস পর দেশে ফেরার সময় প্রত্যেককে তিন মণ করে ধান, দু'খানা করে নতুন লুঙ্গি আর গামছা দেবেন।

উত্তর আর দক্ষিণের দুখানা ঘর লোকগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তাদের নিজেদের। অবশ্য চাল-ডাল-তেল-মশলা স্নেহলতা পাঠিয়ে দেন। রান্নাবান্না ওরা করে নেয়।

লোকগুলো কাজে লাগবার পর থেকেই ছায়ার মতন বিনু তাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে। ভোরবেলা উঠেই কাঠকুটো জেলে ওরা রান্না চড়িয়ে দেয়। তারপর উনুনের চারধারে গোল হয়ে বসে হাত-পা সেঁকতে থাকে। তখনও কুয়াশা আর হিমে চারদিক ঝাপসা; সূর্যের তো দেখাই পাওয়া যায় না। তার বদলে আকাশে দূর প্রান্তে প্রভাতিয়া তারাটা জ্বল জ্বল করতে থাকে।

ওদের ওঠার আওয়াজ পেয়েই আজকাল ঘুম ভেঙে যায় বিনুর। ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে পড়ে। প্রতিদিনই উঠে সে ছাখে, হেমনাথ বসে আছেন। এমনিতেই হেমনাথ তাড়াতাড়ি ওঠেন। ইদানীং ধানকাটা শুরু হবার পর তাঁর চোখ থেকে ঘুম গেছে। সারারাত বোধহয় জেগেই থাকেন।

তাড়াতাড়ি দাদুর সঙ্গে সূর্যবন্দনা সেরে সকালবেলার খাবার খেতে খেতে রোদ উঠে যায়; শীতের নিরুত্তাপ স্তিমিত রোদ।

এদিকে অবনীমোহনও উঠে পড়েন; ওদিকে লোকগুলোর খাওয়াও হয়ে যায়। সকালবেলায় অবশ্য ওরা ভরপেট খায় না। নাকেমুখে দু-চার গরাস কোনরকমে গুঁজে বাকি ভাত-তরকারি আর নুন-লঙ্কা-পেঁয়াজ মেটে পাতিলেবু ভরে গামছায় বেঁধে নেয়।

সকালে খাওয়া হলে আর একদণ্ডও বসে থাকে না লোকগুলো। ধানকাটা কাঁচি, ভাতের পাতিল আর তামাকের যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে ঝাঁক বেঁধে বেরিয়ে পড়ে। হেমনাথ, অবনীমোহন আর বিনুও রোজ তাদের সঙ্গে চলে যায়। ধানকাটা শুরু হতেই লেখাপড়া একরকম বন্ধ করে দিয়েছে বিনু।

এমনিতে কোন রাস্তা নেই। জমির আলের ওপর দিয়ে পথ। আলপথের ঘাস শিশিরে ভিজে থাকে। পৌষ মাসের সকালে তার ওপর দিয়ে যেতে যেতে পা শিরশির করতে থাকে বিনুর। অঘ্রানের মাঝামাঝি থেকেই উত্তুরে হাওয়া ছাড়তে শুরু করেছিল। পৌষ মাসে তার যেন দাঁত বেরিয়েছে। শরীরের যে জায়গাগুলো খোলা, বাতাস যেন সেখানে কেটে কেটে বসে।

যতখানি সম্ভব বিনুরা দামী গরম জামা-কাপড়ে গা মুড়ে আসে। কিন্তু

ধানকাটা এই লোকগুলোর বড় কষ্ট। আচ্ছাদন বলতে লুঙ্গি আর মার্কিন কাপড়ের পিরহানের ওপর জ্যালজ্যালে চাদর; অনেকে আবার চাদরটাও জোটাতে পারেনি। পৌষ মাসের শীতল প্রভাতে খোলা আকাশের তলায় হু-হু উত্তুরে বাতাসের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে লোকগুলো হি-হি করে কাঁপতে থাকে। রোদ থেকে যে ভরসা পাবে তারও উপায় নেই। এই শীতে সূর্যালোক বড় কৃপণ বড় কুণ্ঠিত, বড় নিস্তেজ। যদিও রোদ উঠে যায়, কাছে-দূরে কুয়াশার পর্দাগুলো ঝুলতে থাকে। কুয়াশার জন্য পরিষ্কার কিছুই চোখে পড়ে না। উত্তরের চক, দক্ষিণের চক, পুব-পশ্চিমের আদিগন্ত ধানের-খেত—সব কিছুই ঝাপসা নিরবয়ব।

যেতে যেতে লোকগুলো বলাবলি করে, 'এই বছর বেজায় শীত। বড় ত্যিয়ল (কুয়াশা)।'

'হ।'

'হাত-পাও কালাইয়া (শীতে জমে যায়) যায়।'

'হ।'

'সুজনগঞ্জের হাট থন একখান চাদর যদি কিনতে পারতাম।'

'চাদরের যা দাম!'

'কত?'

'আড়াই ট্যাহা তিন ট্যাহা—'

'হায় আল্লা, অত ট্যাহা কই পামু!

একটু চুপচাপ।

তারপর কে একজন ডেকে ওঠে, 'বছির ভাই—

বছির নামে লোকটি তক্ষুনি সাড়া দেয়, 'কী কও তাহের ভাই—'

তাহের বলে, 'ধান কাটতে বাইর হওনের সময় ছোট মাইয়াটার ধুম জ্বর দেইখা আইছিলাম—'

'হ—'

'অহন কেমুন আছে, কেঠা জানে।'

'মনখান খারাপ লাগে?'

'হ।'

'মাইয়ার ব্যারাম, তোমার বাইরণ (বার হওয়া) ঠিক হয় নাই।'

বিষণ্ণ গলায় তাহের বলে, 'তুমি তো কইলা বাইরণ ঠিক হয় নাই। কইয়াই খালাস। কিন্তুক—'

‘কী ?’ জিজ্ঞাসু সুরে বছির শুধোয়।

তাহের বলে, ‘ধানকাটা হইয়া গেলে তিন মণ ধান পামু ; লুঙ্গি গামছা পামু দুইখান কইরা। মাইয়া লইয়া ঘরে বইসা থাকলে কে আমারে এই সগল দিব ? এই ধানটা পাইলে দুই মাসের লেইগা নিচ্চিন্তি—’

‘তয় আড়বুইঝার (আবুঝ) লাখান কথা কইতে আছিলি যে বড়। মাইয়া বাচুক-মরুক, এইটা কি আমাগো ঘরে বইসা থাকনের সময় ?

‘না।’

‘বাইচা থাকলে মাইয়া লইয়া পরে সুহাগ করণ যাইব।’

‘হ।’

একটু চুপ করে থেকে বছির বলে, ‘তোমার মাইয়ার কথায় আমার একখান কথা মনে পড়ল তাহের ভাই—’

তাহের বলে, ‘কী ?’

‘আহনের সময় বউর হাতে তিনখান ট্যাহা দিয়া আইছিলাম ; ঘরে আছিল তিন পাসারি চাউল ; দুই স্যার তিল আর এক আগইল (ধামা) কাঔনের (কাউনের) চাউল। দুইটা মাস চাইরটা পোলা মাইয়া লইয়া কেমনে যে চালাইব !’

তাহের উত্তর দেয় না।

বছির আবার বলে, ‘ঘরে এক টুকরা সোনা-দানা নাই যে বেইচা কি বান্ধা দিয়া দুইটা পয়সা পাইব ! কী যে করব বউটা !’

তাহের এবার বলে, ‘ভাইবো না মেয়াভাই—’

বছির উত্তেজিত হয়ে ওঠে, ‘ভাবুম না, কও কী ?’

‘ভাইবা কী করবা ? পথ আছে কোনো ? শুদাশুদি মন খারাপ। তার থনে যা করতে আছ কর।’

ধানকাটা লোকগুলোর টুকরো টুকরো ঘর-সংসারের কথা শুনতে শুনতে একসময় বিনুরা জমিতে এসে পড়ে।

ধানখেতে এসে প্রথমে লোকগুলো এক ছিলিম করে তামাক খেয়ে গা গরম করে নেয়। তারপর জামাটি খুলে সযত্নে গাছের ডালে ঝুলিয়ে মালকোঁচা মারে ; তারও পর খাঁজকাটা বাঁকানো ধারাল কাস্তেটি হাতে নিয়ে খেতে নামে। শুরু হয়ে যায় ধানকাটা ; সমস্ত মাঠ জুড়ে শব্দ ওঠে খস্‌র্‌-র্‌—খস্‌। গোড়া কেটে খড়সমেত ধানের গোছা কেটে একেক জন একেক জায়গায় স্তূপাকার করতে থাকে।

হেমনাথের বসবার সময় নেই। মাঠময় ঘুরে ঘুরে তিনি ধানকাটা তদারক করতে থাকেন। অবনীমোহন আর বিনুও বসে না। হেমনাথের পিছু পিছু ঘুরতে থাকে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ধানকাটার পর নতুন লোকগুলোর ভেতর থেকে কেউ হয়তো বলে ওঠে, 'মুখ বুইজা কাম করণ যায় না। এই ছ্যামরারা (ছেলেরা) একখান গীত ধর্—'

সঙ্গে সঙ্গে তালমাত্রাহীন বেসুরো গলায় গান শুরু হয়ে যায়—

দোহাই আল্লা মাথা খাও,
হামাক ফেল্যা কই বা যাও,
বিস্বাশ গ্যালে এবার তুমার
সঙ্গ ছাড়ুম না—আ-আ-আ—
বাপো নাই মোর মাও নাই,
একলা ঘরে কাল কাটাই,
গোঁসা করলে আর তো
আমি ছালুন রান্ধুম না—আ-আ-আ—
নয়া শীতের জারাতে
যাইবা যখন ধান দাইতে,
তুমার কাচি কেঁথা, হুক্কা-তামুক
দিমু না—আ-আ-আ—
খসম আমি তুমার
সঙ্গ ছাড়ুম না—আ-আ-আ—
নিদয় হইলে মানুষ পাইবা
পিরীত পাইবা না—আ-আ-আ—

রোজই অবশ্য গান হয় না। কোন কোন দিন অল্পবয়সী ছোকরারা দলের সব চাইতে বর্ষীয়ান কৃষাণটিকে ডেকে বলে, 'একখান পরস্তাব (গল্প) কও খলিল চাচা।'

খলিল বলে, 'কী পরস্তাব শুনবি ?'

'হেই 'গুলেবাখালি' রাজকন্যার—'

'রাজকন্যার পরস্তাবে বড় রস, না ?'

ছোকরারা কিছু বলে না ; শব্দ করে হাসতে থাকে শুধু।

বুড়ো খলিল ধবধবে দাড়ি আর শীর্ণ হাত নেড়ে গল্প জুড়ে দেয়, 'এক আছিল

রাজকন্যা। তার চিকন চিকন চুল, চাম্পা ফুলের লাখান রঙ, মুক্তার লাখান দাঁত। হ্যায় হাসলে হাজারখান চান্দ্ (চাঁদ) য্যান ঝলমলাইয়া ওঠে—'

কাজের ফাঁকে ফাঁকে গান কিংবা গল্প। গানে গানে, গল্পে গল্পে বেলা দুপুর হয়ে যায়। শীতের সূর্য খাড়া মাথার ওপর এসে ওঠে। এই সময়টা ধানকাটা বন্ধ রেখে লোকগুলো পাশের একটা খাল থেকে হাত-পা ধুয়ে ভাতের পাতিল খুলে আলের ওপর সারি সারি খেতে বসে যায়।

দুপুরবেলায় হেমনাথ মাঠে থাকেন না। অবনীমোহন আর বিনুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। জিরোবার সময় নেই। কোনরকমে চান-খাওয়া সেরেই আবার ধানখেতে ছোটেন। এ বেলাও অবনীমোহন এবং বিনু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যায়।

সূর্যটা পশ্চিম আকাশের ঢাল বেয়ে খানিক নেমে গেলেই ধানকাটা বন্ধ করে দেয় লোকগুলো। তখন ফেরার পালা। সকাল থেকে একটানা পরিশ্রমে যে শস্য কেটে কেটে স্তূপাকার করা হয়েছিল, কৃষাণেরা এবার তা মাথায় নিয়ে বাড়ির পথ ধরে। একবারে তো এত ফসল নিয়ে যাওয়া যায় না। তাই বার বার তাদের মাঠে আসতে হয়।

সমস্ত শস্য বাড়ি নিয়ে তুলতে সন্ধ্যে নেমে যায়। তারপর পুকুর থেকে হাত-পা ধুয়ে এসে লোকগুলো উত্তর আর দক্ষিণের ঘরে বসে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেয়।

সারাদিন তো কাছে কাছেই থাকে; বাড়ি ফিরেও তাদের সঙ্গ ছাড়ে না বিনু। উত্তর কি দক্ষিণের ঘরে গিয়ে ওদের কথা শোনে।

লোকগুলোকে সারাদিন দেখেও বিনুর বিস্ময় কাটে না। কোথায় কতদূরে তাদের দেশ কে জানে। ঘর-সংসার ছেলেমেয়ে ফেলে শুধু দু মুঠো ভাতের জন্য তারা এখানে পড়ে আছে। কতদিন ওরা বাড়ি নেই; বাবাকে না দেখে ওদের ছেলেমেয়েদের মন খারাপ হয়ে যায় না? বিনু ভাবতে চেষ্টা করে।

যাই হোক, সমস্ত দিন তো কথা বলার ফুসরত নেই। সন্ধ্যেবেলা মাঠ থেকে ফেরার পর লোকগুলো বিনুর সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়।

বছির বলে, 'অ বাবুগো পোলা—'

বিনু তক্ষুনি সাড়া ছায়, 'কী বলছ?'

'আপনের নাম কী'?

'বিনু—বিনয়কুমার বসু।'

'বড় বাহারের নাম।' বছির বলতে থাকে, 'কিষাণগো কাম আপনের ভাল লাগে ?'

বিনু ঘাড় হেলিয়ে বলে, 'হ্যাঁ।'

'আমাগো লগে ধান কাটবেন ?'

বিনু উত্তর দেবার আগেই ওধার থেকে বুড়ো খলিল বলে ওঠে, 'কী যে ক'স বছিরা, বাবুগো পোলায় ধান কাটব কোন্ দুঃখে ? লেখাপড়া শিখা দারোগা হইব, ম্যাজিস্টর হইব।'

বছির বলে, 'আমি তামসা করলাম স্যান- -'

এমনি টুকরো টুকরো কথা। কথায় কথায় শীতের রাত ঘন হতে থাকে। উত্তুরে বাতাস বাগানের গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে শনশনিয়ে ছুটে যায়। কোথায় যেন কালাবাদুড় ডানা ঝাপটায় ; রাতজাগা পাখিরা গাঢ় গলায় খুনসুটি করে। ভারী কুয়াশা জমে জমে চারদিক ঝাপসা হয়ে যায়।

হঠাৎ এক সময় খেয়াল হতে ব্যস্তভাবে কেউ বলে ওঠে, 'রাইত মেলা হইল ; আর কত গপ করবি ? ভাত বসাইতে হইব না ?'

সবাই চকিত হয়ে উঠে পড়ে।

ওদিকে ভেতর-বাড়ি থেকে স্নেহলতার গলা ভেসে আসে, 'বিনু—বিনু, খাবি আয়—'

লাফ দিয়ে উত্তর কি দক্ষিণের ঘর থেকে বেরিয়ে বিনু ছুট লাগায়।

শুধু হেমনাথের জমিতেই না, চকের পর চক জুড়ে এখন ধানকাটা চলেছে। শীতের নিস্তেজ রোদেও কৃষাণদের হাতের কাস্তেগুলো ঝকমক করতে থাকে।

হেমনাথের জমির পশ্চিমে রামকেশবের জমি, উত্তরে লারমোরের। ধানকাটা তদারক করার ফাঁকে ফাঁকে লারমোর আর রামকেশব গল্প করতে আসেন।

রামকেশব বলেন, 'এইবার ফলন বেশ ভাল।'

হেমনাথ আর লারমোর মাথা নাড়েন, 'হ্যাঁ—'

'আমার পঞ্চাশ কানি জমিতে কম্ম করে পাঁচ শ' মন ধান উঠবে।'

হেমনাথ বলেন, 'অত ধান দিয়ে কী করবি ?'

রামকেশব বলেন, 'বছরের খোরাকি রেখে বাকিটা বেচে দেব।'

'আমারও তাই ইচ্ছে। তা দরটর কেমন শুনেছিস ?'

'দর বেশ তেজী। সেদিন নিত্য দাসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে বলল।'

'বাজার তেজী থাকলে ভালই। দুটো পয়সা হাতে আসবে।' হেমনাথ বলতে থাকেন, 'তবে একটা কথা।'

'কী ?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকান রামকেশব।

'আমাদের তো সুবিধেই। কিন্তু যাদের জমিজমা নেই, শরীরের খাটুনিই ভরসা, তারা খুব মুশকিলে পড়ে যাবে।'

'তা ঠিক।' রামকেশব আর লারমোর চিন্তিত মুখে মাথা নাড়েন।

একটু নীরবতা।

এক সময় হেমনাথ বলেন, 'যা হবার তা হবে। তারপর লালমোহন—'

'বল—' লারমোর মুখ তুলে তাকান।

'খুব তো ধানখেতে এসে বসে আছ ; তোমার রুগীরা ছাড়লে ? হাটে-টাটে যাচ্ছ না আজকাল ?'

হেমনাথের কোন নেশা নেই। চা-পান-বিড়ি-সিগারেট কিছুই খান না। রামকেশবও তা-ই। লারমোরের কিন্তু নেশার জিনিসটি হাতে পেলে ছাড়াছাড়ি নেই। পেলেন তো দিনে দশবার চা-ই খেলেন ; বাণ্ডিল বাণ্ডিল বিড়ি শেষ করলেন। না পেলেন তো বছরখানেক কিছুই খেলেন না।

আলে কৃষাণদের হুঁকো-কল্কি-তামাক, সব কিছু মজুদ থাকে। পরিপাটি করে একছিলিম তামাক সেজে আয়েস করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে লারমোর বলেন, 'ধানকাটার ক'দিন রুগীদের কাছ থেকে ছুটি নিয়েছি। বলেছি, তেমন জরুরি কেস থাকলে গীর্জায় আসে যেন। বুঝতেই তো পারছ, এই সময়টা ধান-টানগুলো ঠিকমতো তুলতে না পারলে সারা বছর না খেয়ে থাকতে হবে।'

হেমনাথ হাসেন, 'ত্যাগব্রতী হলে কি হবে, আসল ব্যাপারে টনটনে—'

লারমোর জোরে জোরে মাঠ কাঁপিয়ে হাসতে থাকেন, 'যা বলেছ।'

ধানকাটার মধ্যেই একদিন সময় করে নিলেন হেমনাথ। বললেন, 'আজ বিনুদাদা আর আমি মাঠে যাব না ; কৃষাণদের নিয়ে অবনী একলা যাবে।'

অবনীমোহন শুধোলেন, 'আপনার কোন কাজ আছে ?'

'হ্যাঁ।'

'কী ?'

'আজ বিনুদাদাকে স্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে যাব।'

হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ে গেছে ; এমনভাবে অবনীমোহন বললেন, ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি তো একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম।'

হেমনাথ বললেন, 'তুমি মাঠে গিয়ে একা অতগুলো লোককে সামলাতে পারবে তো ?'

'পারব।'

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর হেমনাথের সঙ্গে স্কুলে রওনা হল বিনু। স্টিমারঘাটা, বরফকল, মাছের আড়ত পেরিয়ে ল্যাণ্ড রেভিনিউ অফিসের গায়ে স্কুলবাড়িটা। নাম রাজদিয়া হাই স্কুল।

স্কুল বাড়িটাকে ঘিরে কোন বিস্ময় নেই। টিনের চাল আর কাঁচা বাঁশের বেড়া লাগানো অসংখ্য ঘর সারিবদ্ধভাবে দাঁড়'নো। সামনের দিকে প্রকাণ্ড মাঠ ; সবুজ সতেজ ঘাসে ছেয়ে আছে। মাঠটায় দু'ধারে বাঁশের গোলপোস্ট।

রাজদিয়ার এ প্রান্তে কতবার এসেছে বিনু ; যাতায়াতের পথে দূর থেকে স্কুল-বাড়িটাকে দেখেছে। ভেতরে অবশ্য যায়নি।

আজ হেমনাথের সঙ্গে সামনের মাঠখানা পেরিয়ে স্কুলের দিকে যেতে যেতে বুকের মধ্যেটা কেন যেন দুরু দুরু করতে লাগল বিনুর। হঠাৎ সে ডেকে উঠল, 'দাদু—'

'কিরে—' হেমনাথ মুখ ফিরিয়ে তাকালেন।

'ভর্তি হতে হলে পরীক্ষা দিতে হবে, না ?'

'নিশ্চয়ই দিতে হবে।'

বিনু কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। তার চোখমুখ দেখে কিছু অনুমান করলেন হেমনাথ। বললেন, 'আমায় কিছু বলবি ?'

'হুঁ—'

'কী ?'

খানিক ইতস্তত করে বিনু বলল, 'হেডমাস্টার মশায়কে তুমি চেন ?'

হেমনাথ বললেন, 'চিনব না কেন ?'

'তুমি তাঁকে একটু বলবে—'

'কী বলব ?'

'আমার পরীক্ষা যেন না নেন—'

পূর্ণ দৃষ্টিতে হেমনাথ বিনুকে দেখলেন। তারপর খুব গম্ভীর গলায় বললেন, 'না, তা বলতে পারব না। ভর্তি হতে হলে পরীক্ষা দিতেই হবে।'

বিনু চমকে উঠল। আশ্বিনের শুরুতে রাজদিয়া এসেছে তারা ; এখন পৌষ মাস। হেমনাথের এমন কণ্ঠস্বর আগে আর কখনও শোনেনি সে।

॥ দশ ॥

সামনের মাঠখানা পার হয়ে স্কুলবাড়ির বারান্দায় উঠলেন হেমনাথরা। লম্বা মাটির বারান্দা; তার শেষ প্রান্তে হেডমাস্টারের ঘর। সেখানে উঁচু টুলের ওপর দপ্তরী জাতীয় একটা লোক বসে আছে।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এই সময়টায় স্কুল বন্ধ; ক্লাসঘরগুলোতে তালা লাগানো রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে যাবার কথা। খুব সম্ভব রেজাল্টও বেরিয়ে গেছে। ইংরেজি নতুন বছর না পড়লে নতুন করে ক্লাস শুরু হবে না। সারা বছর একটানা খাটুনির পর ক্লান্ত স্কুল বাড়িটার গায়ে এখন ছুটি আর আলসেমির আমেজ লেগেছে।

দূর থেকেই হেমনাথ চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'এই উপেন—'

টুলের ওপর থেকে দপ্তরীটা চকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল, 'আইজ্ঞা—'

'হেডমাস্টার আছে রে?'

উপেন বলল, 'আছেন—'

কথা বলতে বলতে এগিয়ে এসেছিলেন হেমনাথ। বিনুকে সঙ্গে নিয়ে পর্দা ঠেলে হেডমাস্টারের ঘরে ঢুকলেন।

ঘরখানা প্রকাণ্ড। চারদিকে সারি সারি কাচের আলমারি, তার ভেতর শুধু বই আর বই। আলমারিগুলোর মাথায় গ্লোব, ডাস্টার, ঝাড়ন, চকের বাক্স এবং আরো অসংখ্য জিনিস সাজানো। দেয়ালে দেয়ালে মহাপুরুষদের ছবি। গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, তিলক, বিদ্যাসাগর—এমনি অসংখ্য। তাঁদের কারোকে কারোকে চেনে বিনু; অনেকেই অচেনা।

রবীন্দ্রনাথের ছবিটার তলায় একটা গোলাকার বড় ঘড়ি। তার তলায় মস্ত একখানা টেবিল। টেবিলটার এধারে অনেকগুলো কাঠের চেয়ার। ওধারে একটি মাত্র চেয়ারে যিনি বসে আছেন তাঁর বয়েস ষাটের কাছাকাছি। পরনে মোটা খদ্দরের ধবধবে পাজামা এবং পাঞ্জাবি। চোখে পুরু লেন্সের গোল চশমা।

ভদ্রলোকের গায়ের রঙ টকটকে, ধারাল নাক, তীক্ষ্ণ চিবুক। দীর্ঘ চোখ দুটি অত্যন্ত সজীব আর দূরভেদী। মুখময় কাঁচাপাকা দাড়ি। মাথাটা কিন্তু

একেবারেই সাদা, একটি কালো চুলও সেখানে খুঁজে বার করা যাবে কিনা সন্দেহ। এই বয়সেও মেরুদণ্ড আশ্চর্য ঋজু, চামড়ায় তেমন ভাঁজ পড়েনি।

ঘরে আর কেউ ছিল না। বিনু বুঝতে পারল, ইনিই হেডমাস্টার। তার বুক ডিবডিব করতে লাগল।

হেমনাথদের দেখে হেডমাস্টার উঠে দাঁড়ালেন। একটু অবাক হয়ে বললেন, 'হেমদাদা যে—'

হেমনাথ হাসলেন, 'হ্যাঁ, আমিই—'

বিস্ময়ের রেশ তখনও কাটেনি। হেডমাস্টার বললেন, 'আপনি স্কুলে!'

'সাধে কি আর এলাম রে, দরকারে আসতে হল। তারপর কেমন আছিস মোতাহার।'

'ঐ একরকম। আপনি?'

'খুব ভাল। কখনও আমি খারাপ থাকি?'

'তা বটে।' হেডমাস্টার অর্থাৎ মোতাহার সাহেব হাসলেন, 'কতকাল আপনাকে দেখছি। খারাপ আছেন, এমন কথা কক্ষনো শুনিনি।' বলতে বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'এ কি হেমদাদা, দাঁড়িয়ে কেন? বসুন—বসুন—'

হেমনাথ বসলে মোতাহার সাহেব বসলেন। বিনুও নিঃশব্দে দাদুর গা ঘেঁষে বসে পড়ল।

হেমনাথ বললেন, 'ব্যাপার কী রে? স্কুল ছুটি, তুই একা একা এখানে কী করছিলি?'

'নতুন বছরের বুক লিস্টটা এখনও তৈরি হয়নি, তাই করছিলাম।'

'স্কুল কতদিন বন্ধ থাকবে?'

'জানুয়ারির দু' তারিখ পর্যন্ত।'

'তারপর অন্য সব খবর-টবর কী?'

'কোন্ খবর জানতে চান, বলুন—'

একটু ভেবে হেমনাথ বললেন, 'তোর খবর তো মোটে দুটো। এক কংগ্রেস আর এই স্কুল।'

মোতাহার সাহেব কিছু বললেন না, চশমার কাচ মুছে গভীর দৃষ্টিতে হেমনাথের দিকে তাকালেন।

হেমনাথ থামেননি, 'বিয়ে করলি না, সাদি করলি না, ঘর নেই, সংসার নেই। চিরটা কাল স্কুল আর কংগ্রেস নিয়েই থাকলি।'

মৃদু গলায় মোতাহার সাহেব বললেন, 'কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে

তো। সত্যি বলছি হেমদাদা, স্কুল আর কংগ্রেস ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতেই পারি না।' বলে হাসলেন।

হেমনাথ বললেন, 'অনেকদিন তোর কাছে আসা হয়নি, তা স্কুল কেমন চলছে?'

'ভালই। তবে—'

'কী?'

'আমার বড় ইচ্ছা স্কুলবাড়িটা পাকা হোক—'

মোতাহার সাহেবের কথা শেষ হবার আগেই হেমনাথ বলে উঠলেন, 'এক শ' বার হওয়া উচিত। দু-চার বছর পর পর বর্ষায় কঁ্যাচা বাঁশের বেড়া নষ্ট হয়ে যায়, মাটির ভিত যায় ধ্বসে। সে সব কতবার তো পাল্টালি। বার বার কামলা লাগিয়ে খরচও তো কম হয় না।'

'খরচ বলে খরচ! স্কুলের কত আর আয় বলুন। বেশির ভাগ ছেলেই তো ফ্রী, হাফ ফ্রী-তে পড়ছে—'

হেমনাথ বললেন, 'একবার একটু কষ্ট করে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতে পারলে সব দিক থেকেই ভাল।'

মোতাহার সাহেব বললেন, 'কিন্তু টাকা পাব কোথায়? আপনি তো জানেন, গভর্ণমেণ্ট থেকে একটা পয়সাও পাওয়া যাবে না।'

'কেন যাবে শুনি? সারা গায়ে কংগ্রেসের গন্ধ মাখিয়ে রেখেছিস, ইংরেজদের তাড়াবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিস। আর ওরা দেবে টাকা!'

হাসতে হাসতে মোতাহার সাহেব বললেন, 'তাই ভাবছিলাম, দু-একদিনের ভেতর আপনার কাছে যাব।'

পাকা ভুরু কুঁচকে হেমনাথ বললেন, 'আমার কাছে কেন?'

'আপনার কাছে ছাড়া আর কার কাছে যাব।'

'আমি বুঝি তোর স্কুলের জন্যে টাকার থলে নিয়ে বসে আছি?'

'তা জানি না।'

'তবে কী জানো শুনি?'

মোতাহার সাহেব গভীর গলায় বললেন, 'একটা কথাই জানি। তা হল, রাজদিয়ার হেমনাথ মিত্রের কাছে কোন শুভ কাজের আর্জি নিয়ে গেল কেউ কখনো বিমুখ হয়ে ফেরে না।'

হেমনাথ বললেন, 'আমাকে তোরা কল্পতরু পেয়েছিস নাকি?'

'পেয়েছিই তো।'

'কিন্তু—'

জিজ্ঞাসু চোখে মোতাহার সাহেব বললেন, 'কী ?'

চিন্তিত মুখে হেমনাথ বললেন, 'স্কুলবিল্ডিং করে দেবার মতন অত টাকা তো আমার নেই। অবশ্য একটা কাজ করা যেতে পারে—'

'কী কাজ ?

'সবার কাছ থেকে টাকা তোলা। যার যেমন সাধ্য সে তেমন দেবে। মোট কথা একটা ফাণ্ড খোলা দরকার।'

'সে আপনি যা ভাল বোঝেন—'

'তুই কবে আমার বাড়ি যাচ্ছিস ?'

'কবে যেতে বলেন ?'

'যেদিন তোর খুশি—'

'পরশু সকালে যাব।'

'আচ্ছা।'

একটু নীরবতা।

তারপর মোতাহার সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, 'যাক, আমার দুর্ভাবনা কাটল। স্কুলবাড়ি এবার হয়ে যাবেই।'

হেমনাথ হাসলেন, 'স্কুলের কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে আমার ভালই লাভ হল, দেখছি। তারপর তোর কংগ্রেসের খবর কী ?'

নিমেষে হাসি থেমে গেল। কপালে অসংখ্য রেখা ফুটল মোতাহার সাহেবের। গম্ভীর গলায় বললেন, 'খুবই সাঙ্ঘাতিক। খবরের কাগজে নিশ্চয়ই দেখেছেন, ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্টে ছোট-বড় সব নেতাই অ্যারেস্টেড, সত্যাগ্রহ শুরু হয়ে গেছে।'

'দেখেছি। তোর কী মনে হয় ?'

'আমার তো মনে হয়, ভেতরে ভেতরে ইংরেজরা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। ভেতরে যত কাবু হচ্ছে, বাইরে অত্যাচার ততই বেড়ে চলেছে।'

'তুই তো এখানকার কংগ্রেসের সেক্রেটারি। তোকে কি অ্যারেস্ট করবে ?'

'বুঝতে পারছি না। তবে—'

'কী ?'

'গেল সপ্তাহে দু-তিন বার পুলিস এসেছিল।'

হেমনাথ বললেন, 'এখানে কি সত্যাগ্রহ শুরু করবি ?'

মোতাহার সাহেব বললেন, 'এখনও কিছু ঠিক করিনি। আরো কয়েকদিন দেখি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হেমনাথ এবার শুধোলেন, 'যুদ্ধের হালচাল কেমন বুঝছিস মোতাহার?'

'খুব খারাপ। মিত্রশক্তি চারদিকেই মার খাচ্ছে। ইওরোপ আফ্রিকার কথা থাক, ইস্টার্ণ ওয়ার্ল্ডের অবস্থাও ভাল না। আমার ধারণা কলকাতায় যে কোনদিন বোমা পড়তে পারে। কলকাতায় বোমা পড়া মানে সারা বাংলাদেশ তোলপাড় হওয়া। কী যে হবে!'

'সেদিন কাগজে পড়লাম, কলকাতায় ব্ল্যাক-আউটের মহড়া চলছে। এয়ার রেডের সব রকম প্রিকশানও নেওয়া হয়েছে।'

'হ্যাঁ।' ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন মোতাহার সাহেব।

হেমনাথ বললেন, 'তোর কী ধারণা, এ যুদ্ধে ইংরেজরা হারবে?'

'বলা মুশকিল। হারুক জিতুক, আমি একটা ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি।'

'কী?'

'ভারতবর্ষের স্বাধীতা খুব বেশি দূরে নেই।'

'হঠাৎ তোর এ ধারণা হল?'

মোতাহার সাহেব থেমে থেমে বলতে লাগলেন, 'হিটলারের বোমা খেয়ে খেয়ে ইংল্যাণ্ডের আর কিছু নেই। যতই ওরা গলা ফাটাক 'আমাদের কিচ্ছু হয়নি,' লোক তা বিশ্বাস করে না। আমরা তো আর ঘাস খাই না, আসল ব্যাপারখানা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারি। যুদ্ধ থেমে গেলে ইংল্যাণ্ডে রিকনস্ট্রাকশনের প্রশ্ন দেখা দেবে। তখন নতুন করে পোড়া ঘর তুলবে, না এতদূরে ইণ্ডিয়ার কলোনী সামলাবে? অবশ্য—'

'কী?'

'এই হচ্ছে সব চাইতে বড় সুযোগ; আমাদের তা হাতছাড়া হতে দেওয়া উচিত নয়। একবার যদি এ সুযোগ আমাদের হাতের বাইরে চলে যেতে দিই, পরে আপসোস করেও কূলকিনারা পাব না।'

হেমনাথ বললেন, 'সুযোগ বলতে?'

মোতাহার সাহেব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। ইংরেজ এখন যুদ্ধ নিয়ে অস্থির হয়ে আছে। ইওরোপে-এশিয়ায়-আফ্রিকায়, যেদিকেই তাকানো যাক, শুধু বারুদের গন্ধ। এ সময় সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে যদি একটা আন্দোলন করা যেত?

হেমনাথ বললেন, 'তোর কি ধারণা, শীগ্‌গিরই কোন মুভমেণ্ট শুরু হবে?'

'আমার তো তাই মনে হয়। এ সময় যদি মুভমেণ্ট না করা যায় তবে আর কবে হবে? দেখা যাক, নেতারা কী করতে বলেন—'

হেমনাথ এবার আর কিছু বললেন না। তাঁর পাশে বসে দাদু আর মোতাহার সাহেবের কথা শুনছিল বিনু। অল্পস্বল্প বুঝতে পারছিল সে, তবে বেশির ভাগই অবোধ্য।

একটুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর মৃদু হেসে মোতাহার সাহেব বললেন, 'দেশের কথা, কংগ্রেসের কথা এখন থাক। তখন কী একটা দরকারের কথা বলছিলেন যেন—' বলতে বলতে হঠাৎ বিনুর দিকে লক্ষ্য পড়ল, 'ছেলেটি কে হেমদাদা?'

'আমার নাতি।'

'কি রকম নাতি?'

কি রকম, হেমনাথ বুঝিয়ে দিলেন।

মোতাহার সাহেব বললেন, 'শুনেছিলাম বটে, কলকাতা থেকে আপনার কে সব আত্মীয়-স্বজন এসেছে। এরাই তা হলে?'

'হ্যাঁ।'

'এবার বলুন দরকারটা কী?'

বিনুকে দেখিয়ে হেমনাথ বললেন, 'দরকারটা এর জন্যেই। ওকে তোর স্কুলে ভর্তি করতে এনেছি।'

মোতাহার সাহেব ঈষৎ অবাক হলেন, 'ভর্তি করতে এনেছেন মানে! ওরা কি এখানে থাকবে?'

'হ্যাঁ।'

'কলকাতা ছেড়ে এই গ্রামে থাকতে ভাল লাগবে!'

'ওর বাবার খেয়াল। কলকাতায় ব্যবসা-ট্যাবসা ছিল। সব তুলে দিয়ে এখানে জমিজমা কিনেছে। ইস্টবেঙ্গল নাকি ওর খুব ভাল লেগেছে।'

'খুব ইণ্টারেস্টিং তো।' মোতাহার সাহেব কৌতূহলের গলায় বললেন, 'ভদ্রলোকের সঙ্গে একদিন আলাপ-টালাপ করতে হয়।'

হেমনাথ বললেন, 'পরশু দিন আমাদের বাড়ি যাচ্ছিস তো, তখন আলাপ করিয়ে দেব'খন।'

'আচ্ছা। কিন্তু হেমদাদা—'

'কী বলছিস ?'

'সামান্য একটা ভর্তির জন্যে আপনি আবার কষ্ট করে নিজে এসেছেন কেন ? এখন তো স্কুল বন্ধ। জানুয়ারির ফার্স্ট উইকে কারোকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন, ভর্তি করে নেব।'

'উঁহু—' জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা নাড়তে লাগলেন হেমনাথ, 'আমার খাতিরে এমনি এমনি ভর্তি করলে চলবে না। যে ক্লাসে ভর্তি হবে তার যোগ্য কিনা পরীক্ষা করে নিতে হবে।'

স্থির চোখে হেমনাথকে দেখলেন মোতাহার সাহেব। তারপর অসীম সম্ভ্রমের সুরে বললেন, 'পরীক্ষা করে নেবার কথা কোন অভিভাবকই বলে না। আপনার ওপর আমার শ্রদ্ধা দশগুণ বেড়ে গেল হেমদাদা। আপনি যখন চাইছেন, পরীক্ষা আমি নেব।'

'আজ যখন এসে পড়েছি, আজই নিয়ে নে। পরে না হয় মাইনে-পত্তর দিয়ে ফী-বুক, বুকলিস্ট নিয়ে যাবে।'

মোতাহার সাহেব অদ্ভুত হাসলেন।

হেমাথ শুধোলেন, 'হাসলি যে ?'

'আমাকে বুঝি আপনার বিশ্বাস নেই। পাছে অন্য কারো সঙ্গে পাঠালে পরীক্ষা না নিই তাই এখনই নিতে বলছেন।'

বিব্রতভাবে হেমনাথ বললেন, 'না, ঠিক তা নয়।'

হাসতে হাসতেই মোতাহার সাহেব বললেন, 'বেশ বেশ, আপনার যখন এতই অবিশ্বাস তখন পরীক্ষাটা এখনই নিয়ে নিচ্ছি।'

দাদুর ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছিল বিনুর। হেডমাস্টারমশাই যেখানে এমনিতেই ভর্তি করে নিতে চাইছেন সেখানে দাদু 'পরীক্ষা' 'পরীক্ষা' করে অস্থির হয়ে উঠেছেন। শুধু রাগই না, তার সঙ্গে অভিমানও মিশল।

চোখে প্রায় জলই এসে যাচ্ছিল বিনুর; সেই সময় মোতাহার সাহেবের গলা শোনা গেল, 'তোমার নাম কী ?'

বিনু চমকে উঠল। বুকের ভেতরটা ভয়ানক দুলতে লাগল তার। কাঁপা গলায় বলল, 'বিনয়কুমার বসু—'

'বাবার নাম ?'

'অবনীমোহন বসু—'

চোখ কুঁচকে মোতাহার সাহেব বলেন, 'শুধু অবনীমোহন বসু ? বাবার নামের আগে একটা শ্রীযুক্ত বসাতে হয় তাও জানো না ?'

মুখ নীচু করে বসে রইল বিনু।

'কলকাতায় কোন স্কুলে পড়তে ?'

'সাউথ সাবারবনে—'

'কোন্ ক্লাস ছিল ?'

'সেভেন।'

'তার মানে এইটে ভর্তি হবে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, ঐ ছবিটা কার বল তো ?'

চোখ তুলতেই বিনু দেখতে পেল, মোতাহার সাহেব ডানদিকের দেয়ালে একটি ছবির দিকে আঙুল নির্দেশ করেছেন।

ছবির মানুষটিকে বিনু চিনত। বলল, 'উনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'

'গুড'—' বলেই আরেকটা ছবি দেখালেন মোতাহার সাহেব, 'উনি ?'

'লালা লাজপত রায়।'

'আচ্ছা বলতে পার, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কবে হয়েছিল ?'

ভাগ্য ভাল, উত্তরটা জানা ছিল বিনুর। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, '১৯০৫-এ—'

'ভেরি গুড—'

নিঃশব্দে বসে ছিলেন হেমনাথ। হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এ সব কী পরীক্ষা রে মোতাহার ?'

'এগুলোই তো আসল পরীক্ষা দাদা—' মোতাহার সাহেব বলতে লাগলেন, 'দেশের ছেলে দেশের সত্যিকার খবর রাখে কিনা সেটা জানা দরকার।'

'একটু পড়াশোনার কথাও জিজ্ঞেস কর—'

নিশ্চয়ই করব।'

গোটা পাঁচেক ট্রানশ্লেসন ধরলেন মোতাহার সাহেব, বিনু তিনটে পারল। অ্যালজেব্রার ফরমূলাগুলো ঠিক ঠিক বলল। বাংলা ব্যাকরণের উত্তরগুলোও নির্ভুল হল।

পরীক্ষা হয়ে যাবার পর মোতাহার সাহেব বললেন, 'বিনয়বাবু আমাদের বেশ ভাল ছেলে। স্কুল খুললে রোজ ক্লাস করবে, বুঝলে ? একদিনও ফাঁকি দেবে না।'

'আজ্ঞে না—' বিনু আধফোটা গলায় বলল। তারপর মাথা হেলাল।

হেমনাথ বললেন, 'ক্লাস এইটে ও পারবে তো ?'

মোতাহার সাহেব বললেন, 'নিশ্চয়ই পারবে। দেখবেন, স্ট্যাণ্ড করবে।'

আরো কিছুক্ষণ এলোমেলো কথার পর হেমনাথ বললেন, 'এবার তা হলে উঠি—'

'এখনই উঠবেন?'

'হ্যাঁ, ধানকাটা চলছে। একবার মাঠে যাওয়া দরকার।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন হেমনাথ। তারপর হঠাৎই যেন কথাটা মনে পড়ে গেল। বিনুর দিকে ফিরে বললেন, 'মাস্টারমশাইকে প্রণাম কর।'

মোতাহার সাহেবকে প্রণাম করে বিনু যখন উঠে দাঁড়াল, হেমনাথ আবার বললেন, 'এঁকে আজ প্রথম দেখলে, ভবিষ্যতে অনেকবার দেখবে। জীবনে এই মানুষটির মতন হবার চেষ্টা কোরো।'

॥ এগার ॥

ধানকাটার মধ্যে সময় করে একে একে সুধা, সুনীতি এবং ঝিনুককেও ভর্তি করে দিলেন হেমনাথ। সুধা-সুনীতিকে কলেজে, ঝিনুককে, মেয়েদের স্কুলে।

স্থির হয়েছে, আপাতত ঝিনুক এই বাড়িতেই থেকে যাবে। এখানে থেকেই লেখাপড়া করবে। পরে যা-হয় ভেবে ঠিক করা যাবে। ভবতোষও এতে রাজী হয়েছেন। না-হয়ে উপায়ই বা কী? তাঁর কলেজ খুলে গেছে। ফাঁকা বাড়িতে ঝিনুককে কার কাছে রাখবেন? কে তাকে দেখবে? সব দিক বিবেচনা করে এই ব্যবস্থাই ভবতোষের ভাল মনে হয়েছে।

সবাই ভর্তি-টর্তি হয়ে যাবার দিনকয়েক পর এক সন্ধ্যেবেলায় লারমোর এসে হাজির। এ বাড়িতে তাঁর অনিয়মিত যাতায়াত নিয়ে স্নেহলতার অভিমান আছে। অবশ্য সে অভিমানের ভেতর জ্বালা নেই; স্নিগ্ধ কৌতুকের আভায় তা ঝলমলে।

অনেকদিন পর লারমোর আজ এ বাড়ি এলেন। দীর্ঘকাল না আসার জন্য যথারীতি অনুযোগ করলেন স্নেহলতা, ঠাট্টা-টাট্টাও করলেন।

হাত জোড় করে পুরোপুরি আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে লারমোর বললেন, 'এইবার—এইবারটা শুধু ক্ষমা করে দিন বৌ-ঠাকরুন। ক'দিন পর থেকে দেখবেন, রোজ আসছি।'

লারমোরের সারল্য, কাঁচুমাচু মুখভঙ্গি, করুণ ক্ষীণ কণ্ঠস্বর—সব মিলিয়ে এমন একটা আবহাওয়া তৈরী করে যাতে না হেসে কেউ পারে না। আজও সবাই হাসল। স্নেহলতা কিন্তু হাসলেন না। তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটিতে লারমোরকে বিদ্ধ করতে করতে বললেন, 'যেদিন থেকে সাহেব তোমার সঙ্গে আলাপ সেদিন থেকেই তো ঐ কথা শুনে আসছি। তা প্রায় চল্লিশ বছর হতে চলল।'

'যা হবার হয়ে গেছে। এবার থেকে আমি সুবোধ বালক হয়ে যাব।'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

'কতবার তো প্রতিজ্ঞা করা হল। সে যাক্গে, এতদিন পর কোত্থেকে উদয় হলেন? করছিলেন কী?'

'রুগী-টুগী ছিল। তার ওপর ধানটান উঠছে। নানা ঝঞ্ঝটে আর আসা হচ্ছিল না।'

স্নেহলতা শুধোলেন, 'আজ হঠাৎ কী মনে করে?'

লারমোর একটু যেন অবাকই হলেন, আহতও। বললেন, 'বারে, সব ভুলে গেছেন!'

তবু মনে করতে পারলেন না স্নেহলতা। অপ্রস্তুত মুখে বললেন, 'কী বলুন তো?'

হেমনাথ খানিক দূরে বসে ছিলেন। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'পরশু পঁচিশে ডিসেম্বর; বড়দিন। তাই না?'

'হ্যাঁ।' আস্তে করে মাথা হেলিয়ে দিলেন লারমোর।

স্নেহলতা লজ্জিত, বিব্রত। বললেন, 'সত্যি, আমার একেবারেই খেয়াল ছিল না। মন আজকাল যে কি বেভুলো হয়ে যাচ্ছে!'

হেমনাথ বললেন, 'বড়দিনের নেমন্তন্ন করতে এসেছ বুঝি লালমোহন?'

লারমোর বললেন, 'হ্যাঁ। পরশুদিন আমার ওখানে সবাই যাবে।'

একটু ভেবে হেমনাথ বললেন, 'গীর্জা পরিষ্কার-টরিষ্কার করিয়েছ? চারধার যা নোংরা করে রেখেছিলে।'

'না। কোথায় আর করানো হল!' লারমোর বলতে লাগলেন, 'ধানকাটা শুরু হয়ে গেল; তাই নিয়ে মেতে উঠলাম।'

'চমৎকার!' হেমনাথ অত্যন্ত রেগে গেলেন, 'পরশু বড়দিন, এখনও নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছ! গীর্জা ধোয়ামোছা মাজা-ঘষা হবে কবে?'

‘কাল সকালবেলা তুমি যদি একবার আসো—’

‘যেতেই হবে। ভাবছি যুগলকে নিয়ে যাব।’

‘তাহলে খুব ভাল হয়, আমার ওখানে পরানের মা আছে। সবাই হাত লাগালে কতক্ষণ আর লাগবে।’

একটু চুপ করে থেকে হেমনাথ বললেন, ‘যা দেখছি, গীর্জা সাফটাফ করে সাজিয়ে-গুছিয়ে কাল আর আমার ফেরা হবে না।’

‘কাল তোমাকে ফিরতে দিচ্ছে কে? তুমি ফিরবে পরশুদিন বিকেলে।’ বলতে বলতে লারমোরের হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল, ‘ভাল কথা—’

‘কী?’

‘আমরা না-হয় পরিষ্কার-টরিষ্কার করব। গীর্জা সাজানোর ভার সুধাদিদি সুনীতিদিদিকে দিলে কেমন হয়?’

‘খুব ভাল, খুব ভাল—’

‘তা হলে কাল বিকেলে সুধা-সুনীতিকে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে দেব। বাকি সবাই পরশু যাবে।’

‘আচ্ছা।’

একধারে বসে বসে চুপচাপ সবার কথা শুনে যাচ্ছিল বিনু। হঠাৎ সে বলে উঠল’ ‘কাল সকালে দাদুর সঙ্গে আমিও যাব।’

সুরমা ওধার থেকে তাড়াতাড়ি বললেন, ‘না। কাজের মধ্যে গিয়ে তোমাকে আর ঝঞ্ঝাট করতে হবে না। আমাদের সঙ্গে তুমি পরশুদিন যাবে।’

বিনুর মুখখানা কালো হয়ে গেল।

লারমোর বিনুকে লক্ষ্য করছিলেন। সস্নেহ গলায় বললেন, ‘না-না, পরশুদিন নয়। কালই তুমি যাবে।’

ঝিনুক এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। বিনুর যাবার ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে দেখে হিংসুটি মেয়েটা আর মুখ বুজে থাকতে পারল না। কান্নার মত সরু গলায় হঠাৎ বায়না জুড়ে দিল, ‘বিনুদাদা গেলে আমি যাব, আমি যাব।’

অত্যন্ত বিরক্ত চোখে বিনু ঝিনুকের দিকে তাকাল। মেয়েটা তার পেছনে সব সময় প্রায় জোঁকের মতন লেগে আছে।

লারমোর বললেন, ‘হ্যাঁ-হ্যাঁ, যাবি। নিশ্চয়ই যাবি।’

সুধা-সুনীতিও এ ঘরেই ছিল। সুধা হঠাৎ বলল, ‘বড়দিনে আমাদের ক্রিসমাস কেক খাওয়াবেন তো লালমোহন দাদু?’

লারমোর হাসলেন, 'এই গ্রামদেশে কেক কোথায় পাব দিদি? তবে—'

'কী?'

'চমচম খাওয়াব, পাতক্ষীর খাওয়াব, রসগোল্লা খাওয়াব। দেখব, কে কত খেতে পারিস।'

সুধা কিন্তু খুঁত খুঁত করতে লাগল, 'বড়দিনে কেক না হলে ভাল লাগে না।'

পরের দিন ভোরবেলা ফীটন পাঠিয়ে দিলেন লারমোর।

ধানকাটা এখনও চলেছে। একশ' কানি জমির ফসল তো অল্পস্বল্প ব্যাপার না যে মুখের কথা খসলেই খেত থেকে উঠে এল।

ঠিক হল, কৃষাণদের সঙ্গে জমিতে গিয়ে অবনীমোহন আজকের দিনটা ধানকাটা তদারক করবেন। কাল ভোরবেলা যুগল ফিরে আসবে। যুগল ফিরলে অবনীমোহন বাড়ির বাকি সবাইকে নিয়ে গীর্জায় যাবেন। কালকের দিনটার ধানকাটা দেখাশোনার ভার থাকবে যুগলের ওপর।

এত ভোরে রোদ ওঠেনি। কুয়াশায় চারদিক আচ্ছন্ন। পৌষের হাওয়া এত ঠাণ্ডা, মনে হয়, বরফের দেশ থেকে ছুটে আসছে। ভেজা মাটি থেকে এমন হিম উঠছে যে পা ফেলা যায় না।

সারা গায়ে গরম জামা-কাপড়, তবু শীত কাটে না। হি-হি কাঁপতে কাঁপতে বিনু-ঝিনুক হেমনাথ এবং যুগলের সঙ্গে ফীটনে গিয়ে উঠল।

গীর্জায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে রোদ উঠে গেল। শীতের রোদ—নিস্তেজ, উত্তাপহীন। তবু তো রোদ। পকেট থেকে হাত বার করে সিঁটনো আঙুলগুলো সেঁকে নিতে লাগল বিনু।

গীর্জায় এসে এক মুহূর্তও বসলেন না হেমনাথ। যুগল আর লারমোরকে সঙ্গে নিয়ে ঝাড়পোঁছ শুরু করে দিলেন। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার সময়টুকু বাদ দিলে সারাদিন ধোয়ামোছা চলতে লাগল।

বিকেলে সুধা-সুনীতি এল। ততক্ষণে ঘষে-মেজে গীর্জাকে ঝকমকে করে তোলা হয়েছে। চারদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

সুধারা আসতে না আসতেই বিনুকে সঙ্গে নিয়ে যুগল বেরিয়ে পড়ল। ঘুরে ঘুরে রাজ্যের ফুল-লতা-পাতা যোগাড় করে গীর্জার সামনে স্তূপাকার করল। নদীপারের মনিহারি দোকান থেকে লাল-নীল-সবুজ নানা রঙের কাগজ কিনে আনল।

লারমোর বললেন, 'সুধাদিদি সুনীতিদিদি, আর কী লাগবে বল—

সুধা-সুনীতি একসঙ্গে বলল, 'আর কিছু না।'

'এবার তা হলে সাজাতে শুরু কর।'

দু বোন কোমর বেঁধে লেগে গেল। ফুল-লতা-পাতায় চমৎকার নক্সা করে গেট সাজাল, তিন-চারটে তোরণ বানাল। লাল-নীল কাগজ কেটে অসংখ্য শিকলি বানিয়ে চারদিকে টাঙিয়ে দিল। দেয়ালের মেজেতে মনোরম আলপনা আঁকল অনেক। একটা ক্রিসমাস-ট্রী বানাল; তার তলায় কাগজ-টাগজ দিয়ে বুড়ো সান্তাক্লজ তৈরী করে দাঁড় করিয়ে দিল। সব চাইতে সুন্দর করে সাজাল যীশুখৃষ্টের ছবিখানা। অবশ্য যুগল-লারমোর-বিনু-ঝিনুক, যার যেমন সাধ্য সুধা-সুনীতিকে সাহায্য করেছে।

রাত পোহালেই বড়দিন। কোথায় কত শতাব্দী আগে বেথলহেমের আকাশে উজ্জ্বল তারাটি দেখা দিয়েছিল। তারপর এই ধূলিধূসর মর্ত্যে আবির্ভাব হয়েছিল মানবপুত্রের। আপন রক্তে এই রিপুতাড়িত জগৎকে তিনি শুদ্ধ করে গেছেন।

সেই জ্যোর্তিময় পুরুষটিকে কৃতজ্ঞ মানুষ আজও ভোলেনি। বহু শতাব্দী পরও বসুন্ধরার এক প্রান্তে রাজদিয়া নামে এক অখ্যাত নগণ্য জনপদে তাঁর পুণ্য জন্মদিন স্মরণ করে তারা ধন্য হচ্ছে।

লারমোর ঘুরছেন, ফিরছেন আর সুসজ্জিত গীর্জা-বাড়িটাকে দেখছেন, যীশুর ছবিখানা দেখছেন। দেখে দেখে সাধ যেন তাঁর মেটে না।

দেখেন আর ঘন আবেগের গলায় লারমোর বলেন, 'চল্লিশ বছর ধরে রাজদিয়ায় আছি। সব বছরই তো বড়দিনের উৎসব হয়। কিন্তু কোন বার এমন করে গীর্জাবাড়ি সাজাতে পারিনি। ভাগ্যিস সুধাদিদি সুনীতিদিদিরা রাজদিয়া এসেছিল! কি আনন্দ যে হচ্ছে!'

ক'ঘণ্টা পরই বড়দিন। গীর্জাবাড়িটার চারধারে ক'টি মানুষ তার জন্য হৃদয় বিছিয়ে রেখেছে।

গীর্জা সাজাতে সাজাতে অনেক রাত হয়ে গেল। তারপর খেয়ে-দেয়ে সবাই শুয়ে পড়ল। কতক্ষণের জন্যই বা শোওয়া। খানিক পরে, তখনও রাতের অন্ধকার রয়েছে, লারমোররা উঠে পড়লেন। এমন যে ঘুমকাতুরে বিনু, সে-ও শুয়ে থাকতে পারল না।

শীতের এই শেষ রাতে চারদিক যখন বরফের মতন ঠাণ্ডা, পেছনের নদী থেকে লারমোর এবং হেমনাথ স্নান করে এলেন। সুধা-সুনীতিও স্নান করতে চেয়েছিল, হেমনাথ করতে দেননি। অভ্যেস তো নেই। শেষে অসুখ-বিসুখ

হয়ে যেতে পারে। দু-একখানা বেশি জামা-কাপড় নিয়ে এসেছিল ওরা। তাড়াতাড়ি মুখ-টুখ ধুয়ে কাপড় বদলে নিল।

এত ঠাণ্ডায় প্যাণ্ট-জামা বদলাতে ইচ্ছা করছিল না বিনুর। হেমনাথ বললেন, 'কি ছেলে রে তুই! উৎসবের দিনে কেউ বাসি জামা-টামা পরে থাকে! যা-যা, পরিষ্কার জামা-প্যাণ্ট পরে নে—'

অগত্যা কি আর করা। চটকানো বাসি জামাটামা ছাড়তেই হল বিনুকে। দেখাদেখি ঝিনুকও চট করে ফ্রক বদলে নিল।

এদিকে যীশুর ছবির সামনে অসংখ্য মোমবাতি দিয়েছেন লারমোর। তারপর সবাইকে ডেকে পবিত্র শুদ্ধ মনে চোখ বুজে আশ্চর্য সুরেলা গলায় বড়দিনের প্রার্থনা শুরু করে দিলেন। যীশু-বন্দনার পর বাইবেল থেকে তাঁর প্রিয় ক'টি পদ আবৃত্তি করলেন :

Make a jayful noise
unto the Lord, all ye lambs
Serve the Lord with gladness.
Come before his presence with singing.
Know ye that the Lord he is
God. it is he that hath made us.
And not we ourselves ; we are his
People, and the sheep of his pasture.

আবৃত্তি হয়ে গেলে অসংখ্য পবিত্র প্যারাবেল শোনালেন লারমোর। ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেণ্ট থেকে অনেক কথা শোনালেন। যীশুর জন্ম থেকে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত পুণ্য জীবনকাহিনী বললেন। বুড়ো সান্তাক্লজের কথা বললেন। হেমনাথ-সুধা-সুনীতি-বিনু-ঝিনুক সবাই অভিভূত হয়ে শুনতে লাগল।

যীশুভজনা শেষ হতে হতে ভোর হয়ে গেল ; ঘন-করে-বোনা কুয়াশার ভারী পর্দাগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে রোদ উঠল।

রাত থাকতে থাকতেই যুগল বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। তাকে আবার কৃষাণদের সঙ্গে মাঠে যেতে হবে।

বেলা বাড়লে সুরমা-স্নেহলতাকে নিয়ে অবনীমোহন গীর্জায় এলেন।

শিবানী আসেননি ; ক'দিন ধরে তাঁর জ্বর। তা ছাড়া সবাই চলে এলে তো হয় না ; বাড়ি পাহারা দেবার জন্য এক-আধজন থাকা দরকার।

শুধু হেমনাথদের বাড়ির লোকজনই না, বেলা যত চড়তে লাগল রাজদিয়া এবং দূর-দূরান্তের গ্রাম-গঞ্জ থেকে কত মানুষ যে আসতে লাগল গীর্জায়! চেনা-জানা যাকেই পেয়েছেন তাকেই নেমন্তন্ন করেছেন লারমোর।

যে আসছে তারই হাতে ফল-টল মিষ্টি-টিষ্টি দিচ্ছেন লারমোর ; ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত গীর্জাবাড়ি দেখাচ্ছেন আর বলছেন, 'কেমন দেখলে বল তো ?'

'চোমৎকার! কতকাল ধইরা এই গীজ্জায় বড়দিন দেখতে আছি। কিন্তুক এমুন সাজান-গুছান কোনদিন দেখি নাই।'

'কোত্থেকে দেখবে ? আমরা কি সাজাতে-টাজাতে জানতাম ?'

'এইবার তাইলে এমুন সোন্দর কইরা সাজাইলেন কেমনে ?'

'আমরা কি সাজিয়েছি ?'

'তয় ?'

'আমার নাতনীরা সাজিয়েছে।' বলে সুধা-সুনীতির হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে সগর্বে সবাইকে দেখান লারমোর।

সারাদিনই লোক আসছে। একদল যায় তো আর একদল তক্ষুনি এসে পড়ে। জনস্রোতের আর বিরাম নেই। এ তো শুধু খৃষ্টানদেরই উৎসব নয়, সমস্ত মানবজাতির কাছেই এক পরম পবিত্র দিন। অন্তত রাজদিয়ার মানুষ এইভাবেই দিনটিকে গ্রহণ করেছে।

লোক আসছে, যাচ্ছে। হেমনাথরা কিন্তু ছাড়া পেলেন না।

বেলা অনেকখানি চড়লে স্নেহলতা একবার বললেন, 'বড়দিনের উৎসব তো মিটল। এবার আমরা বাড়ি যাই ?'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন লারমোর, 'কোথায় মিটল! আজ সারা দিনই বড়দিন।'

'তার মানে কী বলতে চান আপনি ?'

'বলতে চাই আজ সারা দিন এখানে থাকতে হবে।'

কপাল কুঁচকে কপট শঙ্কার গলায় স্নেহলতা বললেন, 'সারা দিন !'

'হ্যাঁ, সারা দিন।' লারমোর ঘাড় হেলিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যে পর্যন্ত একটানা গল্পগুজব, খাওয়া-দাওয়া, এবং হাল্কা সুরের ঠাট্টা-টাট্টা চলল। স্নিগ্ধ মনোহর একটি দিন কাটিয়ে অনেক, অনেক রাত্তিরে বিনুরা ফীটনে উঠল। এতক্ষণে বাড়ি ফেরার অনুমতি মিলেছে।

॥ বার ॥

দিনকয়েক পরে এক সকালবেলায় পুবের ঘরের তক্তপোশে বসে ছিল বিনু। নাকের ডগা এবং চোখদুটো বাদ দিলে সারা গা গরম চাদরে ঢাকা। একটা পুঁটুলির মত দেখাচ্ছিল তাকে। বাতাস এমন কন কনে যে চাদরের ভেতর থেকে হাত-পা বার করতে ইচ্ছে হয় না।

একটু আগে ঘুম ভেঙেছে বিনুর। স্কুলে ভর্তির সমস্যাটা মিটে যাবার পর আজকাল বই-টই ছুঁচ্ছে না সে। বিনু জানিয়ে দিয়েছে, নতুন বছরে নতুন ক্লাস শুরু না হলে সে আর পড়ছে না।

দাদুর কাছে যদিও সে শোয়, ইদানীং এত ঠাণ্ডায় ভোরবেলা আর উঠতে চায় না। হেমনাথও টানাটানি করেন না। শীতকালের মাঝামাঝি এই দারুণ দিনগুলোর জন্য বিনুর সূর্যস্তব স্থগিত আছে।

যাই হোক, এখন বেশ বেলা হয়েছে। আকাশের খাড়া দেওয়াল বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে।

জানলার বাইরে তাকিয়ে ছিল বিনু। উঠোনভর্তি এখন শুধু ধান আর ধান, হেমনাথের খেতের ধান—সোনার পাহাড়ের মতন স্তূপাকার হয়ে আছে। উঠোনের পর বাগান, তারপর পুকুর। অঘ্রানের গোড়াতেই পুকুরের ওপারের মাঠ থেকে জল নেমে গিয়েছিল। এখন ওখানকার মাঠ একেবারে নিঃস্ব। কৃষাণেরা ধান কেটে নিয়ে গেছে। ধানকাটা ফাঁকা মাঠ এখন কেমন যেন ধূসর দেখায়। শস্যকণার খোঁজে ঝাঁকে ঝাঁকে মোহনচূড়া পাখি আর বুলবুলি সেখানে চক্কর দিয়ে দিয়ে ফিরছে। এছাড়া আর কেউ নেই, কিছু নেই।

হেমনাথ ঘরে এসে ঢুকলেন। বললেন, 'কী করছিস বিনুদাদা ?'

দূর মাঠের দিকে চোখ রেখেই অন্যমনস্কের মতন বিনু উত্তর দিল, 'বসে আছি।'

কৌতুকের গলায় হেমনাথ এবার বললেন, 'ফাঁকা মাঠের শোভা দেখছিস ?' বলে শব্দ করে হাসলেন।

বিনু কিছু বলল না।

একটু পর পেছন দিকে শব্দ হতে বিনু মুখ ফেরাল। তার চোখে পড়ল, তক্তপোশের তলা থেকে প্রকাণ্ড স্টীলের বাক্স বার করে খুলে ফেলেছেন হেমনাথ। এবং খুব তন্ময় হয়ে ভেতরে কী সব দেখছেন।

আগেও বারকয়েক এই বাক্সখানা খুলে বিভোর হয়ে হেমনাথকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছে বিনু। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

আজ পৌষ মাসের এই অলস সকালে হঠাৎ অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠল বিনু। ডাকল, 'দাদু—'

হেমনাথ প্রথমটা শুনতে পাননি। আরো দু-চারবার ডাকাডাকির পর মুখ তুললেন, 'কী বলছিস ?'

'বাক্সের ভেতর কী দেখছ ?'

উত্তর না দিয়ে হেমনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই দেখবি ?'

বিনুর কৌতূহল ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল। বলল, 'হ্যাঁ।'

'আয়—'

জানলার পাশ থেকে উঠে পড়ল বিনু ; পায়ে পায়ে হেমনাথের কাছে চলে এল।

বাক্সের ডালাটা পুরোপুরি মেলে ধরলেন হেমনাথ। বললেন, 'ত্যাখ—'

ভেতরে চমৎকার চমৎকার সব জিনিস স্তূপীকৃত হয়ে আছে। বেতের সাজি, নক্সা-করা কাশ্মীরি শালের পাড়, বহুবর্ণময় ময়ূরের পালক, অসংখ্য ছবি, মাটির পুতুল, পট, ডাকের সাজের অগণিত নমুনা, কারুকার্য-করা প্রাচীন কাঁথা, নানারকমের রঙচঙে পাথর, মণিপুরী চাদর, মোটা আর্ট পেপারে ঘন কালো কালির মনোহর হস্তাক্ষর, কাঠের এবং হাড়ের রমণীয় শিল্পকার্য—এমনি কত কী।

বিনু অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলল, 'এসব কার দাদু ?'

হেমনাথ বললেম, 'আমার। একটা বাক্স দেখলি তো ?'

'হ্যাঁ।'

'এই রকম আরো পাঁচ ছ'টা বাক্স আছে। এখন আমার বয়েস পঁয়ষট্টির মতন। কুড়ি পঁচিশ বছর বয়েস থেকে এসব জিনিস জমাচ্ছি। যেখানে যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর চোখে পড়েছে, চেয়ে চিন্তে বা পয়সা দিয়ে কিনে এনে জমিয়ে রেখেছি।'

বিনু কী বলতে যাচ্ছিল, কোত্থেকে হঠৎ ঝিনুক এসে হাজির। এক

পলকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে সুর টেনে টেনে বলল, 'বিনুদাদাকে কী দেখাচ্ছ গো ?'

বাক্সের ভেতরটা দেখিয়ে হেমনাথ বললেন, 'এই সব—'

'বিনুদাদাকে দেখালে আমাকেও দেখাতে হবে—' ঝিনুক নাকে-কান্না জুড়ে দিল।

'কাঁদছিস কেন ; ছাখ্ না—'

এই এক মেয়ে হয়েছে। বিনু যা করবে, যা দেখবে, যেখানে যাবে, তারও তাই করা চাই, দেখা চাই, সেখানে যাওয়া চাই।

মনে মনে ঝিনুকের ওপর রেগে গেল বিনু, একবার ইচ্ছা হল ঝুঁটিটা টেনে ছিঁড়ে দেয়। কিন্তু কিছুই করল না। ঝিনুককে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সে বলল, 'এত সব জিনিস জমিয়েছ কেন ?'

হেমনাথ বললেন, 'এমনি, শখ।' একটু চুপ করে থেকে দূরমনস্কের মতন আবার বললেন, 'ঠিক শখ না। ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর জিনিস যোগাড়ের নেশা থাকলে মন খারাপ দিকে যায় না। তা ছাড়া—'

'কী ?'

'মাঝে মাঝে কোন কারণে বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে থাকলে বাক্স খুলে বসি। এসব দেখতে দেখতে সব ভার চলে যায়।'

হেমনাথের শেষ কথাগুলো খানিক বুঝল বিনু ; অনেকখানিই অবোধ্য থেকে গেল। বিমূঢ়ের মতন তাকিয়ে থাকল সে।

হেমনাথ আবার বললেন, 'জিনিসগুলো নষ্ট হয়ে যচ্ছে। সুধা-সুনীতিকে বলব, যেন সাজিয়ে-গুছিয়ে ঠিক করে রাখে।'

দেখতে দেখতে ইংরেজি নতুন বছর পড়ে গেল। আজ থেকে বিনুদের ক্লাস শুরু হবে। একা বিনুর না, সুধা-সুনীতি এবং ঝিনুকেরও।

চারজনেরই স্কুল আর কলেজ কাছাকাছি। খেয়ে-দেয়ে দল বেঁধে তারা বেরিয়ে পড়ল।

প্রথমে পড়ে মেয়েদের স্কুল। সেখানে ঝিনুককে রেখে বাকি তিনজন এগিয়ে গেল। ঠিক হল, ফেরার পথে ঝিনুককে তারা নিয়ে যাবে।

ঝিনুকের পর বিনুর স্কুল। সুধা-সুনীতি তার স্কুলে আর এল না। বড় রাস্তা ধরে সোজা কলেজের দিকে চলে গেল। বিনু ডানদিকের মাঠের ওপর দিয়ে স্কুলবাড়ির দিকে চলল।

মাঠের মাঝামাঝি আসতেই বিনু শুনতে পেল, পেছন থেকে কেউ ডাকছে। এখানে কে ডাকতে পারে তাকে? সবাই তো অচেনা। ঘুরে দাঁড়াতেই সে দেখতে পেল, হেডমাস্টার মোতাহার হোসেন চৌধুরী সাহেব আসছেন।

কাছে এসে মোতাহার সাহেব সস্নেহে হাসলেন, 'স্কুল খোলার দিনই চলে এসেছ।'

বুক ঢিব ঢিব করছিল বিনুর। চোখ নামিয়ে আবছা গলায় বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

'গুড, ভেরি গুড।' বিনুর কাঁধে একখানা হাত রেখে মোতাহার সাহেব বললেন, 'কখন এলে?'

'এইমাত্র।'

'এখনও তা হলে ক্লাসে যাও নি?'

'আজ্ঞে না।'

'এসো আমার সঙ্গে—' বিনুকে সঙ্গে নিয়ে মোতাগার সাহেব তাঁর ঘরে গেলেন।

সেদিন মনে হয়েছিল, এ ঘরখানা হেডমাস্টার সাহেবের জন্য আলাদা করে নির্দিষ্ট। কিন্তু আজ দেখা গেল, অন্যান্য মাস্টার মশাইরাও এখানে বসেন। মোট কথা, এটাই রাজদিয়া হাই স্কুলের টীচার্স কমনরুম।

এখনও স্কুল বসার সময় হয়নি। যে সব মাস্টারমশাই এর মধ্যেই এসে গেছেন তাঁদের সবার সঙ্গে বিনুর আলাপ করিয়ে দিলেন মোতাহার সাহেব। ঐ যে লম্বা রোগা মতন প্রৌঢ়টি, তাঁর নাম আশু দত্ত—ইংরেজির টীচার। উনি সোমনাথ সাহা, অঙ্কের টীচার। উনি রজনী চট্টরাজ, ভূগোলের টীচার। ইত্যাদি—

মাস্টার মশাইদের পরিচয়-টরিচয় দিয়ে মোতাহার সাহেব বললেন, 'এই ছেলেটির নাম বিনয়—বিনয়কুমার বসু। আমাদের হেমদাদার ভাগনীর ঘরের নাতি। এ বছর ক্লাস এইটে ভর্তি হয়েছে। আপনারা একটু লক্ষ্য রাখবেন। ছেলেটি বেশ ব্রাইট।'

হেমনাথের নাতি এবং হেডমাস্টার সাহেবের প্রশংসা শুনে সবাই বেশ আগ্রহান্বিত হলেন। বিনুরা আগে কোথায় ছিল, হঠাৎ রাজদিয়ায় এসে ভর্তিই বা হল কেন, এমন নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন মাস্টার মশাইরা; বিনু উত্তর দিয়ে যেতে লাগল।

কথায় কথায় ক্লাসের সময় হয়ে গেল। দপ্তরী বাইরে ঘণ্টা বাজিয়ে দিল।

মোতাহার সাহেব তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'ক্লাস এইটের প্রথম ক্লাস কার?'

ইংরেজির টীচার রোগা লম্বামতন আশু দত্ত বললেন, 'আমার—'

'বিনয়কে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান। ছেলেমানুষ, আজ নতুন এসেছে—'

বন্ধুর দিকে তাকিয়ে ডাকলেন, 'এসো—'

ক্লাসে আসতে দেখা গেল বেঞ্চিগুলো বোঝাই হয়ে গেছে; ছেলেরা আগেভাগে সেগুলো দখল করে বসে আছে।

বিনু লক্ষ্য করল, বেশির ভাগ ছেলেই তার চাইতে অনেক, অনেক বড়। পেছন দিকে যারা বসে আছে তাদের মুখ দেখে মনে হল, নিয়মিত দাড়িগোঁফ কামায়। দু-একজন বিনুর সমবয়সী থাকতেও পারে। কিন্তু এত ছেলের ভিড়ে এই মুহূর্তে তাদের খুঁজে বার করা অসাধ্য।

ক্লাসের দিকে তাকিয়ে আশু দত্ত বললেন, 'তোমাদের নতুন এক বন্ধু এসেছে। আজই এর সঙ্গে সবাই আলাপ-টালাপ করে নেবে।' বলে বিনুকে দেখিয়ে দিলেন। তারপরেই হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে খুব দ্রুত আবার বলে উঠলেন, 'তবে হ্যাঁ, দুজন এর সঙ্গে মিশবে না, কথাও বলবে না।' বলেই ডাকলেন, 'রুস্তম—পতিতপাবন—'

সঙ্গে সঙ্গে পেছন দিকের বেঞ্চি থেকে ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের দুই গাট্টাগোট্টা জোয়ান উঠে দাঁড়াল। এত বড় বড় ধেড়ে ছেলে যে ক্লাস এইটে পড়তে পারে, বিনুর কাছে তা এক অভাবনীয় ব্যাপার। স্তম্ভিতের মতন তাকিয়ে থাকল সে।

আশু দত্ত বললেন, 'তোমাদের দুজনকে সাবধান করে দিলাম, বিনয়ের পেছনে লাগবে না। ওর সঙ্গে মিশবে না।'

'আইচ্ছা স্যার—' রুস্তম এবং পতিতপাবন দুজনেই ঘাড় হেলিয়ে আবার বসে পড়ল।

ইংরেজির টীচার কেন যে রুস্তম আর পতিতপাবনকে তার সঙ্গে মিশতে বারণ করে দিলেন, বিনু ভেবে পেল না।

বেশিক্ষণ সেই ভাবনাটা নিয়ে থাকা গেল না। সামনের বেঞ্চের ছেলেদের একটু চেপেচুপে বসে বিনুকে জায়গা করে দিতে বললেন আশু দত্ত। বিনু বসলে বললেন, 'রোজ তুমি ঐ জায়গায় বসবে।'

'আচ্ছা স্যার—' বিনু মাথা নাড়ল।

অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর নতুন বছরে আজই প্রথম স্কুল বসেছে। এখনও ছেলেদের বইটই কেনা হয়নি। বই কেনা হবে কোত্থেকে? এখনও বুকলিস্টই দেওয়া হয়নি। কাজেই গল্প করে সময় কাটানো ছাড়া কাজ নেই।

অলস, মন্থর গতিতে একটার পর একটা ক্লাস গড়িয়ে চলল। তারপর একসময় টিফিনের ঘণ্টা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে জলোচ্ছ্বাসের দিশেহারা ঢলের মতন স্কুলবাড়ির সবগুলো ঘর থেকে হুড়মুড় করে ছেলেরা বেরিয়ে পড়ল। স্রোতে গা ভাসিয়ে বিনুও বাইরে এল।

ছেলেরা ছোটাছুটি করছে। একদল সামনের মাঠে 'দাড়িয়াবান্ধা'র কোটে নেমে পড়েছে। আরেকদল খেলছে 'গোল্লাছুট'। তবে বেশির ভাগই শীতের রোদে পিঠ দিয়ে আড্ডা দিচ্ছে।

কারো সঙ্গেই এখনও ভালো করে আলাপ হয়নি। চারদিকে আলতো-ভাবে ভেসে বেড়াতে লাগল বিনু। একবার 'দাড়িয়াবান্ধা'র কোটে, একবার 'গোল্লাছুটে'র আসরে—ঘুরতে ঘুরতে কখন যে মাঠের প্রান্তে সারি সারি কাঠ-বাদাম গাছগুলোর কাছে এসে পড়েছিল, খেয়াল নেই।

হঠাৎ চাপা গলায় কারা যেন ডেকে উঠল, 'বিনয়—'

চমকে এদিক-সেদিক তাকাতেই বিনু দেখতে পেল, ডান দিকের কাঠ-বাদাম গাছটার তলায় রুস্তম, পতিতপাবন এবং তাদের বয়সী আরো দু-তিনটে জোয়ান ছেলে বসে আছে।

মাস্টার মশাই তার সঙ্গে রুস্তমদের মিশতে বারণ করে দিয়েছেন। নিষেধটা একতরফা না। রুস্তমরা যেমন তার সঙ্গে মিশবে না, তাকেও তেমনি ওদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে। বিনুর কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। কাঠবাদাম গাছটার তলায় রুস্তমদের কাছে যাবে কি যাবে না, ঠিক করে উঠতে পারল না।

তার মনোভাবটা রুস্তমরা যেন বুঝতে পারল। বলল, 'ডর নাই, এইখানে মাস্টার মশাই আসব না। আসো—আসো—'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কখন যে রুস্তমদের কাছে এসে বসেছে, বিনু টের পায়নি।

রুস্তম বলল, 'কইলকাতার থনে আইছ?'

'হ্যাঁ—' বিনু মাথা নাড়ল।

একটা ব্যাপার বিনু লক্ষ্য করেছে, রাজদিয়া আসার পর যার সঙ্গেই আলাপ হয়েছে প্রথমেই তারা কলকাতার কথা জানতে চেয়েছে। কলকাতা সম্বন্ধে তাদের মনে অপার অসীম বিস্ময়।

রুস্তমরাও কলকাতা সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করল ; অবাক হয়ে বিনুর মুখে অজানা রহস্যময় দেশটির নানা চমকপ্রদ কাহিনী শুনল। তারপর পকেট থেকে বিড়ির বাণ্ডিল বার করে সবাই একটা করে ধরিয়ে নিল। বিনুর দিকেও একটা বাড়িয়ে দিল।

বিনু চমকে উঠল। প্রথমত, স্কুলের ছেলেরা বিড়ি খায়, এমন দৃশ্য আগে আর কখনও ছাখেনি। তার পক্ষে এ এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। তার ওপর তাকেও বিড়ি সাধছে! বিনুর বুকের ভেতরটা কাঁপতে লাগল। বলল, 'না-না—'

'বিড়ি বুঝি খাও না ?'

'না।'

'তয় কী খাও ? সিগ্রেট ?'

'না—না—'

বিস্ময়ে চোখ গোল হয়ে গেল রুস্তমের, 'বিড়ি খাও না, সিগ্রেট খাও না, কেমুন কইলকাত্তার পোলা !'

বুক থরথর করছিলই ; এখন মাথা ঝিম-ঝিম করতে লাগল। বিনু বলল, 'আমি এখন যাই—'

খপ করে তার একটা হাত ধরে ফেলে রুস্তম বলল, 'আরে যাইবা কই। বসো—বসো—আলাপ-পরিচয়ই হইল না। বিড়িতে একখান টান দিয়াই ছাখ না ; এমুন সুখ আর কিছুতে নাই—'

'না-না, আমাকে ছেড়ে দিন—'

'আরে কী আশ্চয্যি, আমাগো 'আপনে' 'আইজ্ঞা' কইরা কও ক্যান। এক লগে পড়ি, 'তুমি' কইরা কইবা। 'তুই'ও কইতে পার।'

বিনু স্তম্ভিত। পড়লই বা এক ক্লাসে, দামড়া মোষের মতন তাগড়া তাগড়া ঐ জোয়ানগুলোকে কখনও 'তুমি' কি 'তুই' বলা যায়! বিনু উঠবার জন্য ছটফট করতে লাগল।

রুস্তম বলল, 'এমুন কর ক্যান ? আমরা বাঘ না ভাল্লুক ?'

বিনু ফস করে বলে ফেলল, 'মাস্টার মশাই আমার পেছনে আপনাদের না লাগতে বারণ করে দিয়েছেন ?'

তাচ্ছিল্যের গলায় রুস্তম বলল, 'মাস্টার মশইরা অমুন কত কথা কয়। হেই ধইরা বইসা থাকলে চলে নিহি ? আমাগো লগে মিশো, মজা পাইবা।'

'কিসের মজা ?'

রুস্তম উত্তর দিল না। পতিতপাবনের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। বলল, 'তুই-ই কইয়া দে—'

পতিতপাবন কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে থাকল। তারপর খুব চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'রুস্তইমার তিন বিবি; আমারও বউ আছে। মেলা রসের কথা আমাগো জানা; তোমারে শিখাইয়া-পড়াইয়া চালাক কইরা দিমু—'

কথাগুলো ঠিক যে বুঝল বিনু তা নয়। তবে টের পেল এর ভেতর নোংরা অশ্লীল গন্ধ আছে। তার নাক-কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।

রুস্তমরা আবার কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় ঘণ্টা বেজে উঠল। অর্থাৎ টিফিন শেষ।

টিফিনের ঠিক পরের ক্লাসটাই আবার আশু দত্তের। ক্লাসে ঢুকেই তিনি হুঙ্কার দিলেন, 'রুস্তম', পতিতপাবন—'

শেষ বেঞ্চ থেকে দুজন উঠে দাঁড়াল।

আগের গলায় আশু দত্ত আবার বললেন, 'কী বলেছিলাম তোদের?'

ভীত চোখে একবার মাস্টার মশাইকে দেখে ঘাড় নীচু করল রুস্তমরা। আবছা স্বরে বলল, 'আইজ্ঞা—'

'তোদের না বলেছিলাম, বিনয়ের পেছনে লাগবি না। নিজেরা তো জাহান্নামে গেছিসই, বছর বছর ফেল করে এককেটা ধর্মের ষাঁড় হয়ে উঠেছিস। নিজেরা যা খুশি কর্, ছোট ছোট ছেলেগুলোর সর্বনাশ করা কেন?'

'আমরা তো কিছু করি নাই।'

'করিসনি! আবার মিথ্যে বলা হচ্ছে!' রাগে চিৎকার করে উঠলেন আশু দত্ত, 'ভেবেছিস, আমার চোখে কিছুই পড়েনি। টিফিনের সময় বাদাম গাছের তলায় বিনয়কে ডেকেছিলি কেন? বল্ হারামজাদা বদের ধাড়ীরা—'

রুস্তম পতিতপাবন—দুজনেই এবার চুপ। মুখ তুলে মাস্টার মশাইয়ের দিকে তাকাবার সাহসটুকুও তাদের আর অবশিষ্ট নেই।

রুস্তম আর পতিতপাবনের চেহারা অসুরের মতন। অথচ রোগা দুর্বল আশু দত্তর সামনে ভয়ে তারা সিঁটিয়ে গেছে। দৃশ্যটা খুবই মজাদার; বিনুর খুব ভাল লাগল।

আশু দত্ত থামেন নি, 'তোরা হলি দাগী আম; একসঙ্গে থাকলে বাকি-গুলোরও বারোটা বাজাবি। স্কুল থেকে তোদের তাড়াতে হবে, দেখছি। যা, এখন ক্লাসের বাইরে গিনে 'হাফ নীল ডাউন' হয়ে থাক—'

রুস্তম এবং পতিতপাবন সুড়সুড় করে বাইরে চলে গেল ; তারপর ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে 'হাফ নীল ডাউন' হয়ে রইল।

বিনুর খুব হাসি পাচ্ছিল। বাড়ি ফিরে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাটা রঙচঙ ফলিয়ে বলবার জন্য তার আর তর সইছিল না।

॥ তের ॥

পৌষ মাস থাকতে থাকতেই মাঠগুলোকে শূন্য করে দিয়ে ধান উঠে গেল। বাড়ির উঠোনে এখন সোনার পাহাড় সাজানো।

যে পঁচিশজন কৃষাণকে হেমনাথ কাজে লাগিয়েছিলেন তারা আজকাল আর চকে যায় না। খড়সমেত যে ধান তারা কেটে এনেছে সারাদিন ঝেড়ে ঝেড়ে তা থেকে শস্যের দানাগুলোকে আলাদা করে ; তারপর রোদে শুকিয়ে ডোল বোঝাই করতে থাকে। আর খড়গুলো দিয়ে পালা সাজায়।

এদিকে অবনীমোহন মজিদ মিঞার যে জমি কিনেছেন তার ধানও উঠে গেছে। ফসল কেটে নিয়ে যাবার পর মজিদ মিঞা অবনীমোহনকে জমির দখল দিয়ে দিয়েছেন।

দেখতে দেখতে পৌষ সংক্রান্তি এসে গেল। সংক্রান্তির দিন বিনুদের স্কুল আর সুধা-সুনীতির কলেজ ছুটি। এই দিনটিতে এ দেশে অনেকেই বাস্তুপুজো করে থাকে। হেমনাথরাও করেন। অবনীমোহন নতুন জমি কিনেছেন ; ঠিক হয়েছে তিনিও বাস্তুপুজো করবেন।

আগের দিনই দু'জন পুরুত এবং দুজন ঢাকীকে খবর দিয়ে রাখা হয়েছিল। সংক্রান্তির দিন সকালবেলা তারা এসে হাজির।

বাস্তুপুজোর প্রথাটি বেশ। প্রথম পুজোটি হয় বাড়ির মধ্যেই। পুরুত-ঠাকুর চরু রেঁধে বাস্তুদেবকে উৎসর্গ করে। তারপর যেখানে যেখানে জমিজমা আছে সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে পুজো হয়।

এবার দুই পুরুত, দুই ঢাকী এসেছে। কেননা হেমনাথ আর অবনীমোহনের আলাদা আলাদা পুজো হবে।

বাড়ির পুজো সেরে দুই পুরুত দুদিকে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ির মানুষরা দু'ভাগ হয়ে দুই পুরুতের পিছু পিছু চলল। আর দুই ঢাকী ঢাক বাজাতে বাজাতে আগে আগে চলল।

শুধু বিনুদেরই না, এখানে ঘরে ঘরে বাস্তুপুজো। চারদিকের মাঠ জুড়ে কত ঢাক যে বাজছে। কত পুরুতের মন্ত্রোচ্চারণ যে শোনা যাচ্ছে! একদল আধন্যাংটো কালো কালো ছেলেমেয়ে একটু প্রসাদের আশায় এ-খেত থেকে ও-খেতে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে।

ঢাকের বাজনা শুনতে শুনতে, বাতাসে চরুর মধুর সুঘ্রাণ নিতে নিতে এবং জমিতে জমিতে ঘুরে পুজো দেখতে দেখতে পৌষের বেলা হেলে গেল। সারাদিনের ক্লান্তি গায়ে মেখে বিনুরা যখন বাড়ি ফিরল, শীতের সন্ধ্যে নেমে গেছে।

* * *

মাঘ মাসের প্রথম দিকেই সব ধান ডোলে তুলে খড় দিয়ে সারি সারি পালা সাজিয়ে চরের মুসলমান কামলারা চলে গেল।

তারপর একটানা অলস মন্থর দিনযাপন। যুগল করিমকে এখন আর মাঠে যেতে হয় না। হেমনাথের অবশ্য কাজের শেষ নেই। বাড়ির কাজ তাঁর যত, তার হাজারগুণ বাইরের কাজ। ইদানীং স্কুলবাড়ির জন্য গঞ্জে গঞ্জে ঘুরে টাকা তুলে বেড়াচ্ছেন। নাওয়া-খাওয়ার ফুরসতটুকু পর্যন্ত তাঁর নেই।

নতুন ধান উঠবার পর এ বাড়িতে পিঠে পায়েস বানাবার ধুম পড়ে গেছে। চালও অঢেল, দুধেরও অভাব নেই। কাজেই পিঠেটিঠে না বানিয়ে কি থাকতে পারেন স্নেহলতা?

পিঠেও কি এক আধ রকমের? ভাপা পিঠে, পাটি সাপ্টা, চিতই, আলুর পুলি, সিদ্ধ পুলি, দুধ পুলি, মুগ পুলি, ভাজা পুলি—রকমের আর লেখাজোখা নেই। তা ছাড়া পায়েস আছে, চসি আছে।

নতুন ধান উঠবার পর আরেকটা পরিবর্তন ঘটেছে। আগে আগে সকালবেলা চিড়ে-মুড়ি-ক্ষীর-দুধ খেতে দিতেন স্নেহলতা। আজকাল ভোরে ভোরে উঠেই মাটির হাঁড়িতে ফেনাভাত বসিয়ে দেন। চিড়ে মুড়ির বদলে নতুন চালের সুঘ্রাণময় ফেনাভাত সরবাটা ঘি আর আলুভাতে দিয়ে খেতে কি ভাল যে লাগে!

এরই মধ্যে এক রবিবার, স্কুলে যাবার তাড়া ছিল না বিনুর, দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর রোদ পোয়াচ্ছিল। কোথায় যেন খেজুর গুড় জ্বাল দেওয়া হচ্ছে। বাতাসে তার সুগন্ধ ভেসে আসছে। হঠাৎ যুগল এসে সামনে দাঁড়াল, 'কী করতে আছেন ছুটোবাবু?'

বিনু বলল, 'এই তো বসে আছি।'.

'শুদাশুদি বইসা থাইকা কী করবেন? চলেন চকে যাই। এই সময় চকে সুন্দি কাউঠা বাইর হয়। খাইতে যা লাগে ছুটোবাবু, কী কমু! যেমুন সোয়াদ, তেমুন ত্যাল—'

বিনু লাফিয়ে উঠল, 'চল—'

কবেই ধান কাটা হয়ে গেছে। শীতের দুপুরে এখন মাঠ জুড়ে শুধু শূন্যতা। ফসল নেই, ধান গাছের গোড়াগুলো শুকিয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। যেদিকেই চোখ ফেরানো যায়, সব কিছু বর্ণহীন। ঠিক বর্ণহীন নয়, ধূসর। শীতের আদিগন্ত মাঠের ওপর অসীম বিষাদ ঘন হয়ে আছে।

মাথার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে চড়াই আর বুলবুলি উড়ছিল। মাঝে মাঝে তারা নীচে নেমে মাটিতে ঠোকর দেয়, কিন্তু বৃথাই। কেউ তাদের জন্য একদানা শস্যও ফেলে রেখে যায় নি।

একটা বুড়ো গোসাপ আলের ওপর দিয়ে পেট টেনে টেনে ধীর মন্থর গতিতে যাচ্ছিল। ধানকাটার সময় সাপটাকে এই মাঠে আরো অনেকবার দেখেছে বিনু। আজ কী হয়ে গেল, চট করে একটা মাটির ঢিল কুড়িয়ে নিল। ছুঁড়তে যাবে, যুগল হাতটা চেপে ধরল, 'করেন কী ছুটোবাবু, করেন কী? ও হইল এই চকের স্থাবতা, ওরে মারলে সব্বনাশ হইয়া যাইব।'

ঢিলটা আস্তে অস্তে ফেলে দিয়ে বিনু শুধলো, কী সর্বনাশ হবে?'

'জমিনে আর ফসল ফলব না। এখানকার মাইন্‌ষেরে জিগাইয়া দেইখেন।'

মানুষের বিশ্বাসের ওপর কথা নেই। বিনু আর কিছু বলল না। গোসাপটাকে ডান দিকে রেখে তারা এগিয়ে চলল।

আরো কিছুদূর যাবার পর সেই লোকটাকে দেখতে পেল বিনু; নাম যার তালেব। সেদিন ল্যাণ্ড রেজিস্ট্রি অফিসে একে প্রথম দেখেছিল সে।

এখন, শীতশেষের এই ফাঁকা মাঠে খুব মনোযোগ দিয়ে ইঁদুরের গর্ত থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তালেব ধান বার করছে। সেদিন হেমনাথ বলেছিলেন, এইভাবেই নাকি লোকটার দিন চলে।

দূরে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ তালেবকে দেখল বিনুরা। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল। তালেব তাদের দেখতে পায় নি।

তারপর সারা দুপুর খোঁজাখুঁজি করে মোটে তিনটে ছোট ছোট সুন্দি

কচ্ছপ পাওয়া গেল। তাদের পা বেঁধে ঝুলিয়ে বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে যুগল বলল, 'একখান কথা ছুটোবাবু—'

আনন্দ-লজ্জা-সঙ্কোচ—সব মিলিয়ে যুগলের মুখের ওপর দিয়ে পর পর অনেকগুলো ঢেউ চলে গেল। তারপর খুব আস্তে করে সে বলল, 'কাইল গোপাল দাস আসবো।'

'কে বললে?'

'পরশু লোক পাঠাইছিল!'

'আমি তো দেখি নি।'

'আপনে তহন ইস্কুলে—'

সত্যি সত্যি পরের দিন, ভাটির দেশ থেকে পাখির বাপ গোপাল দাস আর যুগলের সেই বোনাই ধনঞ্জয় (এতদিনে টুনির স্বামীর নামটা জেনে ফেলেছে বিনু) এসে হাজির। প্রথমে তারা পণের আট কুড়ি টাকা গুনে গুনে নিল; তারপর বিয়ের দিন ঠিক করল। মাঘ মাসের চব্বিশ তারিখে বিয়ে। এ-ও স্থির হল, বিয়ে করতে অতদূরে ভাটির দেশে যেতে হবে না। মেয়ে নিয়ে একেবারে ধনঞ্জয়ের বাড়িতে চলে আসবে গোপাল দাস; সেখানেই শুভ কাজ সারা হবে।

যুগলের বিয়ে নিয়ে বিরাট কাণ্ড করে বসলেন হেমনাথ। রাজদিয়ার হেন বাড়ি নেই, হেন মানুষ নেই যেখানে নেমন্তন্ন গেল না। দেখেশুনে কে বলবে, যুগল হেমনাথদের বাড়ির কামলা।

কেউ কেউ বলল, 'কামলার বিয়ায় এত ঘটা ক্যান?'

হেমনাথ বললেন, 'যুগলকে তো আমি কামলা ভাবি না; ও আমার বাড়ির ছেলে। তা ছাড়া আমাদের বাড়িতে বহুকাল শুভ কাজ হয় না। বিয়েটা উপলক্ষ করে ঘটা না হয় করলামই।'

বিয়ের আগের দিন থেকেই নিমন্ত্রিতদের আনাগোনা শুরু হল। বরণকুলো সাজিয়ে জনাকুড়ি এয়ো জুটিয়ে অধিবাসের গান শুরু করে দিলেন স্নেহলতা:

'আইজ রামের অধিবাস কাইল রামের
বিয়া গো কমলা,
আমরা জল ভরিতে যাই,
সই আমরা জলে যাই।

তোমার রামের অধিবাসের
রানী সময় গেল।
গা তোল কৌশল্যা রানী
নিশি পরভাত হইল।
তোমরা সখি আন গো হলুদ, আন গো
হলুদ সকলে।
আমার রামেরে সিনান করাও
অতি সকালে।'

একটু থেমে আবার শুরু হয় :

'বরণকুলা আনো সখি, বরণকুলা আনো
আমরা শ্যামের ঘাটে যাই।
আমরা জল সইতে যাই।
ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালাও সখি,
ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালাও।
ধান দিয়া, দূর্বা দিয়া, রামের ওই
বরণডালা সাজাও।
আমরা জল সইতে যাই।
আমরা ফুল তুলতে যাই।'

এয়োদের মধ্যে যারা স্নেহলতার সমবয়সিনী তারা বলে, 'পরের পুতে লেইগা এই! নিজে তো আর বিয়াইলেন না দিদি, বিয়াইলে না জানি কীর করতেন?'

স্নেহলতার ছেলেমেয়ে নেই। নিমেষে তাঁর মুখে বিষাদের ছায়া পড়ে। পরক্ষণেই স্নিগ্ধ হাসিতে ঝলমলিয়ে ওঠেন, 'না বিয়োলে বুঝি ছেলে হয় না? রাজদিয়া জুড়ে এত ছেলেমেয়ে তবে কার?'

'হেয়া ঠিক' হেয়া ঠিক—'

পরের দিন বিকেলবেলা বরযাত্রী আর বরকে নিয়ে রওনা হলেন হেমনাথ। বরযাত্রীদের ভেতর সুধা-সুনীতি, বিনু-ঝিনুকও রয়েছে।

বিয়ে উপলক্ষে যুগলের বাপ-মা ভাই-বোনও এসেছে তাদের বাড়ি থেকে। বাপ-ভাইরা বরযাত্রী হিসেবে ধনঞ্জয়ের বাড়ি চলেছে। মা আর বোন থেকে গেছে হেমনাথের বাড়ি।

বর্ষাকাল হলে ডুবন্ত মাঠের ওপর দিয়ে নৌকোয় যাওয়া যেত। কিন্তু এই শীতে জল সরে গিয়ে ডাঙা জেগেছে; ডাঙার ওপর দিয়ে তো নৌকো চলে না। তাই হেঁটেই চলেছেন হেমনাথরা।

রাজদিয়া থেকে ধনঞ্জয়ের বাড়ি মাইল দুয়েকের মতন। কোনাকুনি মাঠ পাড়ি দিলে কতক্ষণ আর লাগবে।

যেতে যেতে কৃষাণ গ্রাম চোখে পড়ে। কৌতূহলী কেউ কেউ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে শুধোয়, 'কিয়ের মিছিল?'

বরযাত্রীদের ভেতর থেকে কে উত্তর ছায়, 'বিয়ার—'

'কার বিয়া?'

'হ্যামকত্তার বাড়ির যুগলার।'

'আমরা যামু?'

'আসো।'

নানা গ্রাম থেকে দুজন চারজন করে জুটে বিরাট এক জনতা তৈরী হল। তারা বরযাত্রীদের পিছু পিছু চলতে লাগল।

সন্ধ্যের কিছু পরে বিনুরা ধনঞ্জয়ের বাড়ি পৌছে গেল।

॥ চোদ্দ ॥

এ বাড়ি বিনুর অচেনা নয়। আশ্বিন মাসে সুজনগঞ্জের হাটে যাবার পথে যুগলের সঙ্গে এখানে এসেছিল সে।

তখন চারদিকে জল থইথই করছে। আশ্বিনের মাঠঘাট, ধানের খেত, শাপলাবন, মুত্রাবন—সব কিছু ভেসে গিয়ে একখানা সমুদ্র হয়ে গিয়েছিল যেন। ধনঞ্জয়ের বাড়িটা তার ওপর দ্বীপের মতন মাথা তুলে ছিল।

এত জল যে ঘরের উঠোন পর্যন্ত চলে এসেছিল। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাবার জন্য উঠোনের ওপর দিয়ে সাঁকো দেখেছে বিনু। তার ওপর বসে ধনঞ্জয়ের কালো কালো আধ-ন্যাংটো ছেলেদের ভাতের টোপ দিয়ে পুঁটি এবং বাঁশপাতা মাছ ধরতে দেখেছে।

এখন, এই মাঘের শেষে জল নেই কিন্তু উঠোনের সাঁকোগুলো আছে। সারা বছরই বোধ হয় ওগুলো থাকে। থাকবারই কথা। এদেশে শুকনোর মাস

আর ক'টা ? পৌষ-মাঘ থেকে বৈশাখ পর্যন্ত। জষ্ঠির মাঝামাঝি মাঠঘাট ভাসিয়ে নতুন বর্ষার জল এসে পড়ে। তারপর থেকে অঘ্রান পর্যন্ত চারদিকে শুধু জল আর জল—অথৈ অপার জল। কাজেই সাঁকো তুলে ফেলে কী লাভ ? ক'মাস পরেই তো আবার বসাতে হবে। ধনঞ্জয় অতখানি পরিশ্রম করতে বুঝি রাজী নয়।

যাই হোক, আজ বাড়িটার চেহারাই গেছে বদলে। হাজার হোক বিয়ে বাড়ি। বউ-ঝি, আত্মীয়-কুটুম, নাইওরী-ঝিওরীতে বোঝাই।

উঠোনের চার কোণে চারটে এবং মাঝখানে একটা, মোট পাঁচটা হ্যাজাক জ্বলছে। উত্তরের ঘরের ঢালা বারান্দায় ধবধবে :ফরাস পাতা। মনে হল ওটাই বর এবং বরযাত্রীদের বসবার জায়গা।

বিনুরা পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়ে গেল।

'আইছে রে, আইছে। বরযাত্তররা (বরযাত্রীরা) আইসা পড়ছে।'

'বইতে দে, বইতে দে—'

'সিক্রেট (সিগারেট) কই, পান-তামুক বাইর কর—'

হঠাৎ কে চেঁচিয়ে উঠল, 'বর আইছে ; জোকার (উলু) দে ছেমরিরা (মেয়েরা)—'

তক্ষুনি ভেতর বাড়ি থেকে ঝাঁক ঝাঁক উলুর সুমিষ্ট চিকন শব্দ ভেসে আসতে লাগল।

আরেকজন কে ব্যস্তভাবে বলল, 'ঢাকীগুলান গেল কই ? বাদ্যি বাজা, বাদ্যি বাজা—'

বলার শুধু অপেক্ষা। তারপরেই পাঁচ ছ'টা ঢাকী উঠোনে লাফ দিয়ে পড়ল। জলবাঙলার এই সুদূর গ্রামের ভেতর ইংরেজী বাজনা কোথায় পাওয়া যাবে ? তাই হয়তো ঢাকীদের ডাকা হয়েছে।

নিমেষে ঢাকের শব্দে বিয়েবাড়ি সরগরম হয়ে উঠল এবং বিনুদের কানে তালা ধরে যেতে লাগল।

এরই ভেতর গোপাল দাস, ধনঞ্জয় এবং কটি বৃদ্ধ এগিয়ে এল।

গোপাল দাস আর ধনঞ্জয়কে আজ চেনাই যাচ্ছে না। মুখ পরিষ্কার করে কামানো। দুজনেই মাথায় প্রচুর তেল ঢেলেছে, ফলে চুলগুলো চপচপে। জুলপি, ঘাড় এবং কপাল বেয়ে সেই তেল চোঁয়াচ্ছে। পরনে ক্ষারে-কাচা ধুতি আর হাফশার্ট ; তার ওপর সস্তা দামের পশমী চাদর। কন্যাপক্ষের কর্তা ওরাই ; সাজগোজের একটু বাহার তো থাকবেই।

গোপাল দাসরা হাতজোড় করে বলল, 'আসেন, আসেন—' উত্তরের ঘরের ঢালা ফরাসে বিনুদের নিয়ে এল তারা।

যুগলকে মাঝখানে বসিয়ে হেমনাথরা চারধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরাম করে বসলেন।

তৎক্ষণাৎ সিগারেট এল, পান-তামাক এল।

হেমনাথের কোন নেশা নেই। অন্য বরযাত্রী যারা এসেছে সবাই তাঁকে মানে, শ্রদ্ধা করে। তাঁর সামনে বসে সিগারেট বা তামাক খাওয়ার কথা ভাবাই যায় না। নেশার সরঞ্জামগুলি বৃথাই ফরাসের ওপর পড়ে রইল।

যুগলের গা ঘেঁষে বসেছিল বিনু। তার কানের কাছে মুখ এনে চাপা নীচু গলায় যুগল ফিসফিস করল, 'বড়কত্তায় না থাকলে একখান সিক্রেট খাইতাম। কতক্ষণ বিড়ি-বুড়ি খাই না, গলা খুচুর খুচুর করতে আছে।'

বিনু বলল, 'আড়ালে গিয়ে খেয়ে এসো না—'

যুগল বলল, 'কী যে কন ছুটোবাবু—'

বিনু অবাক, 'কী বলেছি!'

'আমি না এই বাড়ির জামাই হমু। আমার নি সিক্রেট লইয়া আবডালে গিয়া খাওন মানায়! আমার একটা সোম্মান নাই?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল বিনু। এ দিকটা সে ভেবে ছাখেনি। বলল, 'তাই তো।'

ওদিকে ঝাঁক ঝাঁক উলুধ্বনি আর ঢাকের আওয়াজ চলছেই। ঢাকীগুলো উঠোনময় নেচেকুঁদে লাফিয়ে বিপুল উৎসাহে বাজিয়ে যাচ্ছে।

কানে হাত চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে হেমনাথ বললেন, 'হয়েছে, হয়েছে। এবার ওদের একটু থামতে বল। কান ঝালাপালা হয়ে গেল।'

ব্যতিব্যস্ত হয়ে গোপাল দাস ঢাকীদের বলল, 'হ্যামকত্তায় কইছে, বাজি থামা ব্যাটারা, বাজি থামা। কানের পোক (পোকা) না বাহির করলে আর হয় না।'

তক্ষুনি বাজনা থামল।

এধারে আরো একটা ব্যাপার ঘটেছে। বরযাত্রীদের দলে সুধা-সুনীতিকে দেখে বিয়েবাড়িতে খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সাড়া পড়ে গেছে চারদিকে।

এদেশে বরযাত্রী হিসেবে মেয়েদের যাওয়ার রেওয়াজ নেই বললেই হয়।

ফলে রীতিমত একটা ভিড় উত্তরের ঘরের দাওয়ার সামনে অনড় হয়ে আছে। দূর থেকে নানা বয়সের বউরা লম্বা লম্বা ঘোমটা অল্প একটু তুলে চকিতে সুধা-সুনীতিকে দেখে নিচ্ছে এবং একজন আরেক জনকে ঠেলা দিয়ে চাপা গলায় ফিস ফিস করছে, 'আউ ভাউ, মাইয়া মাইনষে নি বরযাত্তর আহে!'

আরেক জন বলল, 'আহে, আহে—'

'কই, আমরা তো যাই না।'

মুখ বাঁকিয়ে দ্বিতীয় জন বলল, 'কিয়ের লগে কিয়ের তুলুনা! চান্দের লগে প্যান্দের। আমরা হইলাম বগার ঘরের বগী, বেগার ঘরের বেগী। আর ওনরা (ওঁরা) বাবুগো ঘরের মাইয়া।'

'হে কথাখান ঠিকই।'

'হুদা (শুধু) কি বাবুগো মাইয়া, কইলকাত্তার মাইয়া। তেনাগো চালই ভিন্ন।'

'ঠিকই।'

'কইলকাতার মাইয়ারা কেমুন ধলা, ফক্‌ফইকা—'

'মেমসায়েবগো লাখান (মত)—'

'মেমসায়েব বাপের জম্মে দেখছস?'

'দেখি নাই, তাগো পরস্তাব তো শুনছি—'

এই সময় গোপাল দাস, ধনঞ্জয় এবং কর্তাস্থানীয় জনকয়েক এসে বরযাত্রীদের কাছে জোড়হাত করে দাঁড়াল। বিশেষ করে হেমনাথের উদ্দেশে বলল, 'এইবার আদেশ করেন হ্যামকত্তা; বিয়ার যোগাড় হইয়া গেছে। জামাই লইয়া যাই—'

হেমনাথ বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

যুগলকে নিয়ে গোপাল দাসরা ভেতর-বাড়ির দিকে চলল। বিনুরাও তাদের পেছন পেছন গেল।

আলপনা এঁকে এঁকে ভেতর-বাড়ির উঠোনটাকে চমৎকার সাজানো হয়েছে। মাঝখানে চিত্রকরা বড় বড় দুটো পিঁড়ি; সে দুটো বর-কনের আসন। এ ছাড়া আছে দু পক্ষের পুরুত, কন্যাকর্তা বরকর্তা এবং যে সম্প্রদান করবে তার আসন।

যুগলকে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শাঁখ বেজে উঠল, ঝাঁক ঝাঁক উলুধ্বনি শুরু হয়ে গেল। হেমনাথরা যাতে বসে বিয়ে দেখতে পারেন সেজন্য কখানা জলচৌকিও এসে পড়ল।

ঢাকীগুলো পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে জিরোচ্ছিল। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'ব্যাটারা কি ঘুমাইয়া পড়লি নিহি? বাজা—বাজা—'

বলার শুধু অপেক্ষা। ঢাকীরা সঙ্গে সঙ্গে উঠোনে নেমে পড়ল। শাঁখ উলু এবং ঢাক তিনে মিলে মুহূর্তে মাঘ মাসের রাত্রি মুখর হয়ে উঠল।

এদিকে যুগল যে জামা কাপড় পরে এসেছিল সেগুলো বদলে মেয়ের বাড়ির নতুন পোশাক পরে নিল। তার পরেই ওদিকের কোন একটা ঘর থেকে হাত ধরে মেয়েরা পাখিকে নিয়ে এল।

পাখিকে এর আগে মোটে একবারই দেখেছে বিনু। সেই আশ্বিন মাসে। স্বপ্নলোকের জলপরীর মতন সাঁতার কেটে কেটে যুগলের নৌকোয় এসেছিল সে।

আর আজ?

আজ চেনাই যাচ্ছে না পাখিকে। পরনে তার রাঙা পাটের শাড়ি আর লাল চাদর, হাতে গোছা গোছা চুড়ি, গলায় মুড়কি হার, কানে ঝুমকো, আঙুলে চৌকো আংটি, নাকের পাটায় আগুনের ফুলকির মতন নাকছাবি। লজ্জায় মুখ তুলতে পারছে না পাখি। নতমুখিনী মেয়েটা যেন মর্ত্যভূমির না, স্বর্গলোকের অপ্সরী।

ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে পলকহীন তাকিয়ে থাকল বিনু।

ঘন ঘন উলুধ্বনি এবং শাঁখের আওয়াজের মধ্যে পাখি-যুগলের মালাবদল হয়ে গেল। তারপর শুভদৃষ্টি। দুজনের মাথার উপর পাতলা একটা চাদর ফেলে দিয়ে কে যেন বলল, তাকা যুগলা; নয়ন মেইলা পরানেশ্বরীরে গ্যাখ্—'

যুগল বড় বড় ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে তাকাল; কিন্তু পাখি আর মুখ তোলে না।

সবাই কত সাধ্যসাধনা করল কিন্তু পাখির চোখের পাতা যেন সীসের পাতের মতন ভারী হয়ে গেছে; কিছুতেই তা মেলতে পারছে না মেয়েটা।

কেউ যখন পারল না তখন টুনিকে এগিযে আসতে হল। যুগলের পিসতুতো বোন টুনি। টুনিকেও আজ চেনা যাচ্ছে না। আশ্বিন মাসে তার গা থেকে খই উড়তে দেখেছিল বিনু, লাউয়ের মতন লম্বা স্তন ধরে কোলের বাচ্চাগুলোকে ঝুলতে দেখেছিল। আজ সে লাল পাড় নতুন শাড়ি পরেছে, নীল জামা পরেছে, গয়নাগাঁটি পরেছে, এমনকি পাতা কেটে পরিপাটি একখানি খোঁপাও বেঁধেছে। গোসাপের মতন খসখসে কর্কশ চামড়া আজ বেশ মসৃণ, তেলতেলে। কপালে নতুন পয়সার মতন মস্ত সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুরের টান।

সম্পর্কে টুনি হল পাখির ননাস (স্বামীর বড় বোনকে বলে ননাস)। সে বলল, 'আ লো, ছেমরি (ছুঁড়ি) তো গেলি! মুখ তোল্ মাইয়া—'

পাখি তবু অবনতমুখী।

টুনি এবার ঠোঁটে ঠোঁট টিপে চোঁখ পাকিয়ে বলল, 'ও মাইয়া, অহন তোমার এত সরম! ধরুম, একবার কিষ্ণবুলি (কৃষ্ণবুলি) ধরুম? ধরি? ভাদাই-আশ্বিন মাসে আমার খালাসের সময় যহন আইসা আছিলি তহন রোজ আইত যুগলা। তখন কী করতি দুইজনে? কই—সভার মইধ্যে হেই কথাখান কই—'

টুনির কথা শেষ হবার আগেই টুক করে একবার যুগলের চোখের দিকে তাকিয়ে মুখ নামাল পাখি।

বিয়ের পর বর-কনেকে নিয়ে যাওয়া হল বাসরঘরে। সেখানে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে এক গলা ঘোমটার তলা থেকে প্রথমে পাখির মা মুখ দেখল। মুখটুখ দেখা হলে বরণকুলো ঠেকিয়ে ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করল। পাখির মায়ের পর একে একে অন্য এয়োরাও বরকনেকে আশীর্বাদ করল।

তারপর শুরু হল চালখেলা। পেতলের সরাভর্তি চাল এনে এয়োরা পাখিকে বলল, 'ছড়াইয়া দে—'

পাখি প্রথমটা কিছুতেই ছড়াবে না। অনেক পীড়াপীড়ির পর সরা থেকে চালগুলো ঢেলে অল্প একটু ছড়িয়ে দিল।

এয়োদের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, 'ও মা, বিয়া না হইতেই সোয়ামীর দিকে এত টান! ভাল কইরা আউলাইয়া (ছড়িয়ে) দে—' বলে নিজেই পাখির একখানা হাত ধরে চালগুলো যতদূর পারল ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল। পরে যুগলকে বলল, 'এইবার চাউলগুলি গুছাইয়া একখানে কর।'

বাধ্য ছেলের মতন চালগুলো এক জায়গায় জড়ো করল যুগল। আবার সেগুলো ছড়িয়ে দিল পাখি। আবার সেগুলো এক জায়গায় করল যুগল। এই ভাবে বারকয়েক খেলা চলল।

সুখী কৌতুকমুখী এয়োর দল বলল, 'মনে রাইখো জামাই, আমাগো মাইয়া এই রকম আউল-ঝাউল করব। আর তুমি মানাইয়া গুছাইয়া নিবা। বুঝলা?'

উত্তর না দিয়ে যুগল হাসল।

চালখেলার পর জলখেলা।

মস্ত একখানা পাথরের থালা জলে ভর্তি করে আনা হল। একজন এয়ো আঙুল দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে জল ঘোরাতে লাগল। জল যখন ঘূর্ণির মতন ঘুরছে সেই সময় বর আর কনের টোপর থেকে দুটো শোলার টুকরো ছিঁড়ে তাতে

ফেলে দেওয়া হল। কখনও দেখা গেল পাখির শোলাটা আগে যাচ্ছে, যুগলেরটা তার পিছু নিয়েছে। অমনি এয়োদের মধ্যে সাড়া পড়ে যাচ্ছে।

'জামাই আমাগো বউ-অন্ত পরান। ছাখ্ কেমুন মাইয়ার পিছন পিছন দৌড়াইতে আছে। মাইয়া আমাগো সুখে থাকব।'

আবার যখন ঘূর্ণিতে পড়ে যুগলের শোলাটা আগে আগে যায়, পাখিরটা তাকে অনুসরণ করে তখন এয়োরা বলাবলি করে, 'দেখিস, মাইয়া জামাই ছাড়া আর কিছু চিনব না। জামাইর পিছে ঘুরতে ঘুরতে পিথীমির (পৃথিবীর) সগল ভুলব।'

একজন বর্ষীয়সী ওধার থেকে বলে ওঠে, 'ভুলুক, তবু সুখে থাউক অরা।'

ঘুরতে ঘুরতে ঘূর্ণির ভেতর শোলার টুকরো দুটো যখন এক হয়ে যায় তখন খেলা শেষ।

চালখেলার মতন বারকয়েক জলখেলাও চলল।

বিনুরা বাসরে চলে এসেছিল। নানা খেলার ফাঁকে হঠাৎ তাকে দেখতে পেল যুগল। বলল, 'ছুটোবাবু কতক্ষণ?'

বিনু বলল, 'অনেকক্ষণ এসেছি।'

'খাওন-দাওন হইছে?'

'না।'

একটু ভেবে যুগল এবার বলল, 'একখান কথা রাখবেন ছুটোবাবু?'

'কী?' বিনু জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

'আইজের রাইতখান এইখানে থাইকা যান। কাইল বিকালে আমার লগে বাড়িত্ যাইয়েন।'

'এখানে থেকে কী হবে?'

'বাসরঘরে কুনোদিন রাইত কাটাইছেন?'

'না।'

'ভয় তো আপনেরে আটকাইতেই হইব।' বলতে বলতে মুখটা বিনুর কানের কাছে আরো ঘন করে আনল যুগল। গলার স্বর আরো অতলে নামাল, 'বাসরঘরে বড় মজা ছুটোবাবু, বড় মজা। দেইখেন রসের মেলা বইব।'

বিনু উত্তর দিল না।

একটু ভেবে যুগল আবার বলল, 'আমার লাখান আপনেরেও একদিন বাসর-ঘরে যাইতে হইব। সগল দেইখা-শুইনা-বুইঝা লন। পরে কামে দিব।'

'কিন্তু—'

'আবার কী হইল ?'

'দাতু আর বাবা কি আমাকে থাকতে দেবে ?'

'কইয়া ছ্যাখেন না একবার। আপনে থাকলে আমার বড় ভাল লাগব।'

'আচ্ছা বলব।'

এক সময় খাবার ডাক পড়ল।

উত্তরের ভিটির প্রকাণ্ড ঘরখানায় বরযাত্রীদের আসন পড়েছে। বিনুরা গিয়ে সারি সারি বসে পড়ল।

গোপাল দাস মেয়ের জন্য আট কুড়ি টাকা পণ যেমন নিয়েছে, খরচও করেছে তেমনি দু হাতে। খাওয়ার ব্যবস্থা প্রায় রাজসিক।

এই জলবাঙলায় লুচি-টুচির তেমন চল নেই। ভাতেরই রেওয়াজ। কলার পাতায় জুঁই ফুলের মতন ধবধবে পানকাইজ চালের গরম ভাত; এখনও ধোঁয়া উড়ছে। সরবাটা গাওয়া ঘি, আলু ভাজা, মাছ ভাজা, বেগুন ভাজা, কপির বড়া, মুগের ডাল, রুই-চিতল-ইলিশ-চাইন—চার রকমের মাছ, চাটনি পায়েস এবং রসগোল্লা।

যতক্ষণ খাওয়া চলল একধারে গলবস্ত্র হয়ে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকল গোপাল দাস। আর ধনঞ্জয় হাঁক-ডাক করে পরিবেশন করাতে লাগল। 'এই পাতে চিতল মাছের কোল দাও, ঐ পাতে মিষ্টান্ন দাও, হেই পাতে রসগোল্লা দাও—'

খেতে খেতে হেমনাথ বললেন, 'খুব খাইয়েছ গোপাল—'

ঘাড়খানা একধারে হেলিয়ে বিনীত স্বরে গোপাল দাস বলল, 'খুব খাওয়ামু, আমার সাইধ্য কী ?'

'না না, চমৎকার আয়োজন হয়েছে।'

'আপনেগো লাখান মানুষ আমার বাড়ির কিয়া-কর্মে পাত পাতছেন এইতেই শান্তি। কী আনন্দ যে পাইছি হ্যামকত্তা! দিন যদি তেমুন থাকত, পরান ভইরা খাওয়াইতাম—'

খাওয়াবার কথায় দেশ-কালের কথা এসে পড়ল। কী দিন ছিল আর কী দিন এল! এখন জিনিস আক্রা; হাত ছোঁয়ানো যায় না এমন আগুন দর। আগের দিন থাকলে গোপাল দাস তিন দিন আগে বরযাত্রীদের নিয়ে আসত। খাওয়ানো কাকে বলে দেখিয়ে দিত। সবই অদৃষ্ট। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বরযাত্রীদের ভেতর থেকে একজন বর্ষীয়ান লোক জানাল, আগেকার দিনে বরযাত্রীদের বিয়ের চার-পাঁচ দিন আগে যাবার রেওয়াজ ছিল। বরিশাল-ফরিদ-

পুর-কুমিল্লা, এই জলের দেশের নানা জায়গায় সে এভাবে নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়িয়েছে। তা সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও না।

খাওয়া-দাওয়ার পর হেমনাথরা বাড়ি ফিরবেন, হঠাৎ বিনু বলে উঠল, 'আমি যাব না।'

অবনীমোহন বললেন, 'যাবি না তো থাকবি কোথায়?'

যুগল বোধ হয় তাকে তাকে ছিল। বাসরঘর থেকে চট করে বেরিয়ে এসে বলল, 'আমার কাছে থাকব। কাইল আমি লইয়া যামু—'

অবনীমোহন আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন। যুগলের মুখ-চোখ দেখে হেমনাথের মায়া হয়ে থাকবে। তিনি বললেন, 'আচ্ছা থাক; একটা দিন আমোদ-আহ্লাদ করুক।' বলে যুগলের দিকে ফিরে একটু ঠাট্টাও করলেন, 'তুই আবার অপ্সরীদের মধ্যে গিয়ে মুণ্ডু ঘুরিয়ে বসে থাকিস না; আমার দাদাভাইটাকে একটু দেখিস।'

রাত্রিবেলা বাসরঘরে মজা বেশ ভালই জমল। দুটি যুবতী মেয়ে সরু চিকন গলায় গাইল:

'এক দিন শ্যাম নীল জলে,
রাধা বদন হেরব বলে
ধীরে ধীরে চলে শ্যাম রায়।
গিয়ে যমুনার কদম্বমূলে,
দাঁড়াইল কুতূহলে
কুটিলা তাই দেখিবারে পায়।
কুটিলা কয় শোন লো বউ,
জল আনিতে যাইস না লো কেউ
ব্রজের যত আছে ব্রজাঙ্গনা।
কাল কুম্ভীর এল যবুনাতে,
দেখে এলাম স্বচক্ষেতে
তাইতো তোদের যেতে করি মানা।'

একটা মাজা-ভাঙা সধবা বুড়ী, সম্পর্কে যুগলের দিদিশাশুড়ী, পাকা চুলে তার সিঁদুর, কপালে সিঁদুর, কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে রগড় করে করে নাচতে লাগল। ঘরভর্তি যত যুবতী, যত কিশোরী, যত প্রৌঢ়া হেসে একেবারে কুটি পাটি। এ ওর গায়ে ঢলে পড়তে পড়তে বলতে লাগল, 'ঠাউরমা য্যান কী! একখান সং—'

নাচ-গানের পর হঠাৎ ঘরভর্তি মেয়ের দল যুগলকে ছেড়ে বিনুকে নিয়ে পড়ল। একটি রঙ্গিনী স্বভাবের যুবতী বিনুর চোখে চোখ রেখে বলল, 'অ বাবুগো পোলা, আপনের বিয়া হইছে ?'

চোখ নামিয়ে বিনু আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল।

গালে একটা করে হাত রেখে অন্য মেয়ের দল কলকল করে উঠল, 'আ লো মা লো মা, অহন তরি বিয়াই করেন নাই! তয় করছেন কী ?'

বিনু চুপ। তার মুখ লাল হয়ে উঠতে লাগল।

সেই যুবতীটি আবার বলল, 'বিয়া তো করেন নাই। এই দিকে জামাইর লগে বাসরে আইয়া ঢুকছেন। বাসরের রীত-কানুন জানেন ?'

এবারও মাথা নেড়ে বিনু বুঝিয়ে দিল, জানে না।

যুবতী বলল, 'দুইখান ধান্দা (ধাঁধা) জিগাই, জবাব গ্যান—'

এতক্ষণে বিনুর গলায় স্বর ফুটল, 'আমি ধাঁধা-টাদা জানি না। বলতে পারব না।'

'না কইলে হইব না। আইচ্ছা শোনেন :

'রক্তে ডুবু ডুবু কাজলের ফোটা
এক কথায় যে কইতে পারে
স্যায় মজুমদারের ব্যাটা।'

এইবার ক'ন বস্তুখান কী ?'

বিনু অনেকক্ষণ ভাবল। কিন্তু হাজার ভেবেও কিছুই বার করতে পারল না। বলল, 'জানি না।'

যুবতী বলল, 'আইচ্ছা আরেকখানা জিগাই—

'ওপার থনে আইল টিয়া
সোনার টোপর মাথায় দিয়া
যদি টিয়ার মন করে
মাঠের মাটি চুর করে।'

বিনু এবারও পারল না।

হঠাৎ ভিড়ের ভেতর থেকে এক থুথুরে বুড়ী উঠে এসে বিনুর চিবুক ধরে নাড়তে নাড়তে বলল, 'একখান ধাঁন্দারও (ধাঁধারও) জবাব দিতে পারলা না। তোমার শাস্তি হইব গোরাচান।'

অন্য মেয়েরা চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'কী শাস্তি, কী শাস্তি ?'

বুড়ী বলল, 'আমারে বিয়া করতে হইব।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘরময় হাসির রোল উঠল। আর বিনুর চোখ-মুখ নাক-কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল।

হাসি-টাসি থামলে মেয়েরা আবার যুগল পাখিকে নিয়ে মাতল। গোপাল দাসের বউ অর্থাৎ যুগলের শাশুড়ীকে তারা ঠেলতে ঠেলতে বাসরঘরের বাইরে বার করে দিল, 'তুমি হাউড়ি মানুষ, তুমি এইখানে ক্যান? আমরা জামাই লইয়া কত কী করুম অখন, কত নীলাখেলা! যাও, যাও—'

গোপাল দাসের বউ হাসতে হাসতে চলে গেল, 'যা ইচ্ছা তরা কর—

'করুমই তো।'

মেয়েরা এবার পাখিকে জোর করে যুগলের কোলে বসিয়ে সমস্বরে গান ধরে:

'শ্যামের কোলে রাইকিশোরী
এ রূপ দেখে মরি মরি—'

রাতের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গিনীদের মাতামাতি, কৌতুক এবং হাসিও পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল।

পরের দিন বাসি বিয়ে হল, আংটি খেলা হল, কাদা খেলা হল। কাদায় কাদায় যুগল আর পাখিকে, এমন কি বিনুকেও ভূত বানিয়ে ছাড়ল মেয়েরা।

বিকেলবেলা বাড়ির সবাইকে কাঁদিয়ে যুগলের সঙ্গে পাখি শ্বশুরবাড়ি রওনা হল।

কাল হেমনাথ বলে গিয়েছিলেন, বেলা থাকতে থাকতেই যেন যুগলরা বাড়ি চলে যায়। পৌছুতে পৌঁছুতে রাত হয়ে গেল।

শাঁখ বাজিয়ে, উলু দিয়ে বরকনেকে ঘরে নিয়ে তুললেন স্নেহলতা। সেই ঘরখানায় যেটা যুগলের জন্য নতুন তোলা হয়েছিল।

ঘরের ভেতর ঢুকে বিনু অবাক হয়ে গেল। কাল বিকেল থেকে আজকের রাত, একটা দিনের কিছু বেশি সময় সে বাড়ি ছিল না। এর ভেতর যুগলের ঘরখানা কি চমৎকার করেই না সাজিয়ে দিয়েছেন স্নেহলতা!

আজ কালরাত্রি। জামাই-মেয়ে একঘরে রাত কাটাবে না। বরণ-টরণ এবং অন্য সব রীতি পালনের পর পাখিকে নিয়ে ভেতর বাড়িতে চলে গেলেন স্নেহলতা। রাত্তিরটা সেখানেই কাটাবে পাখি; আর যুগল একা এ ঘরে থাকবে।

আত্মীয়-কুটুম্ব, নাইওরী-ঝিওরী, সবাই নতুন বউর সঙ্গে ভেতর-বাড়ি চলে গেছে। নতুন ঘরে এখন শুধু যুগল আর বিনু।

যুগল ডাকল, 'ছুটোবাবু—

'কী ?'

'ঠাউরমার বিচারটা দেখছেন ?'

'কিসের বিচার ?'

'আপনেই ক'ন বিয়ার পর বউ বিহনে রাইত কাটান যায় ?'

বিনু ফস করে বলে ফেলল, 'একটা তো মোটে রাত। কাল থেকেই তো—'

ক্ষোভ এবং অভিমানের গলায় যুগল বলল, 'একটা রাইতও অহন একা একা ভাল লাগে না। একা, না বোকা। আপনে অবিয়াত পোলা, আপনে এইর মম্ম বুঝবেন না।'

বিনু বিমূঢ়ের মতন তাকিয়ে থাকল।

রাত পোহালেই বউভাত।

রাজদিয়ার হেন মানুষ নেই যাকে নেমন্তন্ন করেন নি হেমনাথ। যুগীপাড়া কুমোরপাড়া-তেলীপাড়া-বামুনপাড়া কায়েতপাড়া সমস্ত জায়গায় ঘুরে ঘুরে সবাইকে বলে এসেছেন। হেমনাথ বলেছেন পুরুষদের, স্নেহলতা বলে এসেছেন মেয়েদের। হেমনাথের সঙ্গে বিনুও ঘুরে ঘুরে নেমন্তন্ন করতে গেছে।

শুধু কি রাজদিয়ার বাসিন্দাদের, এই জলবাঙলায় যত চেনাজানা মানুষ আছে সবাইকে নেমতন্ন করে এসেছেন হেমনাথ। বহুকাল বাড়িতে কোন উৎসব হয় নি; যুগলের বিয়েটা উপলক্ষ করে হেমনাথ আর স্নেহলতা প্রাণভরে সাধ মিটিয়ে নিচ্ছেন।

আজ সকাল থেকেই এ বাড়িতে মেলা বসে গেছে। কেতুগঞ্জ থেকে বাড়ির মেয়েদের নিয়ে এসেছে মজিদ মিঞা। সুজনগঞ্জ থেকে এসেছে নিত্য দাস, চন্দ্র ভুঁইমালী। কমলঘাট থেকে এসেছে রমজান সাহেব, মালখানগর থেকে বৈকুণ্ঠ কুণ্ডু। তা ছাড়া এই রাজদিয়ার লারমোর, রামকেশব, হেডমাস্টার মোতাহার সাহেব—এঁরা তো আছেনই।

সন্ধ্যের পর ডেলাইট আর হ্যাজাকের আলোয় বাড়িটা যেন দিনের মতন হয়ে উঠল। তখন থেকেই দলে দলে অন্য নিমন্ত্রিতেরা আসতে লাগল।

পুবের ভিটির বড় ঘরখানা সাজিয়ে গুছিয়ে সিংহাসনের মতন কারুকাজকরা প্রকাণ্ড একটা চেয়ারে পাখিকে বসানো হয়েছে। সারা বিকেল ধরে সুধা-

সুনীতি তাকে সাজিয়েছে। স্নেহলতা লোহার সিন্দুক খুলে গয়নার বাক্স বার করে দিয়েছিলেন।

পাখির পরনে লাল টুকটুকে বেনারসী। মাথায় সোনার মুকুট, কপালের কাছে গোল টিকলি, ওপর হাতে আড়াই-পেঁচি অনন্ত, নীচের দিকে গোছা গোছা চুড়ি, গলায় সীতাহার। দু-হাতে কম করে ছটা আংটি, কোমরে সোনার বিছে, পায়ে তোড়া।

সব মিলিয়ে পাখিকে রাজেন্দ্রাণীর মতন দেখাচ্ছিল।

পুবের ঘরেই সব চাইতে বেশি ভিড়। বিনু আর ঝিনুকও ঐ ঘরেই আছে। স্নেহলতা-সুধা-সুনীতি-সুরমা পাখিকে ঘিরে বসে আছেন।

একেকটা দল আসছে, পাখির হাতে উপহার তুলে দিচ্ছে। পাখির হাত ঘুরে সেগুলো যাচ্ছে সুধা-সুনীতির কাছে। সুধারা সেগুলো একধারে সাজিয়ে নম্বর দিয়ে খাতায় লিখে রাখছে।

স্নেহলতা উপহারদাতাদের শুধোন, 'বউ কেমন দেখলে?'

উত্তর আসে, 'সোন্দর। কিবা রঙ, কিবা চোখ, কিবা হাত-পায়ের গড়ন—'

'আমার বাড়িতে মানাবে, কি বল?'

'নিয্যস—'

উৎসবের ঘোর বুঝি ছোট্ট ঝিনুকের মনেও লেগেছে। ফিসফিস গলায় সে ডাকে, 'বিনুদাদা—'

মুখ ফিরিয়ে বিনু বলে, 'কী?'

'বিয়ে করতে বেশ লাগে, না?'

অন্যমনস্কের মতন বিনু জবাব দ্যায়, 'হুঁ—'

উত্তরের ঘর, দক্ষিণের ঘর, পুবের ঘর, পশ্চিমের ঘর—সব জায়গায় নিমন্ত্রিতদের জন্য আসন পড়েছে। রাত একটু বাড়লে খাবার ডাক পড়ল।

নিমন্ত্রিতরা সবে বসতে শুরু করেছে সেই সময় গোলগাল ঘটের মতন চেহারা একটি লোক এসে উঠোনে দাঁড়াল। ফর্সা টুকটুকে রঙ তার। পরনে হাঁটু পর্যন্ত খাটো ধুতি আর ফতুয়া। কাঁধে পাট-করা ময়লা চাদর, খালি পা।

উঠোনে পা দিয়েই সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'অতিথ্ আসলাম হ্যামকত্তা—'

হেমনাথ আর লারমোর কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। উদ্দেশ্য, নিমন্ত্রিতদের খাওয়া-দাওয়া তদারক করা। তাঁদের পাশে বিনু। হেমনাথ প্রায় ছুটেই

লোকটার কাছে চলে গেলেন। বললেন, 'এসো—এসো চক্কোত্তি ; তোমার কথাই আজ সকাল থেকে মনে পড়ছিল। আমার বাড়িতে একটা শুভ কাজ হচ্ছে, অথচ তোমারই পাত্তা নেই।'

লোকটা এক গাল হাসল, 'আপনে নিশ্চিন্ত থাকেন হ্যামকত্তা। কোন বাড়িতে ক্রিয়াকম্ম হইলে আমি ঠিক ট্যার পাইয়া যাই। আমারে ফাকি দ্যাওন সহজ না।'

লারমোর ওধার থেকে বল উঠলেন, 'ত' ঠিক। বিশ মাইল দূর থেকে তুমি লুচিভাজার গন্ধ পাও।'

লোকটা হাসতেই লাগল, 'তা যা কইছেন লালমোহন সায়েব।'

এদিকে লোকটাকে দেখে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে। সবাই উৎসুক চকচকে চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলাবলি করছে, 'গদু চক্কোত্তি আসছে, গদু চক্কোত্তি আসছে। আজই আসর জমব ভাল।'

লোকটার নাম জানা গেল—গদু চক্কোত্তি। এমন একটা অদ্ভুত নাম আগে আর কখনও শোনেনি বিনু। তা ছাড়া নিমন্ত্রিতদের তালিকায় গদু চক্কোত্তি ছিল না। যাদের যাদের নেমন্তন্ন করা হয়েছে তাদের বাড়িতে হেমনাথের সঙ্গে গিয়েছিল বিনু। গদু চক্কোত্তির বাড়ি সে যায়নি।

সে যাই হোক, দেখা যাচ্ছে সবাই গদু চক্কোত্তিকে চেনে এবং সে আসাতে সকলেই ভারি খুশী।

লারমোরের পাশ থেকে বিনু হঠাৎ বলে উঠল, 'লোকটা কে লালমোহন দাদু ?'

লারমোর বললেন, 'গদু চক্কোত্তি—'

'নামটা তুমি বলবার আগেই শুনেছি। কিন্তু—'

বিনুর মনের কথাটা চট করে বুঝে নিলেন লারমোর। তারপর বললেন, 'নাম শুনলেই চলবে না, কেমন ? কোথায় থাকে, কী তার পরিচয়—এ সবও জানতে হবে, তাই না ? ওর বাড়ি হচ্ছে কাজিরপাগলা বলে একটা গ্রামে ; এখান থেকে মাইল দশেক পুবে। আর পরিচয় ? সেটা একটু পরেই টের পাবি দাদা-ভাই। আমি আর মুখে কতটুকু বলতে পারব।'

বিনুর খুঁতখুঁতনি তবু গেল না। সে বলল, 'কিন্তু—'

'আবার কী ?'

'আমার যদ্দূর মনে আছে একে নেমন্তন্ন করা হয়নি।'

'ওকে নেমন্তন্ন করতে হয় না।'

বিমূঢ়ের মতন তাকিয়ে থাকল বিনু। বিনা নেমন্তন্নে কেউ এভাবে চলে আসতে পারে, তার কাছে এটা নিতান্তই অভাবনীয়।

লারমোর এবার যা বুঝিয়ে বললেন, সংক্ষেপে এইরকম। এই জল-বাঙলায় যত গ্রাম-গঞ্জ আছে সব জায়গায় গদু চক্কোত্তির অবাধ গতিবিধি। এ দেশের সবাই তাকে চেনে। বিয়ে-অন্নপ্রাশন-পৈতা—যেখানেই উৎসবের ব্যাপার থাকে, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার থাকে—গন্ধ শুঁকে শুঁকে গদু চক্কোত্তি ঠিক হাজির হবেই। এই জলের দেশে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সে অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। জগতে ভালমন্দ খাওয়া ছাড়া তার আর কোন কাজ নেই। তার কাছে বেঁচে থাকার একটিই মাত্র উদ্দেশ্য ; তা হল খাওয়া। এক ভোজ-বাড়ি থেকে আরেক ভোজবাড়ি—সারা জীবন এইভাবেই টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে গদু চক্কোত্তি। এই প্রাচুর্যের দেশে সে রবাহূত হয়ে এলেও কেউ অসন্তুষ্ট হয় না ; বরং যথেষ্ট সমাদর করেই তাকে গ্রহণ করা হয়।

যত শুনছিল ততই অবাক হয়ে যাচ্ছিল বিনু।

এদিকে হেমনাথ গদু চক্কোত্তিকে বলছিলেন, 'কি চক্কোত্তি, এখনই খেতে বসবে, না নতুন বউ দেখে পরে—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই গদু চক্কোত্তি বলে উঠল, 'পাত যখন পইড়াই গেছে তহন বইসাই পড়ি। পরে বউ দেখুম।'

এখানেই হাত-পা ধোবার জল আনিয়ে দিলেন হেমনাথ। হাত-মুখ ধুয়ে একটা আসনে বসতে বসতে নিমন্ত্রিতদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল গদু চক্কোত্তি। তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'একজনেরও খাওইয়ার লাখান (খাইয়ের মতন) চেহারা না। এযাগো তো সব বগের আধার (এরা বকের মতন সামান্য খায়); এগো লগে খাইতে বইসা সুখ নাই ; নিজেরই লজ্জা। পাল্লাদার না হইলে আসর জমে না।' বলতে বলতে কী মনে পড়তে চোখমুখ আলো হয়ে উঠল তার, 'ভাল কথা, আপনেগো এইখানে বুধাই পালের ভাই হাচাই পাল তো মন্দ খাওইয়া না ; তারে খবর দ্যান হ্যামকত্তা—'

হাচাই পালের নেমন্তন্ন হয়েছিল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সে এখনও আসেনি। তক্ষুনি লোক পাঠিয়ে কুমোরপাতা থেকে তাকে ধরে আনা হল। সব শুনে হাত জোড় করে হাচাই পাল বলল, 'আমি কি চক্কোত্তি ঠাউরের লগে পাল্লা দিতে পারুম ?'

গদু চক্কোত্তি হাচাই পালের এই বিনয়ে খুবই সন্তুষ্ট। মুরুব্বিয়ানার সুরে বলল, 'তুমি ক্যান, এই ঢাকার জিলায় কোন সুমুন্দি নাই আমার লগে পাল্লা

ছায়। তয় কিনা, একজন ভাল খাওইয়া কাছে বসলে খাইতে আইট হয়।'

অগত্যা হাচাই পালকে তার মুখোমুখি বসতে হল।

হেমনাথ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওরে লুচি দে, লুচি দে—'

গদু চক্কোত্তি খায় আর গল্প করে। কোথায় কোন্ রাজবাড়িতে দশ সের দই খেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল, কোথায় শুধু তিন কড়াই মুগের ডাল খেয়েছিল, কোথায় বড় বড় খাইয়েরা পাল্লা দিতে এসে তার কাছে হেরে ভূত হয়ে গেছে—ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য দিগ্বিজয়ের কাহিনী বলে যেতে লাগল।

গদু চক্কোত্তির খাওয়া সত্যিই দর্শনীয়। নিমন্ত্রিতরা খাবে কি, হাঁ করে তাকিয়ে আছে। শুধু কি তাই, বাড়ির ভেতর থেকে মেয়েরা পর্যন্ত বেরিয়ে এসে তার খাওয়া দেখছে। এর মধ্যেই বিনু টের পেয়ে গেছে, খাইয়ে হিসেবে এ অঞ্চলে গদু চক্কোত্তির বিপুল খ্যাতি, অসীম প্রতিষ্ঠা।

যাই হোক, হাচাই পাল মোটামুটি ভালই পাল্লা দিয়ে যাচ্ছে। গদু চক্কোত্তি শুধু বেগুনভাজা দিয়ে কুড়িখানা লুচি খেল; হাচাই পালও তাই খেল। ডাল আর কপির তরকারি দিয়ে গদু চক্কোত্তি খেল চল্লিশখানা লুচি, হাচাই পালও চল্লিশখানাই খেল। তবে লক্ষ্য করা গেল, তার চোখমুখ যেন কেমন কেমন। পেটটা সামনের দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে, পিঠটা পেছনে হেলে যাচ্ছে।

কপির পর এল মাছ। পঞ্চাশ টুকরো মাছ আর বত্রিশখানা লুচি অদৃশ্য করে দেবার পর দেখা গেল, হাচাই পালের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। পেছন দিকে আরো হেলে পড়েছে সে। হঠাৎ দুই হাত জোড় করে সে লম্বা হয়ে পড়ল। বিড় বিড় করে বলল, 'আমারে ক্ষমা করেন চক্কোত্তি কত্তা, আপনের লগে পাল্লা ছাওন আমার কাম না। আদেশ করেন, আমি যাই।' বলে দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে বাড়ি চলে গেল।

হাচাই পাল চলে গেলে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল গদু চক্কোত্তি। তারপর বিমর্ষ মুখে বলল, 'এইসব মানুষ ক্যান যে আসরে আইসা বসে! খাওনটাই মাটি।' বলে আবার খেতে শুরু করল।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিল বিনু। গদু চক্কোত্তির কোমরের কষিটা বুকের কাছে বাঁধা। খাচ্ছিল আর খানিকটা পর পরই হ্যাঁচকা টানে সেটা নীচের দিকে নামাচ্ছিল সে।

অবাক বিস্ময়ে বিনু লারমোরকে জিজ্ঞেস করল, 'ঐটুকু ঐটুকু করে কাপড়টা নামাচ্ছে কেন লালমোহনদাদু?'

লারমোর হাসতে হাসতে সকৌতুকে বললেন, 'পেটের যেটুকু যেটুকু ফিল-

আপ হচ্ছে, কাপড়টা সেইটুকু সেইটুকু নামাচ্ছে। তারপর নাইকুণ্ডুল থেকে যখন এক ইঞ্চি ঐ কষি নামবে তখন খাওয়া শেষ।'

নাভির তলায় কাপড় নামতে পরিবেশনকারীদের যে কতবার ছোটাছুটি করতে হল তার আর হিসেব নেই।

খাওয়া-দাওয়ার পর ট্যাঁক থেকে একটা দোয়ানি বার করে পাখিকে আশীর্বাদ করল গদু চক্কোত্তি। তারপর হেমনাথকে বলল, 'অহন যাই হ্যামকত্তা।'

হেমনাথ বললেন, 'এত রাত্রে কোথায় যাবে?'

'নবীগঞ্জের 'গয়নার নাও' ধরুম।'

'কাল সকালে গেলে হয় না?'

'উঁহু। কাইল সকালে ঐখানে এক বাড়িতে পৈতা আছে। আইজই আমারে রওনা দিতে হইব।'

'তা হলে তো তোমাকে ছেড়ে দিতেই হয়।'

গদু চক্কোত্তি চলে গেল। যাবার আগে বিনুর মনে বিচিত্র বিস্ময়ের রেশ রেখে গেল।

॥ পনের ॥

বৌভাতের দিন পাখিদের বাড়ির সবাই এসেছিল। তাদের নিয়ে এসেছিল গোপাল দাস আর ধনঞ্জয়। গোপাল দাস সেদিন কিছুই খায়নি। যতদিন না মেয়ের ছেলেপুলে হচ্ছে ততদিন তার শ্বশুরবাড়ি জলটুকুও ছোঁবে না।

বৌভাতের অনুষ্ঠান শেষ হলে গোপাল দাসরা চলে গিয়েছিল। যাবার আগে মেয়ে-জামাইকে দ্বিরাগমনের নেমন্তন্ন করে গেছে।

পাখিরা টুনিদের বাড়ি দ্বিরাগমনে যাবে না, যাবে ভাটির দেশে গোপাল দাসের বাড়ি।

গোপাল দাসদের নিয়ম অনুযায়ী বৌভাতের আড়াই দিন পর দ্বিরাগমনে যাবার কথা। যুগলদের রওনা হতে হতে পাঁচদিন কেটে গেল। এখন শুকনোর দিন। বাড়ি থেকে লারমোরের স্টীটনে নদীর ঘাটে এসে কেরায়া নৌকোয় উঠল পাখিরা। তাদের বিদায় দেবার জন্য বাড়ির সবাই সঙ্গে এসেছিল।

নৌকো ছাড়ার মুখে স্নেহলতা বললেন, 'সাতদিনের মধ্যে ফিরে আসবি যুগল।'

যুগল মাথা নাড়ল, 'আইচ্ছা—'

'বেশিদিন কিন্তু শ্বশুরবাড়ি থাকতে নেই। বুঝলি?'

ঘাড় কাত করে যুগল জানাল, বুঝেছে।

স্নেহলতা আবার বললেন, 'বেশিদিন থাকলে নিন্দে হয়।'

সেই যে যুগল দ্বিরাগমনে গিয়েছিল তারপর আর কোন খবর নাই। সাত দিনের ভেতর ফিরে আসার কথা। সাতদিনের জায়গায় পনের দিন গেল। পনের দিনের পর মাসও যায় যায়। না ফিরল যুগল, না এল পাখি।

সবাই অস্থির, চিন্তিত। হেমনাথ ঠিক করলেন, ভাটির দেশে গোপাল দাসের বাড়িতে লোক পাঠাবেন। লোক আর পাঠাতে হল না; তার আগেই যুগলের চিঠি এল। নিজে তো আর লেখাপড়া জানে না যুগল, অন্য কারোকে দিয়ে লিখে পাঠিয়েছে।

শ্রীচরণকমলেষু,

প্রণাম অন্তে জানিবেন, আমরা মঙ্গলমত পৌঁছিয়াছি। পত্র দিতে দেরী হইল বলিয়া মনে কিছু করিবেন না।

যাহা হউক, বর্তমানে জানিবেন আমাদিগের আর রাজদিয়া ফিরত যাওয়া হইবে না। শ্বশুরমহাশয়ের পুত্রাদি নাই। তাঁহার ইচ্ছা আমি এইখানেই বসবাস করি।

এখানে আমার থাকিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কী করিব? শ্বশুরমহাশয়ের অনেকগুলি পুকুর। ইদানিং কয়েকটি বিলও তিনি ইজারা লইয়াছেন। বিল এবং পুকুরে প্রচুর মাছ। কই, বোয়াল, চিতল, মাগুর, কাজলি, বাতাসী, কালি-বাউস, রুই, কাতল, ফলি, পাবদা ইত্যাদি ইত্যাদি। এত মাছ ফেলিয়া আমার রাজদিয়া ফিরিয়া যাইতে মন চায় না।

ঠাকুমা, আপনি এবং বাটীস্থ সকলে আমার প্রণাম নিবেন। ছোটবাবুকে বলিবেন আমার জন্য যেন মন খারাপ না করে।

আগতে আপনাদের কুশল দানে সুখী করিবেন। ইতি—

আপনার সেবক—যুগল।

চিঠি পড়ে কিছুক্ষণ বিষণ্ণ মুখে বসে রইলেন হেমনাথ। স্নেহলতা কাঁদলেন। সত্যিই ছেলেটার জন্য বড় মায়া পড়ে গিয়েছিল তাঁদের।

যুগল না ফেরাতে সব চাইতে যার বেশি মন খারাপ হয়েছে সে বিনু। বুকের ভেতরটা সব সময় তার ভারী হয়ে থাকে।

যুগল তাকে হাতে ধরে জলে নামিয়েছে, সাঁতার শিখিয়েছে। নৌকো-বাওয়ার মাছমারার কৌশল আয়ত্ত করিয়েছে। হেমন্তের স্থির নিস্তরঙ্গ জলে অলস কচ্ছপ এবং শীতের শূন্য মাঠে 'সুন্দি কাউঠা'র আস্তানা চিনিয়েছে। এই জলের দেশের প্রতিটি বৃক্ষলতা, প্রতিটি পশুপাখি, প্রতিটি তৃণের নাম সে মুখস্থ করিয়েছে। এখানকার বিশাল নদী, বিরাট আকাশ আর সীমাহীন মাঠের মাঝখানে এক অপার অথৈ বিস্ময়ের ভেতর বার বার তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বিনুর চোখে নতুন রঙ ধরিয়ে দিয়েছে। যুগল তার মনে অনেক বিবাগী হাওয়া বইয়ে দিয়েছে। একা-একা মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াতে, জলের ভেতর মাছের মেলা দেখতে কিংবা গাছের ডালে মোহনচূড়া পাখিটাকে দেখতে যে আজকাল ভাল লাগে, সে ঐ যুগলের জন্য। এই অসীম বিশ্বের বাধাবন্ধহীন ফসলের খেতে, আঁকাবাঁকা আলপথে, স্তূপের মতন সাজানো আকাশের দিনগুলিতে কিংবা জলের ওপর নলঘাসের প্রতিবিম্বে যে এত আনন্দ ছড়ানো ছিল, এ খবর যুগলের আগে আর কেউ তাকে দ্যায়নি।

আপন অভিজ্ঞতার সবটুকু সার বিনুর হাতে তুলে দিয়ে চলে গেছে যুগল। তার জন্য তোলা সেই নতুন ঘরখানায় তালা দিয়ে রেখেছেন স্নেহলতা। প্রায় রোজই তার কথা হয়। অনেক দিনের অনেক স্মৃতির কথা বলতে বলতে চোখ ঝাপসা হয়ে যায় স্নেহলতার। শুনতে শুনতে বিনুর মনে বিষাদ ঘন হতে থাকে।

॥ ষোল ॥

যুগল নেই। আজকাল বিনুর ছোটাছুটি ঘোরাঘুরি অনেক কমে গেছে। কাজ বলতে এখন শুধু পড়াশুনা, স্কুলে যাওয়া, ঝিনুকের সঙ্গে ঝগড়া, আর দু-চারদিন পর পর পোস্ট অফিসে গিয়ে সুনীতির চিঠির খোঁজ করা। আনন্দর চিঠি এলে বইয়ের ভেতর লুকিয়ে বাড়ি এসে সুনীতিকে দেয় বিনু; তার জন্য দু আনা করে পয়সা পায়।

নিবারণ পিওন বলে 'দাদুভাই তুমি আইসা চিঠি নিয়া যাও; আমি গেলে একবেলা দুই মুঠা ভালমন্দ খাইতে পাইতাম।'

বিনু বলে, 'চিঠির সঙ্গে কী, আপনি এমনি গিয়ে খেয়ে আসবেন। আর এই চিঠির কথা কাউকে বলবেন না।'

হেসে হেসে নিবারণ বলে, 'হেয়া আমি জানি, ব্যাপারখান বড় গুপন (গোপন)।'

বিনু হাসে, কিছু বলে না। সুনীতির চিঠির ব্যাপারে নিবারণের সঙ্গে অলিখিত একটা চুক্তি হয়ে গেছে তার।

মাঘের শেষাশেষি যুগল দ্বিরাগমনে গিয়েছিল। তারপর একে একে ফাল্গুন এল, চৈত্র এল। হেমনাথের বাগানের মান্দার গাছগুলো ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল; শিমুলগাছের মাথায় থোকা থোকা আগুন জ্বলতে লাগল। জামরুল আর কালো-জাম, রোয়াইল আর কাউগাছগুলো ফলের ভারে নুয়ে পড়ল। আমের গাছগুলোতে বোল এসেছিল মাঘের গোড়ায়; এখন গুটি ধরেছে। লক্ষ লক্ষ ফড়িং ফিনফিনে পাতলা ডানায় বাগানময় উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। আর উড়ছে পাখি—শালিক, চড়ুই, বুনো টিয়া, বুলবুলি। দক্ষিণ দিক থেকে আজকাল ঝিরঝিরে স্নিগ্ধ হাওয়া বইতে থাকে।

এই ফুল-ফল-হাওয়া, এই পাখি পতঙ্গ, যুগল ছাড়া সব যেন অকারণে, সবই বৃথা। অন্তত বিনুর তাই মনে হয়।

যুগল চলে যাবার পর কিছুদিন সময় যেন থমকে ছিল। তারপর আবার চিরাচরিত পুরনো নিয়মে চলতে শুরু করেছে। নবু গাজির ছেলের সঙ্গে মজিদ মিঞার মেয়ের বিয়েও হয়ে গেছে এর মধ্যে। বিনুরা কেতুগঞ্জে গিয়ে সারাদিন থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছে। স্নেহলতা-শিবানী-সুরমা-হেমনাথ প্রত্যেকেই যে যার নিজের কাজের চাকায় বাঁধা। এরই ভেতর একদিন সময় করে বুধাই পালের মেয়ের মাঘমণ্ডলের ব্রত সাঙ্গ করিয়ে এসেছেন স্নেহলতা। হেমনাথের মতন তাঁরও দায়দায়িত্ব কি এক-আধটা? পারিবারিক দায়িত্ব, সামাজিক দায়িত্ব—সবই পালন করতে হয়। সুধা সুনীতি নিয়মিত কলেজ করে যাচ্ছে।

তবে সব চাইতে পরিবর্তন হয়েছে অবনীমোহনের। জমি পেয়ে একেবারে মেতে উঠেছেন তিনি। ধান উঠে যাবার পর পৌষ মাসে রবিশস্যের বীজ ছড়িয়েছিলেন—মুগ, তিল, মটর, খেসারি। চৈত্রের গোড়ায় রবিফসল উঠে গেছে; চৈত্রের শেষাশেষি হাল-লাঙল নিয়ে আবার মাঠে নেমে পড়েছেন। এ জন্য আটটা কামলা রেখেছেন অবনীমোহন; বলদ কিনেছেন ষোলটা। জমি চৌরস করে রাখবেন এখন। তারপর নতুন বর্ষার জল পড়লেই আউশ বুনবেন।

হেমনাথ ঠাট্টা করেন, 'তুমি দেখি দুদিনেই আমাদের চাইতেও বড় চাষী হয়ে উঠলে অবনী।'

অবনীমোহন কিছু বলেন না, শুধু হাসেন।

সুরমা বলেন, 'দেখ, ক'দিন উৎসাহ থাকে।'

চৈত্রের পর এল নিদারুণ খরার দিন। মাঠ ফেটে এখন চৌচির। আলের ধারের জলসেঁচি শাকগুলো পুড়ে পুড়ে হলুদ হয়ে যেতে লাগল। মেঘশূন্য আকাশ সারাদিন গলা কাঁসার রঙ ধরে থাকে। অনেক, অনেক দূরে আকাশ যেখানে ধনুরেখায় দিগন্তে নেমেছে সেইখানে আগুনের হল্কা কাঁপতে থাকে। কার সাধ্য সেদিকে তাকায়।

সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরে সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফেরেন অবনীমোহন। ফিরেই দুদিনের বাসি খবরের কাগজ নিয়ে বসেন।

পুজোর পর সেই যে কলকাতায় গিয়েছিলেন অবনীমোহন তখনই তাঁর নামে রাজদিয়ায় খবরকাগজ পাঠাবার ব্যবস্থা করে এসেছিলেন। টাটকা টাটকা খবর আর কেমন করে পাওয়া যাবে? কলকাতায় যে কাগজ আজ বার হয় ট্রেনে-স্টিমারে রাজদিয়ায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে তার দু'দিন লেগে যায়। কী আর করা যাবে, এই গ্রামদেশে দুদিনের বাসি খবর নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় অবনীমোহনকে।

আজকাল কাগজভর্তি শুধু যুদ্ধের খবর। কমাস আগেও রাজদিয়ার মানুষের যুদ্ধ সম্বন্ধে মাথাব্যথা ছিল না। কোথায় জার্মানী, কোথায় ফ্রান্স, কোথায় গ্রীস, কোথায় ইংল্যাণ্ড, কোথাই বা বল্কান—ভূগোলের কোন্ প্রান্তে এই দেশগুলো ছড়িয়ে আছে তার খোঁজ রাখার প্রয়োজন বোধ করত না তারা। কিন্তু ইদানিং রাজদিয়ার গায়ে যুদ্ধের আঁচ লাগতে শুরু করেছে।

সন্ধ্যে হলে নিকারীপাড়ায় আইনুদ্দি, সর্দারপাড়ার ইচু-শেখ, কুমোরপাড়ার হাচাই পাল, বুধাই পাল, যুগীপাড়ার গোসাই দাস—এমনি অনেকে এসে হাজির হয়। এ ছাড়া হেমনাথ-সুধা-সুনীতি-বিনুরা তো আছেই।

সবাই এসে জড়ো হলে অবনীমোহন হেরিকেনের আলো উস্কে দিয়ে কাগজ পড়তে শুরু করেন।

পুজোর পর ব্যবসাপত্তরের ব্যবস্থা করতে কলকাতায় গিয়েছিলেন অবনীমোহন। ফিরে আসার পর থেকেই খবরকাগজ পড়ার আসর বসছে। প্রথম দিকে ইচু মণ্ডলরা আসত না; তখন বাড়ির লোকদের শোনাতেন

অবনীমোহন ; পরে খবর পেয়ে ইচু মণ্ডলরা আসতে শুরু করেছে। আজকাল তারা নিয়মিত আসে।

অবনীমোহন কোনদিন পড়েন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশ যুদ্ধের আওতার ভিতর চলিয়া আসিতেছে। তাহাদের প্রেরিত সমরোপকরণ যাহাতে বৃটেনে পৌঁছাইতে না পারে সে জন্য জার্মান বিমান ও ইউ বোটগুলি আটলান্টিকে হানা দিয়া ফিরিতেছে।'

'দূর প্রাচ্যে ঘোরালো অবস্থা। বৃটেন সেখানে ব্যাপক সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে।'

'সিঙ্গাপুরের খবরে প্রকাশ, হাজার হাজার অস্ট্রেলিয়ান সৈন্য সিঙ্গাপুরে পৌঁছিয়াছে এবং মালয়ের বিভিন্ন স্থানে যাত্রা করিয়াছে।'

কোনদিন পড়েন, 'বাংলা সরকারের ইস্তাহার : বিমান আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হউন। কলিকাতা শহরে হাজার হাজার আগুনে বোমা পড়িতে পারে ; তবে আগুনে বোমা দেখিয়া ভয় পাইবেন না।'

'সিঙ্গাপুরের খবর : হাইনান ও টঙ্কিনে জাপানীরা দশ ডিভিশন সৈন্য সন্নিবেশ করিতেছে। ইন্দোচীনের দরিয়ায় জাপানের নৌবাহিনী টহল দিতেছে।'

কোনদিন পড়েন, 'জাপ পররাষ্ট্র সচিব মাৎসুওকা বার্লিন যাইবার পথে মস্কোতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন।'

কোনদিন পড়েন, 'জার্মানী কর্তৃক যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস আক্রমণ। যুগোশ্লাভিয়াকে হাত করিয়া গ্রীসের উপর আক্রমণ চালাইবার পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় নাৎসীরা যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করে। বেলগ্রেডে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ—'

'জাপ-সোভিয়েট অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত।'

'জার্মানীর দুর্ধর্ষ সামরিক বিমান 'স্টুকারের' আবির্ভাব।'

কোনদিন অবনীমোহন পড়েন, 'চীন-জাপান যুদ্ধের নতুন অধ্যায়। মহাচীনে চুংকিঙ সরকারের সহিত কমিউনিস্টদের মিটমাট হইয়াছে। চিয়াং কাইশেক কমিউনিস্ট চতুর্থ বাহিনী ভাঙিয়া দিবার পর উত্তর-পশ্চিম চীনে কমিউনিস্ট অষ্টম বাহিনী চুংকিঙের সহিত সহযোগিতা করিতেছিল না। ফলে তাহারা জাপ আক্রমণ ঠেকাইতে পারিতেছিল না। এই অবস্থায় চুংকিঙ সরকার কমিউনিস্টদের নিকট আবেদন জানান। ইহার পর কমিউনিস্টরা তাহাদের সহিত যোগদানের সিদ্ধান্ত করে। এখন তাহারা মিলিতভাবে আক্রমণ করায় জাপানীরা মুশকিলে পড়িয়াছে।'

'শেনসি, সানসি ও হোনানে পাল্টা আক্রমণ চলিতেছে।'

কোনদিন পড়েন, 'জার্মানীর বিরুদ্ধে আমেরিকার আচরণ ক্রমেই উগ্রতর হইয়া উঠিতেছে। মার্কিন সরকার আমেরিকায় জার্মান দূতাবাস, তাদের পাঠাগার, টুরিস্ট ব্যুরো, ট্রান্স ওসেন নিউজ এজেন্সী ইত্যাদি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।'

কোনদিন পড়েন, 'রুশ-জার্মান যুদ্ধের শুরু।'

'লেনিনগ্রাদ, সেবাষ্টিপুল, ওদিকে হেলসিঙ্কি, ওয়ারশ, ডানজিগে জার্মান বোমাবর্ষণ।'

'কৃষ্ণসাগর হইতে শ্বেতসাগর পর্যন্ত যুদ্ধের বিস্তৃতি।'

'জার্মানদের বর্তমানে চারটি প্রধান লক্ষ্য : মুরমানস্ক, লেনিনগ্রাদ, মস্কো ও কিয়েফ।'

কোনদিন পড়েন, 'চীন-জাপান যুদ্ধ চার বছর পার হইয়া পাঁচ বছরে পড়িল।'

'রুশ-জার্মান যুদ্ধ শুরু হইবার পর আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি বিস্তারের দিকে মনোযোগ।'

খবরকাগজের পাতা জুড়ে শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ। উত্তেজনা আর আতঙ্ক। শ্বাস টানলে বাতাসে বারুদের গন্ধ পাওয়া যায়। দেশ-দেশান্তর জুড়ে সেই আগুনের চাকা যেন আরো, আরো বড় হয়ে ঘুরতে শুরু করেছে।

রোজই খবরকাগজ পড়া হয়ে গেলে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়।

ইচু মণ্ডল বলে, 'জারমান-জুরমান, মাৎস্কা, লেনিনগোরাদ—নামগুলি জবর খটমইটা।'

অবনীমোহন হাসেন, 'হ্যাঁ।'

'জাগাগুলি (জায়গাগুলো) কোনখানে জামাই?'

'ওর ভেতর শুধু জায়গার নাম নেই, মানুষের নামও আছে। জায়গাগুলো এখান থেকে অনেক দূরে।'

ইচু মণ্ডল মাথা নাড়ে, 'হেয়া বুঝছি। আমাগো দ্যাশে অমুন খটর-মটর নাম নাই।'

বুড়ো রসিক শীল বলে, 'আইচ্ছা জামাই—'

ইতিমধ্যে রাজদিয়া এবং চারদিকের গ্রাম-গঞ্জ-জনপদে 'জামাই' নামে পরিচিত হয়েছেন অবনীমোহন। হেমনাথের ভাগনী-জামাই, সেই সুবাদে এ অঞ্চলেরও জামাই হয়ে গেছেন। ঐ নামেই সবাই তাঁকে ডাকে।

অবনীমোহন বলেন, 'কী বলছেন ?'

'খবরের কাগজ শুইনা তো মনে লাগে চাইর দিকে বেড়া আগুন লাগছে। আপনের কী মনে হয় ?'

'কী ব্যাপারে ?'

'য্‌জু্য (যুদ্ধ) কি আমাগো এই রাইজদিয়াতেও আইসা পড়ব ?'

'কেমন করে বলি।'

ওধার থেকে হাচাই পাল বলে ওঠে,'যুজ্যু লাগাব কিনা কেঠা কইব। তয়—

অবনীমোহন শুধোন, 'তবে কী ?'

'বাজারে আগুন লাইগা গেছে।'

বুধাই পাল বলে, 'হে (তা) যা কইছ ঠাউরভাই; আগুনই লাগছে। আমাগো লাখান গরীব মাইনষে আর বাচবো না। বাগুনের স্যার (সের) আছিল এক পহা ত্যাড় পহা ; হেই বাগুন অহন তিন পহা চাইর পহায় বিকাইতে আছে।'

ইসমাইল চৌকিদার বলে, 'মলন্দি মাছ আর বজুরি মাছের ভাগা আছিল তুই পহা কইরা। তার দাম উঠছে ছয় পহা। এক গেলাস মাঠা চাইর পহা। পটল যে পটল, মূলা যে মূলা, ঝিঙ্গা যে ঝিঙ্গা, বাঙ্গী যে বাঙ্গী—কোন্ জিনিসখানে হাতে দিতে পারবা ! সগল আগুন।'

ইচু মণ্ডল বলে, 'মাছ-বাগুন-মূলা-পটল এক কিনারে থুইয়া দাও। যেই দবা না হইলে পরান্ বাচে না তার খপর রাখ ?'

সমস্বরে অন্য সবাই শুধোয়, 'কোন্ দব্য ?'

ইচু মণ্ডল বলে, চাউল রে ভাই, চাউল। চাউলেই ঘাউল করছে। গেল হাটে চাউলের দর কত উঠছে জানো ?

'কত ? কত ?'

'আঠার ট্যাকা মণ।'

অনেকগুলো ভীতবিহ্বল কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'কও কী মণ্ডলের পুত ?'

ইচু মণ্ডল মাথা নাড়ে, 'ঠিকই কই রে দাদারা, ঠিকই কই।'

বুধাই পাল বলে, 'গেল হাটে চাউল কিনি নাই; তার আগের হাটে কিনছিলাম। তহন দর আছিল বার ট্যাকা মণ। সাত দিনের ভিত্রে ছয় ট্যাকা চইড়া গেল।'

ইচু মণ্ডল বলে, 'দরের অখনই দেখছ কী। ব্যাপারীরা কইতে আছিল, পরের হাটে আরো দর চড়ব।'

'সত্য ?'

'সত্য।'

'তাইলে উপায়! আরো দর চেতলে (বাড়লে) খামু কী? পোলামাইয়ারে খাওয়ামু কী?'

'খাইতে আর হইব না ; শুকাইয়া মরতে হইব।'

'কী যুজ্যু যে লাগল!'

এ কমাসে খবরকাগজের পাতা জুড়ে যুদ্ধের খবরই বেশি। তার ফাঁকে ফাঁকে অন্য খবরও চোখে পড়েছে অবনীমোহনের। সেগুলোও পড়ে পড়ে শুনিয়েছেন তিনি।

'সত্যাগ্রহ করিয়া মৌলানা আজাদের আঠার মাস সশ্রম কারাদণ্ড লাভ।'

'সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান। কিছুদিন যাবৎ সুভাষচন্দ্র মৌনাবলম্বন করেন এবং নিজের ঘরে গীতা, চণ্ডী ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতে থাকেন। হঠাৎ দেখা যায় তিনি অন্তর্ধান করিয়াছেন। যেদিন তাঁহার গৃহত্যাগের সংবাদ প্রকাশ পায় সেদিন ভারতরক্ষা আইনের বলে তাঁহার বিচারের দিন ছিল। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের ফলে সারা ভারতবর্ষে নিদারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।'

'নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের অগ্নিমূল্য। দাম বাড়িয়া যাওয়ায় অসন্তোষ। নানা স্থানে ধর্মঘট।'

এসব ছাড়া মুসলিম লীগের খবর, কংগ্রেসের খবর, নেহরু-জিন্না-গান্ধীজী এবং হকসাহেবের খবর তো ছিলই। আর ছিল জিন্নাসাহেবের দেশ ভাগাভাগি করে নেবার পরিকল্পনা এবং দাবী।

সুভাষচন্দ্র-পাকিস্থান-গান্ধী-জিন্না এসব নিয়েও হেমনাথের ঘরের দাওয়ায় হেরিকেনের অনুজ্জ্বল আলোয় বসে শ্রোতারা কম আলোচনা করেনি ; দেশের রাজনৈতিক আর রাষ্ট্রীয় সমস্যা নিয়ে কম মাথা ঘামায়নি।

ইচু মণ্ডল বলেছে, 'আইচ্ছা জামাই—'

'বলুন—' জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছেন অবনীমোহন।

'সুভাষবাবু গেল কই ?'

'কী করে বলি।'

'সুভাষবাবু খুব বড় মনিষ্য (মানুষ)।'

'নিশ্চয়ই।'

'এংরাজগো চৌখরে ফাকি দিয়া যাওন সোজা না।'

'তা তো ঠিকই।'

ওধার থেকে উদ্বেগের গলায় ইসমাইল চৌকিদার শুধিয়েছে, 'সুভাষবাবুরে এংরাজরা আর ধরতে পারব ?'

অবনীমোহন বলেছেন, 'কিছুই বলতে পারছি না।'

ইচু মণ্ডল বকের পাখার মতন সাদা ধবধবে দাড়ি নেড়ে বলেছে, 'সুভাষবাবুরে আমি দেখছি।'

ইসমাইল চৌকিদার, রজবালি সিকদার, বুধাই পালেরা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করেছে, 'কই দেখলা চাচা, কই দেখলা ?'

'বরিশালে ; তেনি আইছিল। কী সোন্দর দেখতে ; য্যান রাজপুত্তুর।'

কথায় কথায় দেশভাগের কথাও এসে পড়েছে। পাকিস্তানের কথা এসেছে।

এ প্রসঙ্গে বুধাই পাল বলেছে, 'অ গো হ্যামকত্তা, অ গো জামাইকত্তা—'

হেমনাথ অবনীমোহন দুজনেই তাকিয়েছেন।

বুধাই পাল আবার বলেছে, 'মাইন্‌ষের মুখে শুনি, খপরের কাগজেও লেখছে, দ্যাশখান নিহি ভাগাভাগির কথা হইতে আছে! একখান ভাগ হিন্দুর, একখান মুসলমানের।'

হেমনাথ আস্তে করে মাথা নাড়েন।

'দ্যাশ আবার কেমনে ভাগ হয় ?'

'কি জানি—'

এই সময় ইচু মণ্ডল হঠাৎ বলে উঠেছে, 'দ্যাশ ভাগের কথায় একখান কথা মনে পড়ল। সম্বাদখান তোমাগো শুনাই।'

'কও, কও—' সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠেছে।

'বুঝলা নি ভাইস্তারা (ভাইপোরা), হেই—হেইবার—' স্বরে দীর্ঘ টান দিয়ে একটু থেমেছে ইচু মণ্ডল। হয়তো মনে মনে বক্তব্যটাকে গুছিয়ে নিচ্ছিল সে।

শ্রোতাদের তর আর সইছিল না। ভাববার মতন সময়টুকু দিতেও তারা রাজী না। সকলে সমস্বরে তাড়া দিয়ে উঠেছে, 'কোন্ বার চাচা, কোন্ বার ?'

ইচু মণ্ডল পাকা ভুরুদুটো কুঁচকে বলেছে, 'হেই যেবার জোড়া বান ডাকল ; কী তুফান বড় নদীতে। এই রাইজদিয়া জলের তলে পরায় (প্রায়) সাত দিন ডুইবা আছিল। ঝড়ে আমার বাড়ির মধুটুকরি আমের গাছটা মাটিতে শুইয়া পড়ল ; দুইখান ঘরের চাল উইড়া গিয়া পড়ল তিন মাইল তফাতে। হেই বারের দুই বছর আগে কি পরে মনে নাই—'

সময় সম্পর্কে এখানকার মানুষের ধারণা অদ্ভুত। সাল-তারিখের হিসেব নিয়ে তাদের দুর্ভাবনা নেই; তার ধারও তারা ধারে না। ভয়াবহ কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা ঐরকম কোন ঘটনার স্মৃতি দিয়ে তারা সময়ের হিসেব করে।

ইচু মণ্ডল থামেনি, 'হেইবার, বুঝলা ভাইস্তারা এংরাজরা ঠিক করছিল বাঙলা দ্যাশখানেরে দুই টুকরা করব—'

'পারছিল?'

'হে কি পারে! বড় বড় বাবুরা আর বড় বড় মেঞাছাবরা দ্যাশখানেরে উথাল-পাথাল কইরা ছাড়ল। শ্যাষম্যাষ এংরাজরা ডরাইয়া গেল; দ্যাশ আর টুকরা-টাকরি করতে সাহস পাইল না।'

রোজই এই খবরকাগজ পড়ার সময় কিছুক্ষণ অবনীমোহনদের কাছে এসে বসে বিনু। কী একটা বইতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কথা পড়েছিল সে। বিনু বুঝতে পেরেছে, সেই কথাই বলছে ইচু মণ্ডল।

বুধাই পাল, হাচাই পাল এবং ইসমাইল চৌকিদার বয়সে বেশ প্রবীণ। অবশ্য ইচু মণ্ডলের চাইতে ঢের ছোট। ইচুর কথায় তাদেরও যেন মনে পড়ে গেছে। ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে তারা বলেছে, 'আমাগো ছোটকালে এইরকম একখান কথা শুনছিলাম য্যান।'

ইচু মণ্ডল আবার কী বলতে যাচ্ছিল; হঠাৎ তার নজর এসে পড়েছে হেমনাথের ওপর। হেমনাথ চুপচাপ ওদের কথা শুনছিলেন। ইচু মণ্ডল তাঁকেই সাক্ষী মেনে এবার বলেছে, 'এই যে হ্যামকত্তা, আপনেই তো এই বাইজদিরা তুলপাড় কইরা ফেলছিলেন। মনে পড়ে বাড়ি বাড়ি ঘুইরা বুঝাইছিলেন, হিন্দুই হৌক আর মুসলমানই হৌক, সগল বাঙ্গালীই এক?'

হেমনাথ উত্তর দ্যাননি; অল্প হেসে ঘাড় হেলিয়ে দিয়েছেন।

ইচু মণ্ডল আবার বলেছে, 'এংরাজরা পারে নাই; ওনরা পারব! যত তামসার কথা!'

বয়েস যাদের কম তারা শুধিয়েছে, 'এই সগল কত কাল আগের কথা চাচা?'

ইচু মণ্ডল বলেছে, 'তা বিশ-পঞ্চাশ বচ্ছর আগের হইব।' বলতে বলতে হেমনাথের দিকে ফিরেছে, 'না হ্যামকত্তা?'

হেমনাথ কৌতুক বোধ করেছেন। বলেছেন, 'তুমি তো সবই জানো।'

কমবয়সীরা জিজ্ঞেস করেছে, 'তহন তোমার কত ব'স (বয়স) চাচা?'

ইচু মণ্ডল বলেছে, 'হে হইব দ্যাড় কুড়ি, দুই কুড়ি। ছ্যামরারা তহন আমার জুয়ান ব'স (বয়স), ঘরে তিন বিবি—'

শুনতে শুনতে সবাই হেসে উঠেছে।

॥ সতের ॥

এই দেশবাঙলায় ঋতু বলতে চারটি—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শরৎ। বাকি ঋতুরা কখন যায় কখন আসে, বিশেষ টেরও পাওয়া যায় না। তারা আসে চুপিসাড়ে; যায় আরো নিঃশব্দে।

চার ঋতু বাদ দিলে বাকি থাকে হেমন্ত আর বসন্ত। মাঠভর্তি জলে যখন টান ধরে, উত্তুরে বাতাসে যখন চামড়া ফাটতে থাকে, সকালের দিকটায় ঠাণ্ডায় গায়ে কাঁটা দেয়, কুয়াশায়-হিমে সন্ধ্যেটা যখন ঝাপসা, সেই সময়টা হেমন্ত। ভাল করে হেমন্তকে বুঝবার আগেই শীত নেমে যায়। শীতের পর মান্দার আর শিমুল গাছে থোকা থোকা রক্তবর্ণ ফুলের নিশান উড়িয়ে বসন্ত আসে। কিন্তু তার আয়ু আর কতটুকু? দেখতে দেখতে মাঠ-টাঠ শুকিয়ে চৌচির হয়ে যেতে থাকে। ফাটলের ভেতর থেকে বিষাক্ত নিশ্বাসের মতন পৃথিবীর অন্তঃপুরের যত উত্তাপ বেরিয়ে আসে। আকাশ যেখানে ধনুরেখায় দিগন্তে বিলীন সেখানে আগুনের হল্কার মতন রোদ কাঁপতে থাকে অর্থাৎ খরা এসে গেল।

হেমন্ত আর বসন্ত ছাড়া বাকি চার ঋতুর চেহারা এখানে স্পষ্ট। এসেই তাদের পালাই পালাই নেই। একবার এলে যেতেই চায় না; রীতিমত আসর জাঁকিয়ে বসে আকাশে-বাতাসে-বৃক্ষলতায় আপন স্বভাবটি মুদ্রিত করে তবে যাবার নাম করে।

এখন আষাঢ়। জষ্ঠির মাঝামাঝি খালবিল ছাপিয়ে নতুন বর্ষার জল আসতে শুরু করেছিল। পশ্চিমা বাতাসের টানে আকাশ জুড়ে তখন থেকেই কালো কালো ভবঘুরে মেঘেদের আনাগোনা। জষ্ঠি মাসে যে মেঘগুলো ছিল অস্থির, উড়ু-উড়ু, নিয়ত-চঞ্চল, তারাই একাকার হয়ে জমাট বেঁধে আকাশময় বিরাট এক চন্দ্রাতপের মতন মাথার ওপর অনড় হয়ে আছে।

সারাদিন বৃষ্টি পড়ছেই। কখনও ঝিপ ঝিপ, কখনও ঝরঝর। ভরা বর্ষার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিনুর মনে হয়, যুগযুগান্ত ধরে কাল-কালান্তর পার হয়ে এ বৃষ্টি পড়ছেই, পড়ছেই।

হেমনাথের পুকুরটা বর্ষার প্রথম দিকেই ভেসে গিয়েছিল। মাঠ-ঘাট-খেত

সব এখন জলের তলায়। নতুন বর্ষার জল পড়তেই বীজ বোনা হয়েছিল; ধান-গাছ এখন জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফনফনিয়ে বেড়ে উঠছে।

কচুবনে দিন-রাত ব্যাঙ ডাকছে; ঝিঁঝিদের রাজ্যেও একটানা জলসার আসর বসেছে। আকাশ-পাতাল জুড়ে তাদের মিলিত সুর সব কিছুকে করুণ, বিষণ্ণ, উদাস করে তুলেছে। এ ছাড়া যেন পৃথিবীতে আর কোন শব্দ নেই।

এই জলবাঙলায় এত যে পাখি—জলপিপি, কবুতর, মোহনচূড়া, বথারি, শালিক, সিদ্ধিগুরু, বুনোটিয়া—বর্ষা নামবার পর থেকে তাদের আর দেখা নেই। কোথায় কোন ঠিকানায় তারা দেশান্তরী হয়েছে, কে জানে।

সমস্ত চরাচর বৃষ্টির অবিরাম দীর্ঘ ধারাগুলির ওধারে ঝাপসা হয়ে আছে। কদাচিৎ পুকুরের ওপারে ধানখেতের ভেতরে এক-আধটা নৌকো চোখে পড়ে। দেখেও যেন বিশ্বাস হতে চায় না। মনে হয় অনেকদিন আগের দেখা কোন আবছা স্মৃতির ভেতরে নৌকোগুলো দোল খাচ্ছে।

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে একদিন হেমনাথ আর অবনীমোহনের সঙ্গে সুজনগঞ্জের হাটে গেল বিনু। অনেকদিন পর এবার সুজনগঞ্জে এল সে। স্কুল চলছে, এখন হাটে আসবার সময় কোথায় তার।

এত জল, এত বাদলা তবু সুজনগঞ্জের হাটে ভিড় একই রকম আছে। শিয়রের দিককার নদীটা নৌকোয় নৌকোয় তেমনই ঢাকা। দশ-বিশ মাইলের ভেতরে এই একটাই তো হাট। বিকিকিনির জন্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য, প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসটুকুর জন্যও হাটের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয়। মানুষ না এসে কী করবে?

জলবাঙলায় বেশ কিছুদিন কেটে গেল বিনুদের। দাদুর সঙ্গে খুব বেশি না হলেও সুজনগঞ্জের হাটে খুব কমও আসেনি সে। আর অবনীমোহন তো প্রতি হাটেই আসছেন। নিয়মিত যাতায়াতের ফলে সুজনগঞ্জের প্রায় সব ব্যাপারী-পাইকার-আড়তদার-দোকানদারের সঙ্গে তাঁদের আলাপ হয়ে গেছে।

হেমনাথের বাড়ি ইচু মণ্ডলরা সন্ধ্যেবেলা এসে যা বলাবলি করে, দেখা গেল তা সত্যি। মাছের বাজারে, আনাজপাতির বাজারে, ডাল-মশলার বাজারে— যেখানেই বিনুরা যাচ্ছে সেখানেই এক কথা।

'জিনিসপত্র আগুন হইয়া উঠছে। কী যে করুম—'

'দর বাড়লে, তোমাদের তো ভালই। লাভ বেশি।'

'লাভ বেশি ঠিকই কিন্তুক আমাগোও তো চড়া দরে চাউল-ডাইল কিনতে হয়। বেশি লাভ কইরা সুফল কী? আগে দুই ট্যাকা আড়াই ট্যাকার মাল

বিকাইতে পারলে হপ্তার খরচা উইঠা যাইত, পোলামাইয়ারে দুধে-ভাতে রাখতে পারতাম। আইজ-কাইল দশ-বিশ ট্যাকা বেইচাও ব্যাড় (বেড়) পাই না। দিন কাল কী যে আইল!'

হাটে এলেই হেমনাথ চারদিক টহল দিয়ে বেড়ান। এখানে একটু বসেন, ওখানে দু দণ্ড দাঁড়িয়ে গল্প করেন। হেমনাথের সঙ্গে থেকে থেকে তাঁর এই স্বভাবটি পেয়ে গেছেন অবনীমোহন। হাটের সব মানুষের সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে না পারলে তাঁর ভালই লাগে না।

ঘুরতে ঘুরতে বিনুরা একসময় নিত্য দাসের ধানের আড়তে এসে পড়ল। খুব খাতির-টাতির করে নিত্য দাস তাদের বসাল।

হেমনাথ বললেন, 'তারপর খবর কী নিত্য?'

নিত্য দাস শুধলো, 'কোন খপর জানতে চান বড় কত্তা?'

'কোন খবর আর, ধান চালের—'

'ধান চালের খপর জবর মোন্দ—'

'কেমন?'

'চাউলের দর বিশ ট্যাকায় উঠছে।'

'গেল হাটে না আঠার ছিল?'

'হ।' নিত্য দাস মাথা নাড়ে, 'অহন রোজ দর চেততে (চড়তে) আছে।' বলতে বলতে গলা নামিয়ে ফিসফিস করে, 'একখান বড় খারাপ সম্বাদ শুনলাম বড় কত্তা—'

কপাল কুঁচকে হেমনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'কী সংবাদ?'

'ধান-চাউল নিকি আর পাওয়া যাইব না।'

'কে বললে?'

'পরস্পর কানে আইতে আছে।'

হেমনাথ চিন্তিত মুখে বললেন, 'ঠিক শুনেছিস?'

নিত্য দাস বলল, 'হ বড় কত্তা।'

'এ দেশ ধান-চালের দেশ। এত চাল-চাল যাবে কোথায়?'

'যুদ্ধে নিকি লাগব।'

একটু নীরবতা। তারপর নিত্য দাসই আবার শুরু করল, 'বড় কত্তা একখান কথা জিগাই।'

'কী?'

'আপনের সগল ধান বেইচা দিছেন?'

'সব বেচিনি, খোরাকির চাইতে কিছু বেশি আছে।'

'বাড়তি ধান অহন ছা'ইড়েন না, 'রাখি' করেন। পরে কামে দিব।'

'দেখি।'

নিত্য দাসের আড়ত থেকে বেরিয়ে বিনুরা বিষহরি তলায় চলে এল। বর্ষাকালে বিষহরি তলার ওধারে পুকুরপারের ফাঁকা জমিতে রুগী দেখতে বসেন না লারমোর। মন্দিরের একধারে একটা ঢাকা বারান্দায় চেয়ার-টেবিল ওষুধের বাক্স সাজিয়ে বসেন। আজও বসেছিলেন।

বিনুরা এসে তাঁর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। রুগী দেখতে দেখতে কথা বলতে লাগলেন লারমোর।

অবনীমোহন বললেন, 'জিনিসপত্রের দর ভয়ানক চড়ছে লালমোহনমামা।'

অন্যমনস্কের মতন লারমোর বলেন, 'চড়ছে নাকি?'

'বা রে, আপনি জানেন না!'

'জানবার সময় কোথায়?' লারমোর বলতে থাকেন, 'সারাদিন রুগী নিয়েই থাকি। অন্য দিকে তাকাবার ফুরসুতই পাই না। অবশ্য—'

অবনীমোহন বলেন, 'কী?'

'রুগীরা দর চড়ার কথা বলে বটে।'

অবনীমোহন এবার চুপ করে রইলেন।

লারমোর আবার বললেন, 'দর যদি চড়েই তুমি আমি কী করতে পারি বল? ভেবে কিছু লাভ নেই।'

কথাটা ঠিক। ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন অবনীমোহন।

লারমোর বলতে লাগলেন, 'ঘরে কিছু চাল আছে। দর চড়লে জিনিসপত্তর যদি কিনতে না পারি একবেলা 'ফেন ভাত' করে খাব। দিনে একবার খেতে পেলেই আমার চলে যাবে।'

যে মানুষের ঘর-সংসার নেই, ছেলেমেয়ে নেই, বহুজনের হিতে যিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁর সঙ্গে দর-টর নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়া বৃথা। তা বুঝে অবনীমোহন অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। এবারকার বর্ষা, লারমোরের রুগী ইত্যাদি ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা চলল।

কথায় কথায় একসময় বৃষ্টি ধরে এল। পুব দিকের ঘন মেঘে ফাটল ধরিয়ে চিকচিকে একটু আভা ফুটে বেরুল।

হেমনাথ বললেন, 'বৃষ্টি থেমেছে। এই ফাঁকে কেনাকাটা সেরে নিলে ভাল হত না?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ—' ব্যস্তভাবে অবনীমোহন উঠতে যাবেন সেই সময় দূরের ফাঁকা মাঠটায় একজোড়া ঢাক বেজে উঠল।

চমকে বিনু সেদিকে চোখ ফেরাতেই দেখতে পেল সেই ঢেঁড়াদার লোকটা—নাম যার হরিন্দ—একটা উঁচু প্যাকিং বাক্সের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে মা কালীর অসুরের মতন কুচকুচে কালো দুই ঢাকী, কাগা আর বগা, মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে প্রচণ্ডভাবে ঢাক পিটিয়ে চলেছে।

বিনুর মনে পড়ে গেল, যুগলের সঙ্গে প্রথম যেদিন সে সুজনগঞ্জের হাটে আসে সেদিনও কাগা-বগা আর হরিন্দকে ঢেঁড়া দিতে দেখেছিল। অনেক—অনেকদিন পর হরিন্দ এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গকে আবার সুজনগঞ্জে দেখা গেল।

ঢাকের আওয়াজ পেয়ে তামাক-হাটা, আনাজ-হাটা, নৌকো-হাটা ভেঙে দিগ্বিদিক থেকে মানুষ ছুটে আসতে লাগল। মুহূর্তে হরিন্দদের গোল করে ঘিরে ভিড় জমে গেল।

হেমনাথ বললেন, 'হরিন্দরা এসেছে দেখছি।'

অবনীমোহন বললেন, 'হ্যাঁ।

'কিসের ঢেঁড়া দিতে এল, কে জানে।'

অবনীমোহন কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। উৎসুক স্বরে বললেন, 'চলুন মামাবাবু, একটু দেখে আসি।

তাঁর মনের কথাটা বুঝিবা পড়তে পারলেন হেমনাথ। বললেন, 'চল।

কাছাকাছি আসতে বিনুরা দেখতে পেল, মাথাটা একদিকে হেলিয়ে লোক-জন দেখছে হরিন্দ। যখন বুঝতে পারল সারা হাট তার চারধারে ভেঙে পড়েছে সেই সময় হাতের ইঙ্গিতে কাগা-বগাকে থামিয়ে দিল।

ভিড়ের ভেতর থেকে হাটুরে মানুষগুলো প্রশ্ন ছুঁড়তে লাগল, 'এতকাল পর কী মনে কইরা গো ঢেড়াওল?'

হরিন্দ বলল, 'সম্বাদ আছে।'

হরিন্দর আসা মানেই রসের বান ডেকে যাওয়া। পাখি যেমন নানা দেশ থেকে ঠোঁটে ঠোঁটে শস্যকণা কুড়িয়ে আনে, হরিন্দও তেমনি নানা রাজ্য ঘুরে হঠাৎ একদিন, বলা নেই কওয়া নেই, মজার মজার চমকদার খবর নিয়ে আসে। এই জলবাঙলায় জীবন যেখানে মৃত, নিঃশব্দ, তিরতিরে স্রোতের মতন বেগবর্ণ-হীন, হরিন্দ সেখানে আনন্দের দূত। ঝুলি বোঝাই করে সে আনন্দ নিয়ে আসে। হরিন্দ এলেই তাই সুজনগঞ্জের হাটে সাড়া পড়ে যায়।

হাটুরে লোকেরা উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'কী সম্বাদ, কী সম্বাদ?'

হরিন্দ বলল, 'শুনলেই বুঝবা ; ধৈয্য ধর।'

লোকগুলোর ধৈর্য মানে না। অধীর গলায় তারা বলতে লাগল, 'রসের সম্বাদ তো, অ ঢেড়াওলা ?'

উত্তর না দিয়ে হরিন্দ এবার ঢাকী দুটোর দিকে তাকাল, 'বাজা ব্যাটারা, ঘুইরা ফিরা বাজা—'

একধারে বসে কাগা-বগা বিড়ি টানছিল ; তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ঢাকে কাঠি দিয়ে চারদিক সরগরম করে তুলল।

এটা হরিন্দর পুরনো কৌশল। এর সঙ্গে বিনুর আগেই পরিচয় হয়েছে। লোকের কৌতূহল উস্কে দেবার জন্য মাঝে মাঝে কথা বন্ধ করে কাগা-বগাকে দিয়ে ঢাক বাজাতে থাকে।

কিছুক্ষণ বাজাবার পর হরিন্দ কাগা-বগাকে থামাল। তারপর গলা উঁচুতে তুলে বলল, 'হাটৈরা (হাটুরে) ভাইরা, তোমরা অহন যাইও না। দুইজন মাইন্যগণ্য মনিস্য আইজ এইখানে আইব।'

সমস্ত ভিড়টা চেঁচিয়ে উঠল, 'তেনারা (তাঁরা) কারা ?

'এস্-ডি-ও সাব আর জিলা ম্যাজিস্টর সাব। মটর লঞ্চে কইরা তেনারা আইব।

ভিড়ের ভেতর এবার গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল, 'এছ-ডি-ও সাব, ম্যাজিস্টর সাব এইখানে ক্যান ? অ ঢেড়াওলা ভাই, তুমি কিছু বিত্তান্ত জানো ?

হরিন্দ বলল, 'জানি। তয়—'

'তয় কী ?'

'কমু না।'

'ক্যান কইবা না ? ক্যান ?'

'নিষেধ আছে। যা কওনের তেনারা আইসা কইব। এট্টু সবুর কর।'

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং এস-ডি-ওর মতন মানুষ যে সুজনগঞ্জের হাটে আসতে পারেন, এ এক অভাবনীয় ঘটনা। কেন তাঁরা আসছেন, উদ্দেশ্যটা কী, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কাজেই হাটুরে মানুষগুলোর ভেতর গবেষণা শুরু হয়ে গেল।

মাছ ব্যাপারী গয়জদ্দি বলল, 'আমার মনে হয়, ধান-চাউলের দর-দাম বাড়তে আছে, ম্যাজিস্টর সাবরা এর একটা পিতিকার করব। হেই লেইগা আইতে আছে।'

বেগুন ব্যাপারী নোয়াজ মিঞা বলল,'আমার কিন্তুক অন্য কথা মনে লাগে—'

মরিচ ব্যাপারী বিনোদ পাল শুধলো, 'কী মনে লাগে নোয়াজ ভাই ?'

'আমাগো হাটৈরা মানুষগো পিছামোড়া বাইন্ধা লইয়া যাইব।'

'শুদাশুদি বাইন্ধা নিব ক্যান ? আমাগো অপরাধখান কী ?'

'গরীব মাইনষের অপরাধ লাগে না, বাইন্ধা নিলেই হইল।'

ওধার থেকে গো-হাটার কাদের মিঞা হাল্কা গলায় রঙ্গ করে, 'আমার কী মনে লয় জানস ? ম্যাজিস্টর সাবের পোলার লগে এছ-ডি-ও সাবের মাইয়ার সাদি হইব। হেই লেইগা আমাগো মেজবান করতে আইতে আছে।' সবাই হেসে উঠল।

হাল্কা এবং গম্ভীর—যত আলোচনাই চলুক, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদের আসার উদ্দেশ্যটা বোঝা যাচ্ছে না। তাই হাটুরে মানুষগুলো ভীত, চিন্তিত, সন্ত্রস্ত হয়ে রইল। সন্দেহে সংশয়ে দুলতে লাগল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। সত্যি সত্যি একটু পর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা এসে পড়লেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব খাস ইংরেজ,লাল চকচকে চেহারা। ছ' ফুটের বেশি লম্বা, প্রকাণ্ড বুক, মাথায় হ্যাট। এস-ডি-ও সাহেব কিন্তু বিশুদ্ধ বঙ্গসন্তান। কিন্তু গায়ের রংটি বাদ দিলে কে বলছে তিনি বাঙালী। হ্যাট-কোট-প্যাণ্ট এবং চাল-চলন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চাইতে তিন কাঠি ওপরে।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদের আগমনটি সত্যিই দর্শনীয়। সামনে এক অক্ষৌহিণী বন্দুকধারী পুলিস, পেছনে আরেক অক্ষৌহিণী। দুটো লম্বা লোক ম্যাজিস্ট্রেট এবং এস-ডি-ও সাহেবের মাথায় ছাতা ধরে আছে।

তাঁরা এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে দুটো বড় বড় কারুকাজ-করা ভারী চেয়ার এসে পড়ল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা বসলেন ; চারদিকের জনতা দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল।

চেয়ারে বসেই এস-ডি-ও সাহেব ইশারায় হরিন্দকে কাছে ডাকলেন ; কানের কাছে মুখ নিয়ে নীচু গলায় কি ফিসফিস করলেন। তারপরেই হরিন্দ লাফ দিয়ে ঢাকী দুটোর কাছে গিয়ে হাওয়ায় হাত ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'বাজা ব্যাটারা, বাজা—'

কিছুক্ষণ বাজনার পর কাগা-বগাকে থামিয়ে হরিন্দ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'হাটৈরা ভাইরা, এইবার এচ-ডি-ও ছাব আপনেগো কিছু কইব—' বলে এক ধারে সরে গেল।

এস-ডি-ও সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

কোথাও এতটুকু আওয়াজ নেই। বাতাস বুঝি থেমে গেছে। গাছের একটা পাতা খসলেও এখন তার শব্দ পাওয়া যাবে।

গলায় খাকারি দিয়েএস-ডি-ও সাহেব হঠাৎ শুরু করলেন, 'বন্ধুগণ, আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন যুদ্ধ লেগেছে—'

কেউ উত্তর দিল না। গলা লম্বা করে জনতা উদগ্রীব দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখের পলক পড়ছে না।

এস-ডি-ও সাহেব চারদিকে সারি সারি মানুষগুলোর মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর বলতে লাগলেন, 'যুদ্ধ আমাদের এই পূর্ববাঙলা-তেও চলে আসতে পারে। তাই বলছিলাম, ঘব-সংসার এবং দেশ রক্ষা করবার জন্যে আপনারা দলে দলে সেনাদলে নাম লেখান।'

জনতার ভেতর গুঞ্জন উঠল, 'যুজ্জো যাইতে কয়। হায় আল্লা, ঐ কারবারে আমি নাই।'

আরেকজন কে বলল, 'যুজ্জো গিয়া মরি আর কি।'

অন্য একটি গলা শোনা গেল, 'লও যাই, মানে মানে অহন সইরা পড়ি।'

একটু থেমে এস-ডি-ও সাহেব খুব সম্ভব জনতার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলেন। আবার তিনি শুরু করলেন, 'দেশেব জন্যে, মাতৃভূমির জন্যে, নিজের ভাইবোন সন্তানদের জন্যে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে; শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। নইলে সব কিছু ছারখাব হয়ে যাবে।' একটু ভেবে, 'আজই আপনাদের যুদ্ধে নাম লেখাতে হবে না; বাড়ি গিয়ে সবাই ভাবুন। আসছে হাটে আবার আমরা আসব। তার পরের হাটেও আসব। এখন থেকে প্রতি হাটেই আমরা আসব। আপনারা এর ভেতর ভেবেচিন্তে নিন। মনে রাখবেন, সেনাদলে এমনি এমনি নাম লেখাতে বলছি না। ভালই মাইনে পাবেন, পোশাক পাবেন, ভাল খেতে পাবেন। আমার কথা শেষ হল, এবার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আপনাদের কিছু বলবেন।' বলে বসে পড়লেন তিনি।

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবার উঠে দাঁড়ালেন। বাঙলাটা তিনি ভালই বোঝেন কিন্তু তেমন বলতে পারেন না। ভাঙা ভাঙা যা বললেন তা এই রকম।

'বন্ধুগণ আপনারা যুদ্ধে আসিলে টাকা পাইবে, অনেক সুখ হইবে। গভর্ণমেণ্টের খুব আনন্দ হইবে।' ইত্যাদি ইত্যাদি—

খাস ইংরেজের আড়ষ্ট জিভে জায়গা পেয়ে গর্বে বাঙলা ভাষার বুক যেন দশ হাত ফুলে উঠল।

একটু পর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা চলে গেলেন।

হাটুরে মানুষগুলো সেনাদলে নাম লেখাবার ব্যাপার নিয়ে সন্ত্রস্ত আলোচনা করতে করতে তামাক-হাটা, মরিচ-হাটা, গো-হাটার দিকে ছড়িয়ে পড়েত লাগল।

বিনুরা তখনও দাঁড়িয়েছিল।

উদ্বেগের গলায় হেমনাথ বললেন, 'যুদ্ধে রিক্রুটমেণ্টের জন্যে ম্যাজিস্ট্রেট এস-ডি-ও পর্যন্ত ছুটে এসেছে। অবস্থা খুব ভাল না অবনীমোহন।'

॥ আঠার ॥

জষ্ঠিমাসে সেই যে বৃষ্টি নেমেছিল, এখনও তার থামবার নাম নেই। মনে হয় দু-এক দিন নয়, দু-চার মাসও নয়, অনাদি অনন্তকাল ধরে ঝরছেই। ঘন কালো মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বৃষ্টির লক্ষ কোটি ধূসর ধারায় চরাচর ঝাপসা, বর্ণহীন, বিস্বাদ।

ঘরের জানলায় বসে আকাশ দেখতে দেখতে বিনুর মনে হয়, কোন দিন আর বেরুতে পারবে না ; আর কখনও রৌদ্রোজ্জ্বল ঝকমকে দিনের মুখ দেখতে পাবে না। এই ঘরটুকুর মধ্যেই চিরকাল বন্দী হয়ে থাকতে হবে। অথচ ঘরে থেকে তার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিনুর মনে হয়, জলের গন্ধ, ভেজা মাটির গন্ধ, গাছপালার গন্ধ চুঁইয়ে চুঁইয়ে তার বুকের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে এবং সেখানে বিচিত্র এক বিষাদ গাঢ় করে তুলছে। খুব খারাপ লাগে বিনুর, খুব খারাপ লাগে।

তাকে একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে ঝিনুক কখনও কখনও কাছে এসে দাঁড়ায়। অন্যমনস্কের মতন বিনু বলে, 'বৃষ্টি বোধহয় আর থামবে না।'

ঝিনুক বলে, 'থামবে না, তোমায় বলেছে!'

'আবার রোদ উঠবে?'

'উঠবে।'

'কবে?'

'বর্ষা গেলেই।'

যেদিন সকালের দিকে জোর বৃষ্টি নামে সেদিন আর স্কুলে যেতে পারে না বিনু। অল্প বৃষ্টি থাকলে অবশ্য ছাতা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

এই বর্ষার সময়টা প্রায়ই স্কুল কামাই হচ্ছে। সারাদিন বাড়িতে আটকে থেকে পরিচিত মানুষগুলোকে বার বার হাজার বার দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়ে বিনু। সন্ধ্যের সময় ইচু মণ্ডলরা যখন ভিজে ভিজে যুদ্ধের খবর শুনতে আসে, সেই সময়টা মোটামুটি উন্মাদনার মধ্যে কেটে যায়।

রোজই খবরকাগজ নতুন নতুন উত্তেজনা নিয়ে আসে। যুদ্ধের তাণ্ডব ক্রমশ বেড়েই চলেছে—এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত তার অশুভ ভয়াবহ ছায়া পড়ছে। বর্ষার অনড় মেঘের মতন দুই গোলার্ধকে কী এক অভিশাপ যেন ঢেকে ফেলেছে।

যুদ্ধের খবরের মধ্যে একদিন অবনীমোহন পড়ে শোনালেন, রবীন্দ্রনাথ খুব অসুস্থ। তারপর আরেক দিন পড়লেন, তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

দিনের পর দিন যেতে লাগল।

সেদিন অল্প অল্প বৃষ্টির ভেতর স্কুলে গেল বিনু। দুটো ক্লাস হবার পর হঠাৎ থার্ড পীরিয়ডে হেড মাস্টার মোতাহার সাহেব এলেন। অবোধ বালকের মতন তিনি কাঁদছেন, চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে ভাঙা গলায় বললেন, 'রবীন্দ্রনাথ আর নেই। আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি কী ছিলেন, কত বিরাট, কত বিপুল, আজ বুঝতে পারবে না। বড় হয়ে তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করো। যাও, আস্তে আস্তে বাড়ি চলে যাও।'

বাড়ি ফিরে বিনু দেখতে পেল, সমস্ত বাড়িটা যেন শোকাচ্ছন্ন, নিস্তব্ধ। পুবের ঘরের ঢাকা বারান্দায় অবনীমোহন হেমনাথ বসে ছিলেন। খুব চাপা গলায় ফিসফিস করে কি বলাবলি করছিলেন।

কাছে যেতে হেমনাথের গলা বিনুর কানে এল, পৃথিবী জোড়া অন্ধকারে ঐ একটুখানি আলো ছিল, তাও নিভে গেল।'

বিনু বুঝতে পারল, রবীন্দ্রনাথের কথাই হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ কত বড়, কত বিশাল, কত মহৎ—বিনুর জানা নেই। তবু পাষাণ-ভারের মতন কী যেন তার বুকের ভেতর নিশ্চল হয়ে রইল। শ্বাসটা আটকে আটকে আসতে লাগল যেন।

॥ উনিশ ॥

গত বছর পুজোর ছুটির পর সেই যে হিরণ ঢাকায় গিয়েছিল, সেই থেকে তার আর খোঁজখবর ছিল না।

হিরণ যাবার পর তাকে নিয়ে এ বাড়িতে আলোচনা কম হয়নি।

একদিন হেমনাথ বলেছিলেন, 'বাঁদরটা ঐরকম। কাছে থাকলে দিনরাত মাথামাখি ; যেই চোখের আড়াল হল অমনি সব ভুলে গেল।'

সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় সুধা-সুনীতি-বিনু, তিন ভাই-বোন পড়তে বসেছিল। চারদিক দেখে নিয়ে নীচু গলায় সুনীতি সুধাকে বলেছিল, 'দাদু হিরণচন্দর সম্বন্ধে তখন কী বলছিল শুনেছিস তো ? এমন মানুষকে মন দিলি ভাই, একবার খোঁজও নেয় না।'

সুধা ঠোঁট উল্টে দিয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে বলেছিল, 'খোঁজ নেয় না বলে তো আমি একেবারে মরে গেছি।'

'গেছিসই তো—'

'তোকে বলেছি ?'

'না বললে কী ; তোর মুখ দেখে বুঝতে পারি না ভেবেছিস ?'

'ও বাবা—' সুধা গালে হাত রেখে বলেছিল, 'কবে থেকে অন্তর্যামী হলি রে দিদি !'

সুনীতি বলেছিল, 'যেদিন হিরণচন্দরের সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছে সেদিন থেকে—'

একটু চুপ। তারপর সুনীতিই আবার শুরু করেছিল, 'ঐ ভদ্রলোকটি কিন্তু বেশ, কলকাতা থেকে ঠিক চিঠিপত্তর দিয়ে যাচ্ছে।'

সুধা মুখ টিপে হেসেছিল, 'তোর কথাই আলাদা। মনের মতন মনের মানুষ পেয়েছিস।'

'তোরটা বুঝি মনের মতন নয় ?'

'বিচ্ছিরি।'

'আয় তা হলে বদলা-বদলি করে নিই।'

'বদলা-বদলির দরকার নেই ; দুটোকেই তুই নিয়ে নে—'

মুখ লাল হয়ে উঠেছিল সুনীতির। ঝঙ্কার দিয়ে বলেছিল, 'তুই ভারি অসভ্য হয়ে উঠেছিস সুধা।'

সুধা উত্তর দেয়নি; হেসে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল।

বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ঢাকা থেকে হিরণ এসে হাজির।

পুবের ঘরে সুধা-সুনীতি-বিনু আর হেমনাথ বসে ছিলেন। হিরণকে দেখে হেমনাথ প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, 'আরে কালাচাঁদ যে, আয় আয়—'

হিরণ ছাতা নিয়ে এসেছিল। ছাতাটা মুড়ে বাইরে রেখে ভেতরে এসে বসল।

হেমনাথ আবার বললেন, 'কী ব্যাপার, এতদিন খবর নেই বার্তা নেই, একবার আসিসও নি। ঢাকায় বসে কী করছিলি?

হিরণ খুব গম্ভীর গলায় বলল, 'সরস্বতীর আরাধনা।'

হেমনাথ ভ্রূকুটি হানলেন, 'তার মানে?'

'তার মানে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। মাসে মাসে আমার পেছনে কতগুলো করে টাকা ঢালছ, খেয়াল আছে?'

হেমনাথ কিছু না বলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকলেন।

হিরণ বলল, 'অন্তত একটা ফার্স্ট ক্লাস যদি না পাই, তুমি আমাকে আস্ত রাখবে?'

হেমনাথ হেসে ফেললেন, 'তা রাখব না। শুধু কি তা-ই, এখানকার কলেজে চাকরিও দেব না।'

'তা হলেই বুঝে দেখ, ঢাকা থেকে হুট-হুট ছুটে আসা আমার পক্ষে সম্ভব না।'

'না-ই বা এলি। মাঝে মধ্যে চিঠি লিখলেও পারিস তো।'

'চিঠি লেখা আমার কুষ্ঠিতে নেই; তা তো তুমি জানই।'

'তোর কুষ্ঠিতে নেই। এদিকে আরেক জনের দিকে যে তাকানো যায় না। মুখে সব সময় মেঘ জমে আছে।'

'কার?'

আঙুল বাড়িয়ে সুধাকে দেখিয়ে দিলেন হেমনাথ। হিরণ-সুধা বা সুনীতি-আনন্দর মধ্যে যে হৃদয়রাগের খেলা চলছে এ বাড়িতে তা বিশেষ গোপন নেই।

এ ব্যাপারে হেমনাথদের কিছু প্রশ্রয়ও আছে। তাদের স্নেহের ছায়ায় চারটি উন্মুখ তরুণ মনে উৎসব শুরু হয়ে গেছে যেন।

যাই হোক হাত-পা নেড়ে একেবারে চেঁচামেচি জুড়ে দিল সুধা, 'আহা-হা, আহা-হা—'

এই সময়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন হেমনাথ। রসালো সুর টেনে টেনে বললেন, 'আহা আহা করিস না লো সই।' বলেই হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গান ধরলেন :

'নয়ন-নীরে কি নেভে মনের অনল
সাগরে প্রবেশি যদি না হয় শীতল॥
তৃষায় চাতকী মরে, অন্য বারি নাহি হেরে,
ধারাজল বিনে তার সকলই বিফল॥
যবে তারে হেরে সখি, হরিষে বরিষে আঁখি,
সেই নীরে নিভে সখি অনল প্রবল॥'

সুধা লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। আরক্ত মুখে বলল, 'এরকম করলে আমি কিন্তু চলে যাব দাদু—'

হাত ধরে সুধাকে তক্তপোশে বসিয়ে দিতে দিতে হেমনাথ বললেন 'আচ্ছা আচ্ছা, এই গান থামিয়ে দিলাম। তোরা গল্প-টল্প কর। আমাকে বেরুতে হবে হিরণ, তুই এখানে খেয়ে যাবি। হোম ডিপার্টমেণ্টে বলে যাচ্ছি।'

হিরণ ঘাড় হেলিয়ে জানাল, খেয়েই যাবে।

বেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ কী মনে পড়ায় দাঁড়িয়ে পড়লেন হেমনাথ। হিরণের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'হ্যাঁ রে—।'

'কী বলছ?'

'পুজো তো এসে গেল।'

'হ্যাঁ।'

'গেলবারের মতন এবারও নাটক-টাটক করবি তো?'

হিরণ বলল, 'এবার পুজোর ছুটিতে আমি আসছি না। ঢাকাতেই থাকব।'

একটু অবাক হলেন হেমনাথ, 'কেন রে?'

'ছুটির পর কতটুকু আর সময় পাওয়া যাবে। তারপরই পরীক্ষা—'

'তাই তো; আমার খেয়াল ছিল না। না-না, ছুটিতে তোর আসার দরকার নেই। পরীক্ষা আগে; জীবনে ফুর্তি করার ঢের সময় পাওয়া যাবে। আচ্ছা এখন যাচ্ছি।'

হেমনাথ বেরিয়ে যাবার পর মুখ নীচু করে নিঃশব্দে নখ দিয়ে তক্তপোশে আঁকিবুকি কাটতে লাগল সুধা। হিরণের সঙ্গে কথা-টথা যা বলবার, সুনীতিই বলল। তার এতদিন ডুব দিয়ে থাকা নিয়ে ঠাট্টা-টাট্টা করল; প্রাণ খুলে হাসির ফোয়ারা ছোটাল। তারপর একসময় কাজের ছল করে উঠে গেল।

এখন ঘরের ভেতর ওরা তিনজন। সুধা, হিরণ আর বিনু। বিনু জানলার বাইরে তাকিয়ে ছিল। আকাশ জুড়ে শুধু মেঘ আর মেঘ; চরাচর আচ্ছন্ন করে ধূসর রেখায় বৃষ্টি ঝরেই যাচ্ছে। ধানখেতের দিক থেকে হঠাৎ হঠাৎ দমকা বাতাস ছুটে আসে; বাগানের সুপুরি গাছগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ে। জামরুল আর কালোজাম গাছদুটো পরস্পরের দিকে ঝুঁকে ফিস ফিস গলায় কী পরামর্শ করতে থাকে।

অনেকক্ষণ নীরবতার পর হিরণই প্রথম কথা বলল, 'কেমন আছ সুধা?'

সুধা উত্তর দিল না।

হিরণ আবার বলল, 'খুব রাগ করে রয়েছ, না?'

এবার সুধা ভারী গলায় উত্তর দিল, 'না। খুশিতে—'

'খুশিতে কী?'

'ডগমগ হয়ে আছে।'

'সত্যি খুব অন্যায় হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে এক-আধবার রাজদিয়াতে আসা উচিত ছিল। কিন্তু এমন অভ্যেস আমার—'

'খুব খারাপ অভ্যেস—' এতক্ষণ সুধার গলা ভারী ছিল, এবার কাঁপতে লাগল, 'মরে গেছি কি বেঁচে আছি, খোঁজ নেওয়াও দরকার মনে করেন না—ওদিকে জানেন—'

'কী?'

'আনন্দদা সপ্তায় দুটো করে চিঠি লেখে দিদিকে—'

'আনন্দবাবু লেখে দুটো করে, ঢাকায় গিয়ে এবার থেকে আমি চারটে করে লিখব—'

'ইয়ার্কি হচ্ছে?'

'না-না—' হিরণ কিন্তু ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'তুমি দেখে নিও—'

সুধা ভয় পেয়ে গেল যেন, 'দোহাই আপনার, অত চিঠি লিখবেন না। দিদি তা হলে আমাকে খেপিয়ে মারবে। মাঝে মাঝে এক-আধটা লিখলেই আমি খুশী—'

কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল হিরণ, হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল, 'এই সুধা' —

'কী বলছেন ?'

'আমরা তো খুব প্রাণের কথা চালিয়ে যাচ্ছি। ওদিকে—'

'ওদিকে কী ?'

'ঘরের ভেতর বিনু রয়েছে না—'

এক পলক বিনুকে দেখে নিয়ে সুধা বলল, 'ওটা একটা হাবা গঙ্গারাম; জানলার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টিই দেখছে; আমাদের কথা কানেও যাচ্ছে না। ভারি অন্যমনস্ক ছেলে—'

হাবা গঙ্গারামটির চোখ অবশ্যই জানলার বাইরে ছিল; কিন্তু ধ্যানজ্ঞান ছিল ঘরের ভেতরে। কান খাড়া করে হিরণদের প্রতিটি কথা শুনে যাচ্ছিল বিনু।

সুধা বলা সত্ত্বেও সন্দেহ গেল না হিরণের। সংশয়ের গলায় বলল, 'যদি শুনে থাকে',

সুধা বলল, 'কিচ্ছু শোনেনি; আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কিরকম অন্যমনস্ক দেখবেন ?' বলেই ডাকল, 'এ্যাই বিনু—'

বিনু প্রথমটা সাড়া দিল না। বৃষ্টির লম্বা-লম্বা ধূসর রেখাগুলি এবং তাদের একটানা ঝম ঝম শব্দ ছাড়া জগতের আর কোন দিকে তার বিন্দুমাত্র মনোযোগ আছে বলে মনে হল না।

সুধা আবার ডাকল। বারকয়েক ডাকাকাকির পর চমকে ওঠার ভান করে বিনু ঘুরে দাঁড়াল, 'কী বলছিস ?'

'কী করছিস, জিজ্ঞেস করছিলাম—'

'বৃষ্টি দেখছি।'

'আমি তোকে কবার ডেকেছি বল্ তো ?'

'এই তো একবার।'

'আমরা কী বলছিলাম, শুনেছিস ?'

'না তো—'

'ঠিক আছে, তুই বৃষ্টি ত্যাখ—'

বিনু আবার জানলার বাইরে আচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকাল।

আর সুধা হিরণকে বলল, 'দেখলেন তো ?'

হাতেনাতে এত বড় প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও বিনুর সম্পর্কে সতর্ক হয়ে গেল হিরণ। যতখানি সম্ভব গলাটা অতলে নামিয়ে সে ফিস ফিস করতে লাগল। সঙ্গগুণেই কিনা কে জানে, সুধাও গলা নামাল।

আর জলবাঙলার ক্লান্তিহীন বর্ষণ দেখতে দেখতে উৎকর্ণ বিনু ঘরের দুটি অন্তরঙ্গ গাঢ় গলার ফিসফিসানি শুনতে লাগল।

।। কুড়ি ।।

দেখতে দেখতে আরেক পুজো এসে গেল।

এই সেদিনও আকাশ জুড়ে কালো মেঘ অনড় হয়ে ছিল। এখনও মেঘ আছে ; তবে তার রঙ গেছে বদলে।

সারা বর্ষার জলে ধুয়ে আকাশখানি এখন আশ্চর্য নীল। এত চকচকে, এত ঝকমকে যে মনে হয়, এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত একখানা নীল আয়না কেউ টাঙিয়ে রেখেছে। তার গায়ে থোকা থোকা সাদা মেঘের ভেলা ভাসানো।

আশ্বিন মাস পড়তেই খাল-বিল-নদীপারের কাশবন সাদা হয়ে গেছে। হিজল গাছগুলোর পাতা আর দেখা যায় না, শুধু ফুল আর ফুল।

বর্ষার সময়টা এই জলবাঙলা থেকে সব পাখি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। দিন-রাত একটানা বৃষ্টির ভেতর তারা বেরোয় কী করে? আশ্বিনের শুরুতে যেই বৃষ্টি থামল, মেঘ কেটে ঝলমলে সোনালী রোদ দেখা দিল, অমনি নিরুদ্দেশ পাখির ঝাঁক রাজদিয়ার আকাশে ফিরে আসতে লাগল। দিবানিশি তাদের কিচিরমিচিরে চারদিক এখন মুখর। আর এসেছে পতঙ্গেরা—ফড়িং, প্রজাপতি, নানারকম পোকা।

পুকুর, ধানখেত, দূরের মাঠ, মাঠের মাঝখানে ছোট ছোট কৃষাণ গ্রাম—বর্ষায় সব ভেসে গিয়েছিল। মাঠের জল, ধানখেতের জল, খালবিলের জল—সব জায়গায় জল এখন স্থির। কৃষাণ গ্রামগুলোকে দ্বীপের মতন দেখায়। দূরে দূরে মাঠের মাঝখানে ভেসাল জাল পাতা। ভেসালের বাঁশে শঙ্খচিল কি কানিবক ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকে। নিস্তরঙ্গ জলে ধানগাছের ছায়া, মূত্রার ছায়া, নল ঘাস এবং ধঞ্চের ছায়া সারাদিন স্থির হয়ে থাকে। শুধু উড়ন্ত পাখিদের ছায়া দুলতে দুলতে ধু-ধু দিগন্তের দিকে চলে যায়।

কটা মাস একটানা বর্ষায় স্যাঁতসেঁতে সিক্ত থাকার পর রোদে-বাতাসে-আলোয় এবং উত্তাপে জলবাঙলা আবার যেন সজীব প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

হেমনাথ আর অবনীমোহন এবার জমিতে আউশ ধান দিয়েছিলেন, পাটও করেছিলেন। শ্রাবণের শেষাশেষি আউশ উঠে গেছে। বর্ষায় পাট জাগ দিয়ে রাখা হয়েছিল। কামলারা এখন বার-বাড়ির বাগানে বসে পাটের আঁশ ছাড়াচ্ছে।

জমিজমা নিয়ে একেবারে মেতে উঠেছেন অবনীমোহন। দিনরাত ধান-পাট, কামলা-কৃষাণ, এসব নিয়েই আছেন। কে বলবে, মাত্র কমাস আগে জমি কিনেছেন। দেখেশুনে তো মনে হয়, চাষবাসই তাঁর জীবনের সারাৎসার। নিরবধি কাল ধরে এই কাজই করে যাচ্ছেন।

খরার দিনে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে জমি চৌরস করিয়েছেন অবনীমোহন; বর্ষার নতুন জল এলে বীজ বুনিয়েছেন। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আউশ ধান আর পাট কাটিয়েছেন। এখন যে পচা পাট থেকে আঁশ ছাড়ানো হচ্ছে, তাও সারাদিন সামনে বসে থাকেন। কৃষী জীবন তাঁকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

ধান পাট ছাড়া আর কিছুই আজকাল ভাবতে পারেন না অবনীমোহন। অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেবার মতন যথেষ্ট সময়ও তাঁর নেই।

হেমনাথ কিন্তু তাঁর নিজস্ব নিয়মেই চলছেন। বাড়ি থেকে একবার বেরুতে না পারলে তাঁর ঘুমই হয় না। এই রাজদিয়া কিংবা আশেপাশের গ্রামগঞ্জগুলোর খোঁজ নেওয়া চাই-ই। জষ্টির পর থেকে এত যে বর্ষা, এত যে জল, তবু তাঁকে কেউ বাড়িতে আটকে রাখতে পারেনি; ছাতাটি মাথায় দিয়ে ঠিক বেরিয়ে পড়েছেন।

আশ্বিন মাস পড়বার পর একদিন দুপুরবেলা কোত্থেকে বাড়ি ফিরে হেমনাথ বললেন, 'পুজোর ছুটি পড়ে গেছে। আজকের স্টিমারে কলকাতা থেকে রাজেন গুহর ছেলে-বৌ এল।'

স্নেহলতা বললেন, 'কে, অশোক?'

'হ্যাঁ।'

'গুহবাড়ির ছেলে তো এল। অন্য বাড়ির কেউ আসেনি?'

'এখনও আসেনি। দু-একদিনের ভেতর এসে পড়বে।'

পুজোর ছুটি পড়তেই গৃহকোণলোভী প্রবাসী সন্তানেরা ফিরে আসতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে রাজদিয়া ভরে যাবে। এখানকার মৃদু স্তিমিত বেগবর্ণহীন জীবন সরগরম হয়ে উঠবে।

একেক দিন একেক জনের খবর নিয়ে আসেন হেমনাথ। কোনদিন এসে বলেন, 'আজ মল্লিকবাড়ির সরোজরা এল।' কোনদিন বলেন, 'আজ নাহাবাড়ির প্রাণকান্তরা এল।' কোনদিন বলেন, 'আজ রুদ্রবাড়ির মহিমরা এল।'

হেমনাথ যখন খবর নিয়ে আসেন, সুধা-সুনীতি-বিনুরা অসীম আগ্রহে কাছে এসে দাঁড়ায়।

একেক দিন একেক জনের কথা বলেন হেমনাথ; কিন্তু ঝুমাদের সম্বন্ধে কিছুই বলেন না।

এই নিয়ে সুধা-সুনীতি চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে। সুধা বলে, 'কিরে দিদি—'

সুনীতি বলে, 'কী?'

'দাদু শিশির মামাদের কথা একবারও তো বলছেন না।'

'ওঁরা আসেননি, তাই বলছেন না।'

'ওঁরা এলে—'

'এলে কী?'

'আনন্দদাও আসবে।'

'তার কি কিছু ঠিক আছে?'

চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুধা বলে, আসবে রে, আসবে। তুই এখানে পড়ে আছিস, চিঠিতে কত আর মনের কথা লেখা যায়। বিধুমুখ দেখতে না পেলে—'

তার পিঠে দুম করে এক কিল বসিয়ে সুনীতি বলে, 'খুব ফাজলামি শিখেছিস!'

পিঠ বাঁকিয়ে খানিকক্ষণ 'উ-উ-উ' করে সুধা। তারপর ঘন গলায় বলে, 'আনন্দদা এলে বেশ হয়, না?'

সুনীতি বলে, 'জানি না, যা—'

পুজোর সপ্তাখানেক আগে একদিন বিকেলবেলা বাড়ি ফিরে হেমনাথ চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন, 'কই গো, কোথায় গেলে সব।'

সবাই হটে এল। স্নেহলতা বললেন, 'কী হয়েছে, অত চিৎকার করছ কেন?'

হেমনাথ বললেন, 'খুব খারাপ খবর।'

উদ্বিগ্ন মুখে স্নেহলতা শুধোলেন, 'কী?'

'আজ রামকেশবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ও কী বললে জানো?'

'কী?'

'শিশিররা এবার পুজোয় দেশে আসছে না।'

'কেন?'

'শিশিরের বড় মেয়ে রুমার খুব অসুখ। ডাক্তার নাড়াচাড়া করতে বারণ করেছে। তাই—'

স্নেহলতা বললেন, 'কী অসুখ ?'

হেমনাথ বললেন, 'টাইফয়েডের মতন—'

'সত্যিই খুব খারাপ খবর। হিরণটা পরীক্ষার জন্য আসতে পারবে না; শিশিররা আসবে না। এবারকার পুজোয় তেমন আনন্দ হবে না।'

একধারে সুধা-সুনীতি দাঁড়িয়ে ছিল। সুধা চাপা গলায় বলল, 'এই দিদি, তোর মুখটা অমন কালো হয়ে গেল কেন রে ?'

শিশিররা আসবে না শুনে সুনীতির মুখখানা সত্যিই ভারি করুণ হয়ে গিয়েছিল। সুধার কথায় হাসবার চেষ্টা করল সে, 'কোথায় কালো হয়েছে ?'

সুধা বলল, 'আমাকে তুই ফাঁকি দিতে চাস দিদি ?'

সুনীতি উত্তর দিল না।

একটু চুপ করে থেকে ভারী গলায় সুধা বলল, 'একজন ঢাকা থেকে রাজদিয়া আসতে পারবেন না, আরেকজন কলকাতায় পড়ে থাকবেন। না আসুক গে—'

সেদিনই রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঝুমার কথা ভাবছিল বিনু। আগের বছর পুজোর সময় তার সঙ্গে ভেসে-যাওয়া নৌকোয় করে মাঠের মাঝখানে চলে গিয়েছিল; সেখানে কাউ ফল পাড়তে গিয়ে পড়েছিল অথৈ জলে। ডুবেই যেত; ঝুমাই সেদিন তাকে নৌকোয় টেনে তুলেছিল।

শুধু কি তাই, ঝুমার পাশে বসে থিয়েটার দেখেছে। ঝাপসা রহস্যময় জ্যোৎস্নায় যুগলের নৌকোয় উঠে সুজনগঞ্জে যাত্রা শুনতে গেছে। নিশিন্দার চরে গেছে চড়ুইভাতি করতে। দুঃসাহসী মেয়েটার অসংখ্য মনোহর স্মৃতি নানা দিক থেকে বিনুর চারপাশে ভিড় করে আসতে লাগল।

হঠাৎ ঝিনুক ডাকল, 'বিনুদা—'

বিনু চমকে উঠল, 'কী বলছ ?'

'ঝুমারা এবার আসবে না।'

'হুঁ।'

'এবার থিয়েটারের সময় তোমার জন্যে আমি জায়গা রাখব।'

অন্যমনস্কের মতন বিনু বলল, 'হুঁ—'

ঝিনুক আবার বলল, 'সুজনগঞ্জের হাটে রাত্রিবেলা নৌকোয় করে যাত্রা শুনতে যাব।'

'হুঁ—'

হিরণ আসেনি, শিশিররা আসেননি। তবু পুজোয় সমারোহ কম হল না।

অন্যবারের মতন এবারও ধুনুচি-নাচের, ঢাকের বাজনার প্রতিযোগিতা হল, নাটক হল, যাত্রা হল, ভাসান গান হল, জারি-সারি-কাচ নাচের আসর বসল, একদিন ধুমধাম করে বাইচ খেলাও হয়ে গেল।

নিয়মমতন সবই হল কিন্তু মানুষের মন এবার বড় অস্থির, বড় চঞ্চল। পুজো-মণ্ডপে, জারি-সারি-ভাসান গান কি যাত্রার আসরে—সর্বত্রই এক কথা, এক আলোচনা।

'যুদ্ধ লাগছে; কী যে হইব!'

'এইবার আর রক্ষা নাই।'

'জিনিসপত্তরের দাম যা বাড়তে আছে তাইতে আর বাচতে হইব না।'

'জিনিসপত্র আর পাইবা নিহি; বাজার থিকা চাউল-ডাইল সগল উধাও হইয়া যাইতে আছে। টাকা-পয়সা যার আছে হ্যায়ও (সেও) না খাইয়া মরব, যার নাই হ্যায় তো মরবই।'

কলকাতা-প্রবাসী কেউ কাছাকাছি থাকলে আলোচনাটা আরো জমে ওঠে। কলকাতার মানুষ অনেক বেশি জানে-শোনে, অনেক বেশি খবর রাখে। তারা যুদ্ধ সম্বন্ধে এমন এমন সব কথা বলে যাতে ভয়ে আতঙ্কে রাজদিয়া-বাসীদের বুকের ভেতর শ্বাস আটকে যায়।

মোট কথা সবাই আশঙ্কা করে আছে, কিছু একটা ঘটবে। নিদারুণ, বিপজ্জনক, অনিবার্য কিছু। সারা দেশ, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তারই আয়োজন চলছে। রাজদিয়া-বাসীরা ভাবে, যুদ্ধ যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে; এই রাজদিয়ারও নিস্তার নেই।

দুর্গাপুজোর পর লক্ষ্মীপুজো। তারপর রাজদিয়া আবার ফাঁকা হয়ে গেল। একে একে কলকাতার চাকুরেরা ফিরে যেতে লাগল। ক্ষণিকের জন্য রাজদিয়া উৎসবে উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে উঠেছিল; তার ওপর আবার স্তিমিত নিরুচ্ছ্বাস বর্ণহীন দিন নেমে আসতে লাগল।

লক্ষ্মীপুজোর পর কালীপুজো।

কালীপুজোর রাত্তিরে একটা মজার ঘটনা ঘটল। মজার এবং বিস্ময়েরও।

রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে বিনু আর ঝিনুক হেমনাথের ঘরে শুতে আসছিল। স্নেহলতা ঝিনুককে ডাকলেন।

ঝিনুক দাঁড়িয়ে পড়ল, 'কী বলছ?'

স্নেহলতা তার কথার উত্তর না দিয়ে বিনুকে বললেন, 'তুই শুতে চলে যা দাদাভাই—'

বিনু বলল, 'ঝিনুক যাবে না?'

'না।'

ঝিনুক এইসময় চেঁচিয়ে উঠল, 'বা-রে, আমার বুঝি ঘুম পায় না!'

স্নেহলতা বললেন, 'ঘুম পেয়েছে তো আমার বিছানায় শুয়ে থাক গে—'

ঝিনুক অবাক, 'তোমার বিছানায় শোব কেন?'

'আজ থেকে আমার কাছেই শুবি।'

'না-না, দাদুর কাছে শোব, বিনুদাদার কাছে শোব—' ঝিনুক হাত পা ছুঁড়তে লাগল।

বড় বড় চোখ পাকিয়ে কঠিন গলায় স্নেহলতা বললেন, 'না।'

ঝিনুক বা বিনু স্নেহলতার এ চেহারা আগে আর কখনও গ্যাখেনি, এমন কণ্ঠস্বরও শোনেনি। নিমেষে ঝিনুকের হাত-পা ছোঁড়া বন্ধ হল কিন্তু জেদটা একেবারে গেল না। ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে, আর সমানে বলতে লাগল, 'কেন ওদের কাছে শোব না, কেন?'

খুব শান্ত গলায় স্নেহলতা এবার বললেন, 'তুমি এখন বড় হয়ে গেছ, তাই—'

ঝিনুক বিহ্বলের মতন প্রতিধ্বনি করল, 'বড় হয়ে গেছি!' বলে নিজের দিকে তাকাল, তাকিয়েই রইল।

স্নেহলতা বললেন, 'হ্যাঁ।'

ঝিনুক কী বুঝল, কে জানে। আর কিছুই বলল না।

আর বিমূঢ় বিনু অবাক চোখে ঝিনুককে দেখতে লাগল। গেল বার পুজোর সময় তারা রাজদিয়া এসেছে। এবার আরেক পুজো গেল। এক বছরের ভেতর কখন কোন্ ফাঁকে মেয়েটা বড় হয়ে গেছে, সে ভেবেই পেল না।

খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে থেকে এক সময় একাই হেমনাথের ঘরে চলে গেল বিনু।

॥ একুশ ॥

পুজোর ছুটির পর স্কুল খুলল। মাঝখানে মোটে দেড়টি মাস; তারপরেই এ্যানুয়েল পরীক্ষা।

সারা রাজদিয়া জুড়ে এখন পড়ার মরসুম চলছে। আজকাল যে বাড়িতেই

যাওয়া যাক, সকাল-সন্ধ্যে কচি কচি গলার একটানা বিচিত্র সুর কানে আসে, 'থ্রী সাইডস্ অফ এ ট্রাঙ্গেল—' অথবা 'জলস্পর্শ করবো না আর চিতোর রানার পণ, বুঁদির কেল্লা মাটির পরে থাকবে যতক্ষণ।' ইত্যাদি ইত্যাদি। জিরাও, ভার্বেল নাউন, বহুব্রীহি সমাস, জ্যামিতির কঠিন কঠিন উপপাদ্য, এ্যালজেব্রার ফরমূলাগুলো চারদিক জুড়ে এখন রাজত্ব করে চলেছে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা দক্ষিণের ঘরে বিনুরা পড়তে বসেছে। বাইরের বারান্দায় অবনীমোহন, হেমনাথ খবরের কাগজ নিয়ে আসর জমিয়েছেন। ইচু মণ্ডল, ইসমাইল চৌকিদার, কুমোরপাড়ার হাচাই পাল, বুধাই পাল—এমনি অনেকে ঘন হয়ে বসে নিশ্বাস বন্ধ করে যুদ্ধের খবর শুনছে।

হঠাৎ বাগানের দিক থেকে রাজদিয়া স্কুলের ইংরেজির টীচার আশু দত্তর গলা ভেসে এল, 'হেমদাদা আছেন ?'

পড়তে বসেই ঢুলুনি শুরু হয়ে গিয়েছিল বিনুর ; চোখ বুঁজে আসছিল। বার বার বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ছিল সে।

আশু দত্তর গলা পেয়ে ঝিমুনি ছুটে গেল। খাড়া হয়ে বসে শেষ পর্দায় গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বিনু পড়তে লাগল, 'আফ্রিকার কঙ্গো নদীর অববাহিকায় পিগ্মি নামক জাতি বাস করে। ইহারা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মানব, মাত্র চার ফুট দীর্ঘ। এই অঞ্চলের তীব্র সূর্যতাপের জন্য—

চোখ বইয়ের পাতায় আছে ঠিকই কিন্তু কান রয়েছে বাইরে।

ওদিকে হেমনাথ বারান্দা থেকে সাড়া দিয়েছেন, 'আছি। কে, আশু ?'

'হ্যা।'

'আয়, আয়—'

আশু দত্ত এলে একটা জলচৌকিতে তাঁকে বসানো হল। হেমনাথ বললেন, 'কী ব্যাপার আশু, হঠাৎ রাত্রিবেলা কী মনে করে ?

আশু দত্ত বললেন, 'একটু খোঁজখবর নিতে এলাম।'

'কিসের ?'

'আপনার না ; আমার ছাত্রের।'

'মানে বিনুর ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ'

জিজ্ঞাসু সুরে হেমনাথ বললেন, 'বিনু তো ভালই আছে। ঐ যে পড়ছে। কিন্তু—'

আশু দত্ত হেসে বললেন, 'ভাবনার কিছু নেই। আমি পড়াশোনারই খোঁজ

নিতে এসেছি। বুঝতেই তো পারছেন, এ্যানুয়েল পরীক্ষার আর বেশি দেরি নেই। ছেলেগুলো পড়ছে কি ঘুমুচ্ছে দেখতে হবে না ?'

হেমনাথও হেসে ফেলল, 'তা তো ঠিকই। বিনুকে ডাকব ?'

'ডাকতে হবে না ; আমিই ঘরে যাচ্ছি।'

'যা—'

আশু দত্ত ঘরের ভেতর এলেন। গলার স্বর আরেক পর্দা চড়িয়ে দিল বিনু।

আশু দত্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পড়া শুনলেন। তারপর ডাকলেন, 'বিনয়—'

স্কুলে বিনয় নামটাই চালু। বিনু বই থেকে মুখ তুলে বলল, 'আজ্ঞে—'

'পড়াশোনা কেমন হচ্ছে ?'

রাজদিয়া ছোট জায়গা। এখানে সবাই সবাইকে চেনে। সুধা-সুনীতির সঙ্গে আগেই আশু দত্তর পরিচয় হয়েছিল।

সুধাটা চিরকালের বিভীষণ। সে বলল, 'কোথায় পড়া ; এই তো একটু আগে ঢুলছিল।'

কটমট করে সুধাকে একবার দেখে নিয়ে মিনমিনে গলায় বিনু বলল, 'ঢুলছিলাম না স্যার।'

আশু দত্ত বললেন, 'মন দিয়ে পড়। ইংরেজি র‍্যাপিড রিডার আর গ্রামার কিন্তু তোমার ঠিকমতম তৈরি হয়নি। ওগুলো দেখে রাখবে।'

'রাখব স্যার।'

'মুখে বললে হবে না, কাজে দেখাতে হবে। পড়ায় ফাঁকি দিচ্ছ কিনা, দেখতে আমি আবার আসব।'

'কবে আসবেন ?'

'তা কি বলে আসব। যে কোনদিন আসতে পারি।'

আশু দত্ত ঘরের বাইরে যেতে হেমনাথ বললেন, 'বোস্, চা খাবি ?'

আশু দত্ত অবাক, 'আপনার বাড়িতে চা ঢুকেছে নাকি !'

হেমনাথ হাসলেন, 'জামাইয়ের চায়ের অভ্যেস। চা না ঢুকিয়ে কী করি বল্।'

'তাহলে খেয়েই যাই।'

একটু পরে চা এল। খেয়েই উঠে পড়লেন আশু দত্ত।

হেমনাথ বললেন, 'এক্ষুনি যাবি ? আরেকটু বোস্ না। খবরের কাগজ এসেছে ; গরম গরম অনেক যুদ্ধের খবর আছে। শুনে যা।'

'আমার বসবার সময় নেই হেমদাদা।'

'কেন, তোমার কী এমন রাজকাজ?'

'আর বলবেন না। লাহিড়ীবাড়ি যেতে হবে, মুন্সীবাড়ি যেতে হবে, রুদ্রদের বাড়ি যেতে হবে।'

'কেন?'

'ওদের বাড়ির ছেলেরা পড়ায় বড্ড ফাঁকি ছায়। এখন থেকে যদি পেছনে না লেগে থাকি ম্যাট্রিকে স্কুলের রেজাল্ট ভাল হবে কি করে? আমি চাই রাজদিয়ার প্রত্যেকটা ছেলে লেখাপড়ায় ভাল হোক, মানুষ হোক।' একটু থেমে আশু দত্ত আবার বললেন, 'যুদ্ধের খবর শুনবার জন্যে বসতে বলছেন? শুনে কী করব? যুদ্ধ তো আর আমি ঠেকাতে পারব না। যা হবার তাই হবে।'

আশু দত্ত চলে যাবার পর অবনীমোহন সবিস্ময়ে বললেন, 'রাত্তিরবেলা উনি ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াবেন!'

হেমনাথ মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ। ছেলেদের চিন্তায় আশুটা পাগল। কে পড়ছে না, কার কী অসুবিধা হচ্ছে—এসব দেখে না বেড়ালে ওর ঘুমই হয় না।'

অসীম শ্রদ্ধায় অবনীমোহন উচ্চারণ করলেন, 'সত্যি, এরকম শিক্ষক আগে আর কখনও দেখিনি।'

॥ বাইশ ॥

অ্যানুয়েল পরীক্ষার ক'দিন আগে খুব হৈ-চৈ। জাপানীরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। পার্ল হারবারে, সিঙ্গাপুরে, ম্যানিলায় বোমা ফেলেছে। 'প্রিন্স অফ ওয়েলস' আর 'রিপালস্' নামে দুটো বড় বড় জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে।

ভয়, উত্তেজনা, আতঙ্ক, উদ্বেগ এবং রকমারি গুজবের মধ্যে বিনুদের পরীক্ষা হয়েও গেল।

অ্যানুয়েল পরীক্ষার কিছুদিন পর খবর-কাগজ আরও মারাত্মক সংবাদ বয়ে আনল। জাপানীরা ঘরের কাছে বর্মায় নাকি এবার বোমা ফেলেছে। শুধু তাই না, বর্মা থেকে দলে দলে লোক পায়ে হেঁটে দুর্গম পাহাড়-পর্বত বনজঙ্গল পেরিয়ে ভারতবর্ষের দিকে চলে আসছে।

একদিন হেমনাথ বললেন, 'ত্রৈলোক্য সেনের নাম শুনেছ তো?'

স্নেহলতা বললেন, 'যে রেঙ্গুনে থাকত?'

'হ্যাঁ। তারা আজ রাজদিয়ায় ফিরে এসেছে।'

স্নেহলতা বললেন, 'ত্রৈলোক্য সেন একাই এসেছে?'

হেমনাথ বললেন, 'একা আসবে কি, ছেলেপুলে নাতি-নাতকুড়—সবাইকে নিয়ে এসেছে। তাদের কোথায় রেখে আসবে?'

'হঠাৎ চলে এল?'

'বা রে, তুমি কি কিছুই খোঁজ রাখো না।'

একটু অবাক হয়ে স্নেহলতা বললেন, 'কিসের খোঁজ?'

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'বর্মায় জাপানীরা বোমা ফেলেছে। অনেক লোক মরেছে। বাড়িঘর রাস্তাঘাট, সব ধ্বংসস্তূপ। বোমা পড়তেই রেঙ্গুন শহর থেকে লোক পালাতে শুরু করেছিল। রেঙ্গুন এখন একেবারে ফাঁকা।'

কোথায় বর্মা, কোথায় জাপান, কোথায় শ্বেতসাগর, কোথায় ডানজিগ-সেবাস্টিপুল-মস্কো, কোথায় বলকান-যুগোশ্লাভিয়া-পোল্যাণ্ড—ভূগোলের কোন্ প্রান্তে এই জায়গাগুলো পড়ে আছে, দুই গোলার্ধের কোথায় কোথায় বোমা পড়ছে, কত লোক মরছে, মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য কারা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, এ সব কোন খবরই রাখেন না স্নেহলতা। এই রাজদিয়া, হাচাই পালের মেয়ের মাঘমণ্ডলের ব্রত, নাটাই চণ্ডীর ব্রত, নীলপুজো, কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো, বাস্তুপুজো, কারো বিয়ে হলে জলসইতে যাওয়া, বাসর জাগা—এ সবের মধ্যেই তাঁর ভূমণ্ডল, তাঁর জগৎ। এতকাল এর বাইরের কোন কিছু সম্বন্ধেই তাঁর দুর্ভাবনা ছিল না।

ভীত স্বরে স্নেহলতা বললেন, 'তাই নাকি; এত কাণ্ড হয়েছে!'

'হ্যাঁ! ঐরকম অবস্থায় মানুষ কখনও বর্মায় পড়ে থাকতে পারে?'

'তা তো ঠিকই।'

হেমনাথ বললেন, 'ত্রৈলোক্যদের যা দুর্গতি হয়েছে কি বলব—'

'তবে এল কী করে?'

'হেঁটে।'

'বর্মা তো শুনেছি অনেক দূর।'

'হ্যাঁ। ছেলেপুলে নাতি-নাতনীর হাত ধরে পাহাড়-পর্বত-বন-জঙ্গল পেরিয়ে আসাম এসেছে। সেখান থেকে ট্রেনে রাজদিয়া।'

একটু ভেবে স্নেহলতা বললেন, 'হেঁটে তো এসেছে। জিনিসপত্র কিছু আনতে পেরেছে কি?'

হেমনাথ জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, 'কিছু না, কিছু না। নিজের নিজের হাত-পা আর পরনের জামা-কাপড় ছাড়া কুটোটুকুও আনতে পারে নি।'

'আহা রে, কী কষ্ট!'

একটু চুপ।

তারপর স্নেহলতা আবার বললেন, 'অনেককাল পর ত্রৈলোক্য সেনরা রাজদিয়া এল, তাই না?'

হেমনাথ বললেন, 'হ্যাঁ। তা বছর তিরিশেক হবে।'

'বর্মায় ওরা তো বেশ ভালই ছিল।'

'ভাল বলে ভাল। বিরাট অবস্থা করে ফেলেছিল ত্রৈলোক্য। এক রেঙ্গুনেই তিনখানা বাড়ি, প্রোমে ছিল একখানা। তা ছাড়া জমিজমা, নারকেল বাগান। নগদ টাকা পয়সাও প্রচুর।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্নেহলতা বললেন, 'কিছুই আনতে পারল না। সর্বস্ব বিদেশেই পড়ে রইল।'

হেমনাথ বললেন 'বাড়িঘর যাক। নিজের নিজের প্রাণটুকু নিয়ে যে আসতে পেরেছে, এই ঢের।'

হঠাৎ কী মনে পড়তে স্নেহলতা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'ভালো কথা—'

'কী?'

'অনেককাল ওরা ছিল না। রাজদিয়ায় ওদের বাড়ি তো জঙ্গলে ঢেকে গেছে। তা উঠল কোথায়? আমাদের বাড়ি নিয়ে এলেই পারতে। যদ্দিন না কিছু একটা ব্যবস্থা হয় এখানেই থাকত।'

হেমনাথ বললেন, 'ভালো জায়গাতেই উঠেছে, সে জন্যে চিন্তা নেই। স্টিমারঘাটা থেকে রামকেশব ত্রৈলোক্যদের নিজের বাড়ি নিয়ে তুলেছে।।'

'আপাতত ওখানেই থাকছে তা হলে?'

'হ্যাঁ।'

'কাল একবার যাব।'

'হ্যাঁ, যাওয়া দরকার।'

ম্যাপ বইতে বর্মার মানচিত্র দেখেছে বিনু। ভারতবর্ষের ঠিক গায়েই ব্রহ্মদেশ। আরাকান, ইরাবতী, পেগু, মান্দালয়—সে দেশের নদ-নদী শহর-বন্দরের নাম ভূগোল বইয়ের কল্যাণে তার মুখস্থ। ম্যাপে যত কাছে মনে হয়, ব্রহ্মদেশ আসলে তত কাছে নয়—সে কথা বিনু জানে। ভারতবর্ষ, বিশেষ করে এই রাজদিয়া থেকে বর্মা শত শত মাইল দূরে।

রাজদিয়া নামে জলবাঙলার এক অখ্যাত নগণ্য মফঃস্বল শহরের লোক বর্মায় গিয়ে দীর্ঘ তিরিশ বছর ছিল, জাপানী বোমার ভয়ে এতকাল পর সপরিবারে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে আবার জন্মভূমিতে ফিরে এসেছে—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন অবিশ্বাস্য। একধারে দাঁড়িয়ে ত্রৈলোক্য সেনদের কথা শুনতে শুনতে বিস্ময়ে চোখে আর পলক পড়ছিল না বিনুর। বুকের ভেতর শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমার সঙ্গে আমিও যাব দিদা—' ত্রৈলক্য সেনদের দেখবার জন্য মনে মনে সে অস্থির, উন্মুখ হয়ে উঠেছে।

বিনু যেতে চেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ঝিনুক‌ও সুর ধরল, 'আমিও যাব ঠামু (ঠাকুমা)।'

দেখা গেল সুধা-সুনীতি, এমন কি সুরমা-শিবানী-অবনীমোহনেরও এ ব্যাপারে বেশ আগ্রহ। বর্মা ফেরত মানুষগুলোকে দেখার জন্য সকলে পা বাড়িয়ে আছে।

স্নেহলতা বললেন, 'সবাই যাবে।' বলেই হেমনাথের দিকে ফিরলেন, 'ওদের জিজ্ঞেস করেছ?'

হেমনাথ বললেন, 'কী?'

'টাকা পয়সা কি অন্য কিছুর দরকার আছে কিনা?'

'না। সব এসেছে। তা ছাড়া, রামকেশব নিজের বাড়ি নিয়ে গেছে। এক্ষুনি জিজ্ঞেস করাটা খারাপ দেখায়।'

একটু চুপ করে থেকে স্নেহলতা বললেন, 'আমি কিন্তু কাল ত্রৈলোক্য-ঠাকুরপোকে জিজ্ঞেস করব।'

চিন্তিত মুখে হেমনাথ বললেন, 'কোরো। তবে রামকেশবের সামনে না।'

'তা তোমাকে বলে দিতে হবে না। আমার ঘটে সেটুকু বুদ্ধি আছে।' স্নেহলতা হাসলেন।

'আছে নাকি?' হেমনাথও হাসলেন।

বাকি দিনটা ত্রৈলোক্য সেনদের আলোচনাতেই কাটল।

ত্রৈলোক্য সেনের বাবা ছিলেন নামকরা কবিরাজ, লোকে বলত স্বয়ং ধন্বন্তরি। অম্বিকা কবিরাজ ছুঁলেই নাকি রোগ অর্ধেক সেরে যেত। কবিরাজি তাঁদের কৌলিক ব্যবসা, বংশ পরম্পরায় চলে আসছিল। বিপুল পসার ছিল অম্বিকা কবিরাজের। ঢাকা-বরিশাল-ময়মনসিং, দেশ-বিদেশ থেকে তাঁর ডাক আসত। প্রচুর পয়সাও করেছিলেন। লোকে সম্মান করত, ভক্তি করত।

জলবাঙলার দূর-দূরান্ত থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র শিখতে অম্বিকা সেনের কাছে

ছাত্ররা আসত। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও নিজের ছেলেকে কুলবিদ্যা ধরাতে পারেননি অম্বিকা সেন। বংশগত ব্যবসা না করুক, ছেলে অন্তত লেখাপড়া শিখে মানুষ হোক, এই আশায় ত্রৈলোক্যকে ইংরেজি স্কুলে পাঠিয়েছিলেন অম্বিকা কবিরাজ। তখন ইংরেজির খুব রবরবা, তার তোপের মুখে ভারতবর্ষের যত প্রাচীন বিদ্যা উড়ে যাচ্ছে। এক-আধ পাতা 'এ বি সি' শিখলেও করে খেতে পারবে।

কিন্তু দু-চার বছরের বেশি ইংরেজি স্কুলে যাতায়াত করেন নি ত্রৈলোক্য সেন। আসলে লেখাপড়ায় মনই ছিল না। যৌবনের শুরুতেই বেছে বেছে খারাপ সঙ্গী যোগাড় করেছিলেন। কুসঙ্গে পড়ে নেশা-টেশা ধরেছিলেন, মাঝে মাঝে বাইরে রাত কাটিয়ে আসতেন। অনেকবার যুগীপাড়া, তেলীপাড়া থেকে মার খেয়ে এসেছেন।

ছেলের চরিত্র শোধরাবার জন্য কম বয়সেই বিয়ে দিয়েছিলেন অম্বিকা সেন। সে আমলে মেয়েদের ছোটবেলাতেই বিয়ে হত। ঘরে যাতে ছেলের মন বসে, তাই খুঁজে খুঁজে যুবতী পুত্রবধূ এনেছিলেন। তাতে কাজও হয়েছিল। ত্রৈলোক্য সেন আর বাড়ি থেকে বেরুতেন না।

ছেলেকে তরুণী মেয়ে ঘুষ দিয়ে নিজের ইচ্ছামতন হয়তো চালাতে পারতেন কিন্তু তার আগেই অম্বিকা সেন মারা গেলেন। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর যা কিছু সঞ্চয় ভেঙে ভেঙে খেলেন ত্রৈলোক্য সেন। তারপর একে একে দেড়শ' কানি ধানজমি বেচলেন। পৈতৃক বাড়িখানা ছাড়া যখন আর কিছু নেই সেই সময় একদিন ছেলেপুলে এবং স্ত্রীকে নিয়ে সুদূর বর্মায় পাড়ি দিলেন ত্রৈলোক্য। এত রাজ্য থাকতে কেন যে মগের মল্লুকে গেলেন, তিনিই জানেন।

সে কি আজকের কথা! তিরিশ বছর আগে, তখনও প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয় নি, ত্রৈলোক্য সেন বর্মা গিয়েছিলেন। সেখান থেকে হেমনাথকে একখানা মোটে চিঠি লিখেছেন, তারপর এতকাল রাজদিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানী বোমার ভয়ে দেশে ফিরে আসতে হল তাঁকে।

ভাগ্যের সন্ধানে বর্মায় গিয়েছিলেন ত্রৈলোক্য সেন। ভাগ্য তাঁকে ছলনা করে নি, দশ হাতে ঢেলে দিয়েছিল। কাঠের ব্যবসা করে অজস্র পয়সা করেছিলেন, বাড়িঘর করেছিলেন। কিন্তু জীবন এমন ব্যঙ্গরসিক যে সব ফেলে চলে আসতে হয়েছে।

পরদিন বিকেলবেলা বিনুরা রামকেশবের বাড়ি গেল।

ত্রৈলোক্য সেনরা যে জাপানী বোমার ভয়ে চলে এসেছেন, সে খবর জানতে

কারো বুঝি বাকি নেই। সারা রাজদিয়া যেন রামকেশবের বাড়িতে ভেঙে পড়েছে। রাজদিয়া কেন, আশে-পাশের গ্রাম-গঞ্জ থেকেও অনেকে এসেছে। সবার চোখে-মুখে আগ্রহ, বিস্ময়, ভয় এবং আতঙ্ক।

বিনুরা যেতেই সাড়া পড়ে গেল। চারপাশের ভিড়টা বলাবলি করতে লাগল, 'হ্যামকত্তার বাড়িত্ থনে আইছে।'

'ভিতরে যাইতে দাও।'

খবর পেয়ে রামকেশব ছুটে এলেন। সম্ভ্রমের স্বরে বললেন, 'আসুন, আসুন বৌ-ঠাকরুন। কাল হেমদাদা এসেছিলেন, তাঁর মুখে নিশ্চয়ই ত্রৈলোক্যদাদার খবর পেয়েছেন—'

স্নেহলতা বললেন, 'হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো ছুটে এলাম।'

'তা জানি। নইলে—'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকলেন স্নেহলতা।

রামকেশব আবার বললেন, ত্রৈলোক্যদাদা এসেছেন বলে গরীবের বাড়ি আপনার পায়ের ধুলো পড়ল।'

চোখ কুঁচকে মাথা নেড়ে নেড়ে কপট রাগের গলায় স্নেহলতা বললেন, 'আমি বুঝি আসি না?'

'কই আর আসেন! কদ্দিন পর এলেন নিজেই হিসেব করে দেখুন।'

'হিসেব আমার করাই আছে।'

'তবে তো ভালই হয়েছে। কতকাল পর এলেন, 'চট করে বলে দিতে পারবেন।'

রণে ভঙ্গ দিলেন স্নেহলতা। হাসতে হাসতে বললেন, 'হিসেব-নিকেষ ভবিষ্যতের জন্য থাক। এখন সেনঠাকুরপোর কাছে নিয়ে চলুন।'

কৌতুকের গলায় রামকেশব বললেন, 'অমন মোহন হাসি হাসলে চলবে না। কোমর বেঁধে ঝগড়া করব, তবে ছাড়ব।'

'আচ্ছা আচ্ছা, আমি তার জন্যে তৈরী।'

'দেখা যাবে।'

রামকেশব তাঁদের নিয়ে দোতলার একটা ঘরে এলেন। এ ঘরে সব চাইতে বেশি ভিড়। একটি লম্বামতন সুপুরুষ বৃদ্ধকে ঘিরে রাজদিয়াবাসী অনেক লোকজন বসে আছে।

বৃদ্ধ কিছু বলছিলেন। আর চারধারের জনতা উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিল; শ্বাস টানতে পর্যন্ত তারা ভুলে গেছে।

ঢুকেই রামকেশব ডাকলেন, 'সেনদাদা—'

বোঝা গেল উনিই ত্রৈলোক্য সেন। রামকেশব বললেন, 'আপনার আরো শ্রোতা এসেছে।' বলে স্নেহলতাকে দেখিয়ে দিলেন, 'একে চিনতে পারছেন?'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন ত্রৈলোক্য। ধীরে ধীরে বললেন, 'চেনা-চেনা লাগছে কিন্তু ঠিক ধরতে পারছি না।'

রামকেশব বললেন, 'আমাদের বৌ-ঠাকরুন। হেমদাদার—'

চোখের তারায় আলো নেচে গেল ত্রৈলোক্যের, 'আর বলতে হবে না। ওঃ, কতকাল পর আপনাকে দেখলাম। চিনবার কি উপায় আছে, চুলটুল সব পাকিয়ে ফেলেছেন।'

'চুল পাকবে না? আয়নায় নিজের চেহারাখানা দেখেছেন? আপনিও কিন্তু আর নবীন যুবকটি নেই।'

'তা যা বলেছেন।' বলতে বলতে উঠে এসে স্নেহলতাকে প্রণাম করলেন ত্রৈলোক্য।

বিব্রতভাবে পিছোতে পিছোতে স্নেহলতা বললেন, 'থাক থাক, আবার প্রণাম কেন?'

ত্রৈলোক্য বললেন, 'আপনি আমাদের প্রণামের পাত্রী তাই—'

রামকেশব এরপর একে একে অবনীমোহন, সুরমা, সুধা-সুনীতিদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

পরিচয়-পর্ব চুকলে ত্রৈলোক্য বললেন, 'বেশ বেশ। বসুন বৌ-ঠাকরুন, বোসো বাবা অবনী, সুরমা তোমরাও বোসো।'

সবাই বসবার পর স্নেহলতা বললেন, 'আপনাকে তো দেখছি। আমার বোন, ছেলে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনীরা কোথায়?'

'বড় নাতি ছাড়া আর সবাই আমাদের বাড়ি দেখতে গেছে।'

'আপনাদের বাড়ি কি আর বাসের যোগ্য আছে?'

'কি করে থাকবে বলুন। কতকাল আমরা দেশছাড়া। বাড়িঘর এখন জঙ্গলে ভর্তি। সাপখোপের আস্তানা হয়ে উঠেছে। আজ থেকে কামলা লাগল। বাড়ি সারিয়ে-সুরিয়ে যেতে হবে তো। রামকেশবের ওপর কদ্দিন আর জুলুম করব।' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়তে গলা চড়িয়ে ডাকতে লাগলেন, 'শ্যামল কোথায় রে, শ্যামল—'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজায় যে ছেলেটি এসে দাঁড়াল তার বয়েস চোদ্দ পনেরর মতন, বিনুর সমবয়সী, কি বছর খানেকের বড়।

কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, লম্বাটে মুখ, ভাসা-ভাসা বড় চোখ, গায়ের রঙখানি উজ্জ্বল শ্যাম। সব মিলিয়ে চেহারাটি ভারি মিষ্টি, তাকালেই চোখ স্নিগ্ধ হয়ে যায়। ছেলেটির শ্যামল নাম সার্থক। নামের সঙ্গে চেহারার এমন মিল কদাচিৎ দেখা যায়।

ত্রৈলোক্য ডাকলেন, 'আয়—'

ছেলেটি ভেতরে এল। ত্রৈলোক্য বললেন, 'এই আমার বড় নাতি।'

স্নেহলতাদের দেখিয়ে শ্যামলকে বললেন, 'ইনি ঠাকুমা। উনি হলেন পিসিমা, উনি পিসেমশায়, ওরা দিদি, যাও প্রণাম কর।'

টিপ টিপ করে স্নেহলতা-সুরমা-অবনীমোহন-সুধা-সুনীতির পায়ে কপাল ঠেকিয়ে বিনুর পাশে গিয়ে বসল শ্যামল।

এদিকে ঘরের অন্য লোকজন যারা আগে থেকে বসে ছিল, অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। কিছু অবশ্য বলছে না। তবে মুখ-টুখ দেখে তা টের পাওয়া যায়।

স্নেহলতা লক্ষ্য করছিলেন। বললেন, 'আমরা আসবার আগে কী কথা হচ্ছিল সেন-ঠাকুরপো?'

'এই বর্মার কথা বলছিলাম সবাইকে।'

রামকেশব বিনুদের পৌঁছে দিয়ে চলে যান নি, একধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, 'সেনদাদা কাল থেকে কতবার যে বর্মায় কথা বলছে, লেখাজোখা নেই। সারাদিন লোক আসছে, সারাদিনই বকবকানি চলছে। বকতে বকতে মুখে ফেনা উঠবার যোগাড়।'

ত্রৈলোক্য হাসলেন, 'কি আর করা যাবে। লোকে এত আগ্রহ নিয়ে আসছে। না শুনিয়ে পারি কখনও?'

স্নেহলতা বললেন, 'আমরাও কিন্তু বর্মার গল্প শুনতে এসেছি।'

ত্রৈলোক্য বললেন, 'নিশ্চয়ই।' বলে ভিড়টার দিকে তাকালেন, 'বৌ-ঠাকরুন এসেছেন। তা হলে গোড়া থেকে আবার শুরু করা যাক।'

দেখা গেল, এ ব্যাপারে কারো আপত্তি নেই। সবাই মাথা নেড়ে বলল, 'হ-হ হেই ভাল। আরেকবার শুনা যাইব।'

ত্রৈলোক্য আরম্ভ করলেন। বেশ সুখেই ছিলেন তাঁরা বর্মায়। হঠাৎ কেন যে যুদ্ধ লাগল! আর লাগবিই যদি পৃথিবীতে ঢের জায়গা পড়ে ছিল। সেসব ছেড়ে জাপানী ব্যাটারা এসে বর্মার ওপর বোমা ফেলল। চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না, পলক পড়তে না পড়তেই বহুকাল ধরে তিল তিল সাধনায় গড়ে-ওঠা মনোরম জনপদ কিভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। বাড়িগুলো তাসের ঘরের

মতন কাত হয়ে পড়ল, রাস্তায় রাস্তায় প্রকাণ্ড গর্ত। আহত মানুষের চিৎকার, স্তূপাকার মানুষের মৃতদেহ, ঘন ঘন সাইরেনের শব্দ, ঝাঁক ঝাঁক জাপানী প্লেনের আক্রমণ – সব মিলিয়ে বর্মা যেন নরকের আরেক নাম।

ত্রৈলোক্য বলতে লাগলেন, 'বোমা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে রেঙ্গুন-টেঙ্গুন থেকে পালানোর হিড়িক লেগে গেল। কিন্তু যাবে কোথায়? বার্মীজরা গ্রামের দিকে পালাল। আর ইণ্ডিয়ানরা ভারতবর্ষের দিকে পা বাড়াল। কিন্তু আসতে চাইলেই তো আসা যায় না। দশ দিন বারো দিন পর একটা করে কলকাতার জাহাজ। দামের তিন গুণ দিয়েও তার টিকিট পাওয় যায় না। এদিকে রেঙ্গুনে বসে থাকা মানে নির্ঘাত মৃত্যু। অগত্যা বহু মানুষ হাঁটা পথ ধরল, আমরাও পা দু'খানার ওপর ভরসা করে রওনা হলাম।'

স্নেহলতা বললেন 'তারপর?'

'সে যে কী কষ্ট, বলে বোঝাতে পারব না বৌ-ঠাকরুন। পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে দিনের পর দিন হাঁটছি তো হাঁটছিই। হাঁটতে হাঁটতে পা ফুলে গেল। কত লোক যে আসতে আসতে রাস্তায় পড়ে মরেছে, তার হিসেব নেই। সে যাই হোক, খাদ্য নেই, জল নেই। খিদের জ্বালায় পেট পুড়ে গেছে, তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেছে। কোথাও ঝর্ণা দেখে হয়তো ছুটে গেছি। কাছে যেতেই চোখে পড়েছে, দা হাতে মগেরা দাঁড়িয়ে আছে। দশ টাকা করে দিলে এক বালতি জল পাওয়া যাবে। ভয়ে ভয়ে ফিরে এসেছি। কোথাও বনের ভেতর কলা ফলে আছে। সেখানেও দা হাত মগ। হাঁটতে হাঁটতে বাচ্চাগুলোর জ্বর হয়ে গেল। তাদের কাঁধে তুলে চলতে লাগলাম।'

স্নেহলতা বললেন, 'আহা রে—'

বর্মা থেকে রাজদিয়া পর্যন্ত দীর্ঘ পথের ভয়াবহ নিদারুণ বর্ণনা দিয়ে যেতে লাগলেন ত্রৈলোক্য, 'রাস্তায় কতবার যে ডাকাতের হাতে পড়েছি তার হিসেব নেই। শুধু আমরা তো নই, বর্মা থেকে আরও অনেক মানুষ আসছিল। ডাকাতরা যদি টের পেয়েছে, কারো সঙ্গে টাকা-পয়সা সোনাদানা আছে, গলার কাছে রামদা ধরে সব কেড়ে কুড়ে নিয়েছে। দিতে না চাইলে স্রেফ কেটে ফেলেছে। এ ভাবে যে কত লোক প্রাণ দিয়েছে তার হিসেব নেই বৌ-ঠাকরুন।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনে যাচ্ছিল বিনু। হঠাৎ পাশ থেকে কে ডাকল, 'এই—'

চমকে সেদিকে তাকাল বিনু। দেখল সেই ছেলেটা যার নাম শ্যামল। চোখাচোখি হতেই শ্যামল হাসল। বলল, 'তোমার নাম কি ভাই?'

বিনু স্কুলের ভালো নামটাই বলল, 'বিনয়কুমার বসু—'

শ্যামল বেশ সহজ সাবলীল ছেলে। লজ্জা, সঙ্কোচ-টঙ্কোচ তার নেই বললেই হয়। হাসতে হাসতে বলল, 'ও তো ভালো নাম, মস্ত বড়। ডাক নাম নেই তোমার?'

'আছে। বিনু—'

'সুন্দর নাম তো।'

বিনু বলল, 'তোমার নামটাও সুন্দর।'

শ্যামল বলল, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'সবার সঙ্গে দাদু আলাপ করিয়ে দিয়েছে, শুধু তোমার সঙ্গেই বাদ।'

কথাটা ঠিক। বিনু বলল, 'হয়তো খেয়াল করেননি।'

শ্যামল বলল, 'সে যাক গে, তোমার সঙ্গে আমি কিন্তু সেধে আলাপ করলাম। রাগ করলে না তো?'

'বা রে, রাগ করব কেন?'

'তুমি কোন্ ক্লাসে পড় ভাই?'

'এবার নাইনে উঠেছি।'

শ্যামল উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'রেঙ্গুনে আমি ক্লাস এইটে পড়তাম। এ বছর নাইনে উঠবার কথা ছিল। 'ভালই হল, এখানে নাইনে ভর্তি হব, তোমার সঙ্গে পড়ব।' একটু থেমে বিমর্ষ সুরে আবার বলল, 'কিন্তু বিনু—'

'কী?'

'আমাকে কি এখানে ক্লাস নাইনে নেবে?'

'কেন নেবে না?'

'আমার যে ভাই ওখানে এ্যানুয়াল পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট টার্টিফিকেট আনতে পারিনি। আনব কি করে বল, জাপানীদের বোমা পড়ল। সব ফেলে টেলে পালিয়ে আসতে হল—'

বিনু বলল, 'এখানে ভর্তি হতে হলে একটা এ্যাডমিশন টেস্ট দিতে হবে। আমিও কলকাতা থেকে এসে এ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম।'

চিন্তিত মুখে শ্যামল শুধলো, 'খুব কঠিন পরীক্ষা নেয়?'

নিজের ফাঁড়া তো কেটে গেছে। মুরুব্বিয়ানা চালে বিনু বলল, 'তেমন কঠিন আর কি—'

শ্যামল বলল, 'বড্ড ভয় করছে।'

বিনু শ্যামলের সঙ্গে কথা বলছিল ঠিকই। কিন্তু তার কান দুটো ছিল ত্রৈলোক্য সেনদের দিকে। জাপানী বোমার ভয়ে দুর্গম পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে পালিয়ে আসার দীর্ঘ রোমাঞ্চময় বিবরণ শোনার মতন উন্মাদনাকর আর কী থাকতে পারে? প্রবল আকর্ষণে ত্রৈলোক্য বিনুকে তাঁর দিকে টানছিলেন।

বিনু যে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে, শ্যামল তা লক্ষ্য করেছিল। বলল, 'দাদুর কথা বুঝি ভাল লাগছে?'

বিনু মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'দাদু আর কতটুকু বলছে। আমি তোমাকে পরে সব বলব। জাপানীরা প্রথম দিন এসে কেমন করে বোমা ফেলল, ইংরেজ সৈন্যরা তখন কী করছিল, আমরা কী করছিলাম, রেঙ্গুনের লোকেরা কী করছিল, আমরা কেমন করে এলাম—সব বলব। কত শুনতে পার তখন দেখা যাবে। শোনাতে শোনাতে কান একেবারে ঝালাপালা করে ছাড়ব। এখন আমার সঙ্গে গল্প কর দেখি।'

কি আর করা, ত্রৈলোক্য সেনের গল্পের আশা ছাড়তে হল বিনুকে। চোখ কান মেলে শ্যামলের দিকে তাকাল সে।

শ্যামল বলল, 'তখন কলকাতার কথা কী বলছিলে?'

বিনু বলল, 'আমরা কলকাতায় থাকতাম।'

'কবে এসেছ?'

'বছর দেড়েকের কাছাকাছি।'

'রাজদিয়াতে তোমরা কোথায় থাকো?'

কোথায় থাকে, বিনু বলল।

'তোমাদের বাড়ি একদিন যাব।'

'নিশ্চয়ই যাবে।'

'তোমাকেও কিন্তু আসতে হবে। তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে।'

'আসব। তোমাকেও আমার ভাল লেগেছে।'

দুজনের মধ্যে টুকরো টুকরো, এলোমেলো, অসংলগ্ন গল্প চলতে লাগল। কথা বলতে বলতে বিনুর হঠাৎ মনে পড়ল, ঝুমার সঙ্গে এখানেই তার আলাপ হয়েছিল। সেই দুঃসাহসী, ভয়লেশহীন মেয়েটা। কতকাল তার সঙ্গে দেখা হয় না। ঝুমার কথা ভাবতে গিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল বিনুর।

ওধারে এক সময় ত্রৈলোক্য সেনের বিচিত্র ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কাহিনী শেষ হল।

স্নেহলতারা ছাড়া একে একে অন্য শ্রোতার দল চলে যেতে লাগল।

সবাই চলে গেলে ঘর যখন ফাঁকা, স্নেহলতা শুধোলেন, 'একটা কথা সেন-ঠাকুরপো—'

ত্রৈলোক্য সেন উৎসুক চোখে তাকালেন, 'কী ?'

'মগের মুল্লুকে সবই তো ফেলে-টেলে এসেছেন। কিছুই আনতে পারেন নি।'

'হ্যাঁ।'

'টাকা-পয়সার দরকার থাকলে কিন্তু বলবেন। একটুও লজ্জা করবেন না।'

'আপনাদের কাছে লজ্জার কিছু আছে নাকি। তবে—'

'কী ?'

'টাকা-পয়সার এখন দরকার নেই বৌ-ঠাকরুন।'

কিছুই আনতে পারেন নি অথচ পয়সাকড়ির প্রয়োজন নেই—ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিলেন না স্নেহলতা। বিমূঢ়ের মতন তিনি তাকিয়ে থাকলেন।

স্নেহলতার মনোভাব খানিক যেন অনুমান করতে পারলেন ত্রৈলোক্য। হাসতে হাসতে বললেন, 'তা হলে আপনাকে একটা কথা বলি—'

'কী ?'

'হাজার বিশেক টাকা আমি আনতে পেরেছি।'

'কিভাবে ?' বিস্ময়ে আর উত্তেজনায় গলা কাঁপতে লাগল স্নেহলতার, 'ডাকাতরা ধরে নি ?'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে ত্রৈলোক্য সেন বললেন, 'সে একটা চালাকি করেছিলাম বৌ-ঠাকরুন। পা যেন ভেঙে গেছে, তা দেখাবার জন্যে হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ব্যাণ্ডেজ করে নিয়েছিলাম। ব্যাণ্ডেজের ভাঁজে ভাঁজে একশ' টাকার নোট রেখেছি। লোকের চোখে ধুলো ছিটোবার জন্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতাম। কি রকম ফন্দি খাটিয়েছিলাম বলুন তো ?' চোখেমুখে গর্বের ভাব ফুটিয়ে ত্রৈলোক্য তাকালেন।

গালে হাত দিয়ে মাথাটি হেলিয়ে দিলেন স্নেহলতা, 'বাব্বা, আপনার মাথায় এতও এসেছিল ?'

ত্রৈলোক্য হাসতে লাগলেন, 'হাজার হোক ওরা মগ ডাকাত। আর আমি—'

'আপনি কী ?'

'ঢাকাইয়া পোলা।' শব্দ দুটো পূর্ব বাঙলার টান দিয়ে উচ্চারণ করলেন ত্রৈলোক্য।

স্নেহলতা এবার হেসে ফেললেন।

কথায় কথায় বেলা ফুরিয়ে এল। শীতের অবেলায় রোদের রঙ যখন বাসি হলুদের মতন সেই সময় ত্রৈলোক্য সেনের স্ত্রী, ছেলে, ছেলের বৌ, অন্য নাতি-নাতনীরা নিজেদের বাড়ি দেখে ফিরে এল।

অগত্যা আরো কিছুক্ষণ বসে যেতে হল বিনুদের। স্নেহলতা ত্রৈলোক্য সেনের স্ত্রী, ছেলের বৌদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেললেন।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নেমে এল। নদীর দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস ছুটে আসতে লাগল। হিমে-কুয়াশায় চারদিক ঝাপসা, অস্পষ্ট। কাছাকাছি ঝোপ-ঝাড়গুলোর ভেতর থেকে শিয়ালের ডাক ভেসে আসছে। আলোর ছুঁচের মতন অন্ধকারকে বিঁধে বিঁধে জোনাকিরা একবার জ্বলছে, একবার নিভছে। সারা রাতের জন্য এই জ্বলা এবং নেভার খেলা চলবে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে চঞ্চল হলেন স্নেহলতা, 'এবার আমরা যাই বোন।'

ত্রৈলোক্য সেনের স্ত্রী বললেন, 'এখনই যাবেন দিদি?'

'হ্যাঁ। রাতের রান্না পড়ে আছে; গিয়ে বসাতে হবে। তোমরা যেও—'

'বুঝতেই তো পারছেন দিদি, এখন যাওয়ার খুব অসুবিধে। নিজের বাড়ি-ঘরে থিতি হয়ে বসি; তারপর যাব।'

'বাড়িতে যেতে কদ্দিন লাগবে?'

'আজই সবে কামলা লাগল। সাত-আটদিনের আগে সারাই-টারাই হবে বলে তো মনে হয় না।'

'বাড়ি গিয়ে বসবার পরই তা হলে যেও।'

'যাব। আপনারাও আসবেন।'

'আসব।' বলতে বলতে উঠে পড়লেন স্নেহলতা।

॥ তেইশ ॥

দিনকয়েক পর্ শ্যামল বিনুদের ক্লাসে ভর্তি হয়ে গেল। এখন রোজই তার সঙ্গে দেখা হয়। দিনের অনেকখানি সময় এক সঙ্গে কাটে দুজনের।

কলকাতা থেকে আসার পর এখানে বিশেষ বন্ধু-টন্ধু পায় নি বিনু। ক্লাসের ছেলেরা অবশ্য ছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গে তেমন মিলত না।

বন্ধুর জন্য বিনুর প্রাণের যে জায়গাটা ফাঁকা পড়ে ছিল, শ্যামল এসে তা ভরিয়ে তুলল।

টিফিনের সময় কিংবা স্কুল ছুটির পর বিনুরা নদীর পারে গিয়ে বসে; কখনও হাঁটতে হাঁটতে বরফকল, স্টিমারঘাটার দিকে চলে যায়।

এর মধ্যে বর্মার অনেক গল্প করেছে শ্যামল। রেঙ্গুন শহর, শোয়েডাগন প্যাগোডা, রয়াল লেক, বর্মীদের জল-উৎসব, সাগরের জলে ভরপুর নীলকণ্ঠ ইরাবতী—এমনি কত কথাই না বলেছে।

একদিন গল্প করতে করতে শ্যামল বলল, 'জানো বিনু, দুজনের জন্যে আমার ভারি কষ্ট হয়।'

'তারা কে?'

'সুব্রত আর মা-পোয়ে। সুব্রত ছিল আমার প্রাণের বন্ধু; রেঙ্গুনে আমরা এক রাস্তাতেই থাকতাম। বোমা পড়বার পর সবাই যখন পালাচ্ছে সুব্রতরা জাহাজের টিকিট পেয়ে গেল। ওরা কলকাতায় এসেছিল; তারপর কোথায় গেছে কে জানে। জীবনে আর হয়তো কোনদিন ওর সঙ্গে দেখা হবে না।' বলতে বলতে কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে ওঠে শ্যামলের; চোখমুখ বিষণ্ণ দেখায়।

বিনু শুধোয়, 'মা-পোয়ে কে?'

'একটা বার্মীজ মেয়ে। ওরা আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত। ওর বাবা ছিলেন আমার বাবার বন্ধু। আমাদের বাড়ি ওরা সবসময় আসত; আমরাও ওদের বাড়ি যেতাম। বোমা পড়বার পর মা-পোয়েরা মান্দালয়ের দিকে চলে গেল; আমরা এলাম এই রাজদিয়াতে।'

বিনু এবার কিছু বলল না।

একটু চুপ করে থেকে শ্যামল বলল, 'মা-পোয়ের মা আর বাবা আমাকে খুব ভালবাসতেন। ওঁদের খুব ইচ্ছে ছিল, বড় হলে মা-পোয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন। আমার মা-বাবারও ইচ্ছে ছিল।'

একটা কথা মনে হতে বিনু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'মা-পোয়েরা বার্মীজ না?'

'হ্যাঁ।'

'বার্মীজদের সঙ্গে বাঙালীর বিয়ে হয়?'

'অনেক হয়েছে। বর্মায় গিয়ে দেখে এস না—'

এরপর আর কেউ কিছু বলল না। শ্যামল উদাস চোখে অনেক দূরে নদীর ওপারের ধু-ধু বনানীরেখার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে।

একদিন স্কুল ছুটির পর বিনুরা অলস পায়ে নদীর পারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ; হঠাৎ তাদের চোখে পড়ল স্টিমারঘাটায় নতুন একটা স্টিমার এসে লেগেছে। গোয়ালন্দ থেকে রোজ সকালে যে শাদা ধবধবে স্টিমারটা যাত্রী নিয়ে আসে এটা সেটা নয়। এর রঙ ধূসর ; আকারেও অনেক বড়।

বিনুরা দেখল, অনেক লোক স্টিমারঘাটার দিকে ছুটছে। দেখাদেখি ওরাও ছুটল এবং মুহূর্তে সেখানে এসেও গেল।

স্টিমারঘাটার জেটিটাকে ঘিরে মেলা বসে গেছে যেন। রাজদিয়ার যত দোকানদার-আড়তদার-মাছ ব্যাপারী, সবাই ছুটে এসেছে।

স্টিমার, এমন কি জেটির ওপরেও কারোকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। অগণিত পুলিস চারদিক ঘিরে রেখেছে। এগুতে চাইলেই লাঠি তুলে তাড়া করে আসছে।

ভিড়ের ফাঁক দিয়ে একসময় বিনুরা দেখে ফেলল, স্টিমার থেকে অসংখ্য সৈন্য নামছে।

চারদিকের ভিড়টা চাপা ভীতু স্বরে বলাবলি করতে লাগল, 'সৈন্য আইছে। রাইজদিয়াতেও তাইলে যুজ্য আইসা গেল !'

'হায় আল্লা, কী হইব !'

'হা ভগবান, কপালে কী লেখছিলা !'

॥ চব্বিশ ॥

কয়েকদিনের ভেতরেই দেখা গেল সেটেলমেণ্ট অফিসের পেছন দিকে যে বিশাল ফাঁকা মাঠখানা পড়ে ছিল, তারকাঁটা দিয়ে সেটা ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং তার মধ্যে সৈন্যদের জন্য সারি সারি অসংখ্য তাঁবু উঠেছে।

শুধু তাই নয়, বরফকল এবং মাছের আড়তগুলোর ওধারে একেবারে নদীর ধার ঘেঁষে মাইলের পর মাইল নীচু জমি পড়ে ছিল। বর্ষায় জায়গাটা জলে ডুবে যায় ; অন্য সময় কাদা থক থক করে। তার ওপর জলসেঁচি আর বিশল্যকরণীর বন উদ্দাম হয়ে বাড়তে থাকে। কাদাখোঁচা আর পাতিবকের দল নরম মাটিতে হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে জলসেঁচির বনে সারাদিন কী যেন খুঁজে বেড়ায়।

মিলিটারির নজর পড়ল জায়গাটার ওপর। কোত্থেকে ঠিকাদাররা এসে গেল। চারধারের গ্রাম-গঞ্জ থেকে, নদীর ধু-ধু চর থেকে মোটা মজুরির লোভ দেখিয়ে হাজার দুই তিন লোক জুটিয়ে ফেলল তারা। কানের কাছে কাঁচা

পয়সার ঝনঝনানি চলতে থাকলে কতক্ষণ কে আর ঘরে বসে থাকতে পারে।

মজুরদের প্রায় সকলেই ভূমিহীন কৃষাণ। অন্যের জমিতে ধান কেটে, হাল দিয়ে এবং আরো হাজারটা উঞ্ছবৃত্তিতে তাদের দিন কাটত। বছরের বেশির ভাগ সময়ই তাদের জীবনে দুর্ভিক্ষ লেগে আছে।

ঠিকাদাররা প্রথমে তাদের মাটি ভরাটের কাজে লাগাল। নীচু জমিটাকে রাস্তার সমান উঁচু করতে হবে।

সারাদিন কাজ তো চলেই, রাত্তিরেও নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। আলো জ্বালিয়ে মাটি ফেলা হচ্ছে তো হচ্ছেই।

স্কুলে যাবার পথে সময় হয় না। তবে টিফিনে কি ছুটির পর শ্যামলকে সঙ্গে নিয়ে বিনু ওখানে চলে যায়। দু-তিন মাইল জায়গা জুড়ে হাজার কয়েক লোক ঝোড়া বোঝাই করে এনে মাটি ফেলছে। মজুরদের ব্যস্ততা, ঠিকাদারের লোক-দের ধমক, খিস্তি, চিৎকার, হৈ হৈ—সব মিলিয়ে বিরাট ব্যাপার।

বিনু বলে, 'ওখানে কী হবে বলতে পার?'

শ্যামল বলে, 'কি জানি—'

ঠিকাদারের লোকেরা, যারা মজুর খাটায়, জিজ্ঞেস করলে বলে, 'ছাখ না, কী হয়।' বলেই ব্যস্তভাবে চলে যায়।

একদিন দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সেই লোকগুলোকে দেখতে পেল বিনু—তাহের, বছির, বুড়ো খলিল। ওরা সবাই চরের মুসলমান। প্রতি বছর ধানকাটার সময় চুক্তিতে কাজ করতে আসে। এবারও অঘ্রান মাসে এসে তারা বিনুদের ধান কেটে গেছে।

বছরে মাসদুয়েকের মতন বছিররা রাজদিয়ায় এসে থাকে। আসে অঘ্রানের মাঝামাঝি; মাঘ মাস পড়তে না পড়তে চলে যায়। কোন কোন বার অবশ্য দেরিও হয়; যেতে যেতে মাঘের শেষ কিংবা ফাল্গুনের শুরু।

ধানকাটার মরসুম বাদ দিলে বছরের অন্য সময় বছিরদের রাজদিয়ায় দেখা যায় না। এবারটা কিন্তু ব্যতিক্রম। এই তো সেদিন ধান কেটে গেল ওরা; এর মধ্যেই আবার মাটি ভরাটের কাজে ফিরে এসেছে।

বিনুকে এগিয়ে গিয়ে কথা বলতে হল না। মাটি ফেলতে ফেলতে বছিররাই তাকে দেখে ফেলল। দেখামাত্র বছির আর তাহের লম্বা লম্বা পা ফেলে কাছে এল। খুশী গলায় বলল, 'বাবুগো পোলা না?'

বিনু মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

বিন্নুর হাতে বই খাতা-টাতা ছিল। বছির বলল, 'ইচ্‌কুল (স্কুল) থনে আইলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ। একটু আগে ছুটি হল।'

'হ্যামকত্তায় ভাল আছে?'

'হ্যাঁ।'

'জামাইকত্তায়?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়ির আর সগলে?'

'সবাই ভাল। তোমরা?'

'খোদা যেমুন রাখছে।'

একটু নীরবতা। তারপর বিন্নু শুধলো, 'এখানে কদ্দিন কাজ করছ?'

বছির হিসেব করে বলল, 'দশ দিন।' একটু চুপ করে থেকে উজ্জ্বল উৎফুল্ল মুখে আবার বলল, 'বাহারের কাম ছুটোবাবু।'

বিন্নু উৎসুক স্বরে জানতে চাইল, 'কিরকম?'

'রোজ নয় সিকা কইরা মজুরি। তা হইলে হিসাব কইরা ছাখেন দশ দিনে কত ট্যাকা পাইছি। বাপের জন্মে এত ট্যাকার মুখ আর দেখি নাই।' বলে তাহেরের দিকে তাকাল বছির, 'না কি কও তাহের ভাই?'

দেখা গেল তাহেরের এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই। জোরে জোরে মাথা নেড়ে সে বলল, 'সত্য কথা।'

বছির বলতে বাগল, 'হেই ইনামগুঞ্জ, নিশিন্দার চর, চরবেউলা, গিরিগুঞ্জ, কেতুগুঞ্জ, ডাকাইতা পাড়া—যেইখানে যত কিষাণ আছে সগলে মাটি কাটার কামে আইছে। আইব না ক্যান? এত মজুরি, এত ট্যাকা পাইব কই? শুনতে আছি—'

'কী?'

'সুজনগুঞ্জেও নিহি মাটি কাটার কাম শুরু হইব।'

'কে বললে?'

'পরস্পর কানে আইল।'

'ওখানে মাটিকাটা হবে কেন?'

'সৈন্যগো পেয়োজন (প্রয়োজন)।'

'ওখানেও সৈন্য যাবে!' বিন্নু অবাক।

বছির বলল, 'হেই তো শুনতে আছি।'

বিনু চুপ করে থাকল।

বছির উৎসাহের গলায় বলতে লাগল, 'এইরকম কাম যদি মিলে (মেলে), কিষাণরা আর চাষবাস করব না। জমিন ফালাইয়া সগলে যুজ্যের কামে দৌড়াইব।'

তাহের বলল ভাগ্যে যুজ্যু বাধছিল। দুইখান পহা লাড়াচাড়া করতে পারি; পোলামাইয়ারে দুই বেলা প্যাটভরা ভাত দিতে পারি। হায় রে আল্লা, জন্ম ইস্তক কি দিনই না গেছে!'

বছির বলল মাইনষে কয়, যুজ্যু নিহি মোন্দ আমরা কই যুজ্যু ভাল। যুজ্যুর কালানে (কল্যাণে) বউ-পোলার মুখে হাসি ফুটছে।'

আরো কিছুক্ষণ হয়তো গল্প-টল্প করত বছিররা; তা আর হল না। ঠিকাদারের একটা লোক শকুনের চোখ নিয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে প্রায় তাড়া করে এল। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে লোকটা অশ্লীল খিস্তি দিল প্রথমে। তারপর বলল 'সুমুন্দির পুত, গপ (গল্প) মারনের জায়গা পাও না! দুই ঝোড়া মাটি ফেলাইয়া নয় সিকা পহা গইনা লইতে বড় সুখ! আইজ শালা তোগো মজুরি যদি না কাটি তো নাম ফিরাইয়া রাখিস।'

বছির আর তাহেরের মুখ ম্লান হয়ে গেল। বিষণ্ণ সুরে তারা বলল, 'যাই ছুটোবাবু, অহন আর খাড়নের সময় নাই।'

বিনু বলল, 'একদিন এসো আমাদের বাড়ি।'

'যামু।'

দেখতে দেখতে নদীপারের নীচু জমি উঁচু হল। তার ওপর সারি সারি সুদৃশ্য ব্যারাক উঠল মিলিটারিদের জন্য।

শুধু কি তাই, রাজদিয়ায় আগে বিজলী আলো ছিল না। মিলিটারির কল্যাণে, যুদ্ধের কল্যাণে রাতারাতি তা এসে গেল। অবশ্য বিজলী আলোটা সাধারণ মানুষের জন্য না, শুধু মিলিটারিদের জন্য। রাজদিয়ার একমাত্র বড় রাস্তাটাকে দ্বিগুণ চওড়া করে পীচ-টীচ ঢেলে চেহারা একেবারে বদলে দেওয়া হল। নতুন নতুন আরো অনেকগুলো কনক্রীটের রাস্তাও তৈরী হল। সব চাইতে মজার ব্যাপার যেটা হল তা এইরকম। এখানকার যত তালগাছ, তাদের মাথা কেটে আলকাতরা দিয়ে কালো রঙ করে দেওয়া হল; সেগুলোকে এখন এ্যান্টি এয়ারক্র্যাফ্‌ট্‌ কামানের মতন দেখায়। অনেকগুলো নকল কামানকে নদীর ধারে ধারে আবার হেলিয়েও রাখা হয়েছে।

এখন সারাদিন সারারাত রাজদিয়া জুড়ে কাজ চলছে। শত শত ঠিকাদার, হাজার হাজার মজুর শুধু খেটেই যাচ্ছে। রোড রোলার এবং নানারকম যন্ত্রের শব্দে জায়গাটা আজকাল সরগরম।

রাজদিয়ার গায়ে যেন ময়দানবের ছোঁয়া লেগেছে। এতকাল জায়গাটা যেন ঘুমিয়ে ছিল। শতাব্দীর অতল নিদ্রা থেকে সে আচমকা জেগে উঠেছে।

ক'দিন আগেও এখানকার জীবন ছিল স্তিমিত, বেগবর্ণহীন, নিস্তরঙ্গ। তিরতিরে স্রোতের মতন যুগ-যুগান্তের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে, চুপিসাড়ে অতি সঙ্গোপনে সে বয়ে যেত। রাজদিয়ার সেই শান্ত অচঞ্চল জীবনযাত্রায় হঠাৎ যেন জলোচ্ছ্বাসের বেগ এসেছে।

আগে আগে সারাদিনে গোয়ালন্দের একখানা স্টিমার আসত। আজকাল যাত্রীবাহী স্টিমার তো আসেই। তা ছাড়া সপ্তাহে একবার করে মিলিটারিদের সেই স্টিমারটাও সৈন্যসামন্ত, লরী ট্রাক-জীপ এবং অসংখ্য সরঞ্জাম নিয়ে আসছে। মিলিটারিদের স্টিমারটা এলে জেটিঘাটা থেকে নতুন ব্যারাকগুলো পর্যন্ত রাস্তাটা দিয়ে লোক চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। কাছাকাছি কারোকে এগোতে পর্যন্ত দেওয়া হয় না। সাধারণ পুলিস-টুলিস না, কয়েক শ' মিলিটারি পুলিস জায়গাটাকে ঘিরে ফেলে। তারপর কি সব জিনিসপত্র ঢাকাঢুকি দিয়ে সবার অলক্ষ্যে ব্যারাকের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।

আড়ালে রাজদিয়ার বাসিন্দারা ফিসফিস করে, 'শালারা কী আনছে কও দেখি ?'

'কেমনে কই ?'

'আমার মনে হয়, কামান আর গোলাগুলি।'

'হইতে পারে। ঢাইকা-ঢুইকা আনে ক্যান ?'

'কি জানি। যুজ্যে বুঝি গুপন (গোপন) রাখা নিয়ম।'

বিনু লক্ষ্য করেছে, প্রথম দিন স্টিমারটা এসেছিল দুপুরবেলায়। আজকাল বেশির ভাগ আসে রাত্রের দিকে। রাত্রিবেলা কখন আসে টের পাওয়া যায় না। সমস্ত রাত ওখানে থেকে কী করে, কে বলবে। তবে সকাল হলেই রাজদিয়া-বাসীরা দেখতে পায় স্টিমারটা জেটিঘাট ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

আগে ফীটন আর কদাচিৎ দু-একখানা সাইকেল ছাড়া এখানে অন্য কোন-রকম গাড়িটাড়ি ছিল না। ইদানীং সমস্ত দিনরাত রাজদিয়ার হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়ে মিলিটারিদের ট্রাক-জীপ ছুটতে থাকে। শোনা যাচ্ছে এখানে নাকি একটা এরোড্রোমও তৈরী হবে।

মিলিটারি ব্যারাক, রাস্তাঘাট, বিজলী আলো—এত কিছু হয়েছে রাজদিয়াতে তবু যেন কাজের শেষ নেই। ব্যারাকের উল্টোদিকের ফাঁকা জায়গাগুলোতে ক্যাঁচা বাঁশের চালা তুলে ঠিকাদার আর মজুরদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

আগে রাজদিয়াতে চায়ের দোকান একটাও ছিল না। দোকান দূরের কথা, চা খাওয়ার রেওয়াজই ছিল না। রাজদিয়ার মোট সাতটি বাড়িতে চা ঢুকত। আজকাল মজুরদের অস্থায়ী আস্তানাগুলোর গায়ে কম করে কুড়িটা দোকান বসেছে।

॥ পঁচিশ ॥

এক ছুটির দিনের সকালে পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে হেমনাথরা আসর জমিয়েছেন। স্কুল-কলেজ বন্ধ। রান্নাবান্নার তাড়া ছিল না। সকাল থেকেই দিনটার গায়ে যেন আলস্য মাখানো। স্নেহলতারা পর্যন্ত রান্নাঘর ছেড়ে গল্প করতে বসেছেন।

কথা হচ্ছিল এই রাজদিয়া নিয়ে। খুব চিন্তিত মুখে হেমনাথ বললেন, 'কী জায়গা ছিল আর এখন কী দাঁড়িয়েছে!'

অবনীমোহন বললেন, 'আমরা এসেও যা দেখেছি তা আর নেই। রাতারাতি সব বদলে গেল।'

'তা বদলাক। রাস্তাঘাট হয়েছে। ইলেকট্রিক আলো এসেছে। এখন অবশ্য মিলিটারির জন্য। দু'দিন পর আমাদের ঘরেও আসবে। কিন্তু—'

'কী?'

'একটা বড় সাঙ্ঘাতিক খবর শুনলাম অবনীমোহন—'

'কী খবর মামাবাবু?'

'মিলিটারিরা মদটদ খেয়ে রামকেশবদের পাড়ায় খুব হামলা করছে। সেদিন নাকি অতুল নাহাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল।'

'আমিও শুনেছি।'

'সন্ধ্যেবেলা মেয়েদের নিয়ে রাস্তায় বেরুনো এখন নিরাপদ না। পরশুদিন রাত্তিরে দুটো মাতাল টমি রুদ্রবাড়ির আরতিকে তাড়া করেছিল। ভাগ্য ভাল, সেইসময় মিলিটারি পুলিসের একটা জীপ এসে পড়ে। তাইতে মেয়েটি বেঁচে যায়। বেশ শান্তিতে ছিলাম আমরা; কী উৎপাত শুরু হল বল দেখি—'

সুরমা এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন। শিউরে উঠে বললেন, 'সুধা-সুনীতির

কলেজও তো ওদিকে। আমি ওদের আর পাঠাব না। কোনদিন কী বিপদ হয়ে যাবে—'

হেমনাথ কী বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় বাইরের উঠোন থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'হ্যামকত্তা—'

হেমনাথ সেদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন' 'কে রে ?'

'আমি নিত্য—নিত্য দাস—'

'আয়—আয়—'

একটু পর নিত্য দাস পুবের ঘরের দাওয়ায় এসে উঠল। সুজনগঞ্জের হাটে আগেই তাকে দেখেছে বিনু। গলায় তিনকন্টি তুলসীর মালা ; মুখে বসন্তর কালো কালো দাগ। পরনে খাটো ধুতি আর ফতুয়া। দেখতে দেখতে এ চেহারা মুখস্থ হয়ে গেছে বিনুর।

নিত্য দাস দাওয়ার এক ধারে মাটির ওপরেই বসে পড়ল।

হেমনাথ বললেন, 'তোদের খবর-টবর কী ?'

নিত্য দাস বলল, 'আপনেগো আশীর্ব্বাদে ভালই।'

'বাড়ির সবাই কেমন আছে ?'

'ভাল।'

একটু ভেবে হেমনাথ এবার বললেন, 'তারপর এত সকালবেলা কী মনে করে রে ?'

নিত্য দাস বলল, 'একখান কামে আইতে হইল। ভাবলাম, রাইজদিয়ায় যহন আইলাম, হ্যামকত্তা আর বৌঠাইনের চরণ দশ্শন কইরা যাই।'

হেমনাথ হাসতে হাসতে বললেন, 'তুই কাজের মানুষ ; শুধু শুধু যে আসিস নি, বুঝতে পেরেছি। তা কাজটা কী ?'

'এছ-ডি-ও সায়েবের বাংলায় (বাংলো) একবার যাইতে হইব।'

'কেন রে ?'

'ক্রাচিন (কেরোসিন), চিনি আর কাপড় কনটোল হইয়া যাইতে আছে।'

হেমনাথ বিস্ময়ের গলায় বললেন, 'কনট্রোল !'

'হ—' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল নিত্য দাস, 'তিনটা জিনিস বাইরে আর মিলব না। গরমেণ্ট (গভর্ণমেণ্ট) লাইছেন (লাইসেন্স) দিয়া কনটোলের দোকান খুলব। গরমেণ্ট মাথাপিছু একটা হিসাব ঠিক কইরা দিব ; তার বেশি চিনি-টিনি পাওয়া যাইব না। এছ-ডি-ও সায়েবেরে ত্যাল দিয়া দেখি একখান লাইছেন পাই কিনা—'

'কনট্রোল যে হবে এ খবর তুই কোথায় পেলি ?'

'কয়দিন আগে ঢাকায় গেছিলাম, হেইখানেই শুইনা আইছি।'

'কবে নাগাদ কনট্রোল হবে, কিছু জানিস ?'

'দিন তারিখ জানি না, তবে শিগ্‌গিরই হইব।'

হেমনাথ এবার আর কিছু বললেন না। তাঁর কপালে দুশ্চিন্তার রেখাগুলি গভীরভাবে ফুটে উঠতে লাগল।

নিত্য দাস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চাপা গলায় বলল, 'এছ-ডি-ও সায়েবের কাছে তো যাইতে আছি। শুনছি তেনার বড় খাই।'

চমকে হেমনাথ শুধোলেন, 'কিসের খাঁই ?'

'ঘুষের। পরম্পর শুনলাম বিনা ঘুষে লাইছেন বাইর করা যাইব না। হেই লেইগা—'

'কী ?'

'পাঁচ শ' ট্যাকা আনছি। পাঁচ শ'তে হইব না হ্যামকত্তা ?'

'কী করে বলি ? আমি তো আর এস-ডি-ও সায়েবের অন্তর্যামী না।'

'আপনে কত কি দেখছেন, শুনছেন। কত কি জানেন। একটা আন্দাজ যদি দিতেন—'

সে কথার উত্তর না দিয়ে হেমনাথ বললেন, 'কি এমন লাভের কারবার যাতে পাঁচ শ' টাকা ঘুষ দিতে চাইছিস ?'

রহস্যময় হেসে নিত্য দাস বলল, 'লাভ আছে হ্যামকত্তা, লাভ আছে। যদি না হইব এই সক্কালবেলা সুজনগঞ্জ থনে দৌড়াইয়া আসুম ক্যান ? এছ-ডি-ও'র বাংলায় গিয়া দেখুম আমার আগে আরো কয়জন বইসা আছে।' একটু থেমে আবার বলল, 'আমাগো এইদিকে অহনও কনটোল হয় নাই; কিন্তুক ইনাম গুঞ্জে রসুলপুরে হইয়া গেছে। কনটোলের দোকান দিয়া একেকজন লাল হইয়া গেল।'

'লাল কি করে হবে, বুঝতে পারছি না।'

'তার পথ আছে হ্যামকত্তা। আপনি তো আর ব্যবসায়ী না; হইলে বুঝতে পারতেন।'

হেমনাথ বিমূঢ়ের মতন তাকিয়ে থাকলেন।

নিত্য দাস আবার বলল, 'শুধা কাপড়-চিনি-ক্রাচিনের লাইছেন নিতেই আসি নাই হ্যামকত্তা। আরো একখানা কামেও আইছি—'

'কী ?'

'উই যেইখানে মিলিটারিগো থাকনের বাড়ি-ঘর উঠছে, তার উল্টাদিকে মদের দোকান খোলনের লাইছেন দিব গরমেণ্ট—'

হেমনাথ চমকে উঠলেন, 'রাজদিয়াতে মদের দোকান খোলা হবে !'

'হ।'

'তুই তার লাইসেন্স নিবি নাকি ?'

'হেই রকমই ইচ্ছা—'

হেমনাথ এবার প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'না, কিছুতেই না।'

হেমনাথ ধীর স্থির অচঞ্চল মানুষ। কোন ব্যাপারেই তাঁকে অসহিষ্ণু বা বিচলিত হতে দেখা যায় না। হঠাৎ তাঁকে এরকম চেঁচিয়ে উঠতে দেখে সবাই অবাক, কিছুটা বা চিন্তিত।

নিত্য দাস ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কাঁপা গলায় বলল, 'আইজ্ঞা—'

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'তুই না ধর্মকর্ম করিস ! নারায়ণ সেবা না করে জল খাস না ! তোর এত অধঃপতন হয়েছে ? মদের দোকান খুলে এখানকার মানুষের সর্বনাশ করতে চাইছিস ?'

'কিন্তুক—'

'কী ?'

'এয়া তো ব্যবসা ; ধম্মের লগে এয়ার সম্পক্ক কী !'

'সম্পর্ক নেই !'

'থাকলেও আমি বুঝতে পারতে আছি না। হে ছাড়া—'

'আবার কী ?'

'আমি যদি মদের দোকানের লাইছেন না লই আর কেউ নিয়া নিব—'

'যে খুশি নিক, তুই নিতে পারবি না ; এই বলে দিলাম—'

নিত্য দাস উত্তর দিল না। শীতল চোখে হেমনাথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মুখ নামাল। একটু পর চলে গেল সে।

নিত্য দাস যা বলেছিল, তা-ই। দেখতে দেখতে খোলাবাজার থেকে চিনি কাপড় এবং কেরোসিন উধাও হয়ে গেল। সুজনগঞ্জের দোকানদারদের কাছে ধর্না দিলে জোরে জোরে দু' হাত নেড়ে তারা শুধু বলে, 'নাই, নাই—'

চিনি না হলে তবু চলে। কিন্তু কেরোসিন আর কাপড় ছাড়া সংসার অচল। রাজদিয়া, কেতুগঞ্জ, ইসলামপুর, ডাকইতা পাড়া—সারা তল্লাটের লোক কাপড়-কেরোসিনের জন্য দিগ্বিদিকে ছোটাছুটি করতে লাগল।

এই ডামাডোলের ভেতর একদিন দেখা গেল, রাজদিয়াতে কাপড়-কেরোসিন-চিনির জন্য তিনটে কনট্রোলের দোকান বসেছে। একটা কেতুগঞ্জের রায়েবালি শিকদারের, একটা ইসলামপুরের অখিল সাহার, আর তৃতীয়টি নিত্য দাসের।

একজন যাতে বার-বার কেরোসিন-টেরোসিন না নিতে পারে সেজন্য পরিবার পিছু রেশন কার্ডও হল। রেশন কার্ড দেখালে তবেই ঐ দুর্লভ বস্তুগুলো পাওয়া যায়।

আরো কিছুদিন পর রাজদিয়া-বাসীরা দেখল, মিলিটারি ব্যারাকের উল্টোদিকে একটা মদের দোকান খোলা হয়েছে। দোকানটার মালিক আর কেউ না, স্বয়ং নিত্য দাস।

নিত্য দাস মদের দোকান খুলেছে, এই খবরটা এল দুপুরবেলা। শুনে তক্ষুনি হেমনাথ ছুটলেন। স্নেহলতা বারণ করলেন, 'এখন বেরুতে হবে না।'

অবাক বিস্ময়ে হেমনাথ বললেন, 'বেরুব না, বল কী!'

'বেরিয়ে কী হবে? তার চাইতে দু দণ্ড বিশ্রাম কর।'

'তোমার কি মাথা-টাথা খারাপ হল স্নেহ। মদের দোকান দিয়ে হারামজাদা সারা রাজদিয়াকে জাহান্নামে পাঠাবে, আর ঘরে বসে আমি বিশ্রাম করব!'

ভয়ে ভয়ে স্নেহলতা বললেন, 'ওখানে গিয়ে তুমি কী করবে?'

শান্ত অথচ কঠিন গলায় হেমনাথ বললেন, 'যাতে এখানকার সর্বনাশ না করতে পারে গোড়াতেই তার ব্যবস্থা করব।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'এটা ওর ব্যবসা—'

'যে ব্যবসা লোকের ক্ষতি করে তা চালাতে দেওয়া উচিত না। এ ব্যাপারে আমার কর্তব্য আছে।'

হেমনাথকে আটকানো গেল না; দুপুরের সূর্য মাথায় নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর হেমনাথ ফিরে এলেন। এখন আর তাঁর দিকে তাকানো যাচ্ছে না। সমস্ত রক্ত বুঝি মুখে গিয়ে জমা হয়েছে। চোখ দুটো বুঝি ফেটেই যাবে।

উদ্বেগের গলায় স্নেহলতা শুধোলেন, 'কী হয়েছে?'

হেমনাথ উত্তর দিলেন না।

স্নেহলতা কাছে এগিয়ে এসে আগের স্বরেই আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে, বলছ না কেন ?'

হেমনাথ এবার বললেন, 'নিত্য আমাকে অপমান করেছে।' অসহ্য আবেগে তাঁর ঠোঁট এবং কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল।

'অপমান !'

'তা ছাড়া কী ?' হেমনাথকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখাল, 'আমি নিত্যকে বললাম দোকান বন্ধ করে দে ; কিছুতেই সে শুনল না।'

বিনু-ঝিনুক-অবনীমোহন-সুরমা, হেমনাথকে ফিরতে দেখে সবাই ছুটে এসেছিল। কেউ কিছু বলল না। স্নেহলতাও চুপ করে থাকলেন।

হেমনাথ আবার বললেন, 'সারা জীবন মানুষের হিত ছাড়া অহিত চিন্তা করি নি। যাকে যা বলতাম সে তা-ই শুনত ; সেইমতন চলত। কিন্তু এই শেষ বয়সে নিত্য দাস আমার কথাটা রাখল না ; আমাকে অমান্য করল।' দুঃখে অভিমানে তাঁর গলা বুজে এল।

আবছা গলায় স্নেহলতা বললেন, 'তখনই তো তোমাকে বললাম যেও না—'

উত্তর না দিয়ে হেমনাথ ঘরের ভেতর চলে গেলেন। তারপর দুই হাঁটুর ওপর মুখ রেখে আচ্ছন্নের মতন বসে থাকলেন।

বিনু দাঁড়িয়ে ছিল। আস্তে আস্তে একসময় কাছে এসে উঁকি দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে হেমনাথ যেন একবারে ভেঙেচুরে গেছেন। তাঁকে ক্লান্ত পিরাভূত মলিন দেখাচ্ছে।

দাদুর অবস্থা খানিকটা যেন অনুমান করতে পারছিল বিনু। রাজদিয়াকে ঘিরে বিশ-পঁচিশ মাইলের মধ্যে যত গ্রাম-গঞ্জ-জনপদ, সব কিছুর ওপর ঈশ্বরের মতন ব্যাপ্ত হয়ে আছেন হেমনাথ। তিনি আঙুল দিয়ে সামান্য একটু ইঙ্গিত করলে চারদিক থেকে হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসে। সবাই তাঁকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে।

যে মানুষ এতকাল শুধু সম্মানই কুড়িয়েছেন, যাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল সম্রাটের মতন, জলবাঙলার এই জায়গাটুকু জুড়ে সহস্র হৃদয়ে যাঁর সিংহাসন পাতা, জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে সেই হেমনাথ আজ প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন। নিত্য দাস অবাধ্য হবে, হেমনাথের পক্ষে তা ছিল অকল্পনীয়। এই একটি আঘাত তাঁকে একেবারে চুরমার করে দিয়েছে।

অবনীমোহনরা এখনও বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। স্নেহলতা হঠাৎ ফিসফিস গলায় বললেন, 'কী লক্ষ্মীছাড়া যুদ্ধ যে রাধল ! মানুষকে একেবারে বদলে দিচ্ছে।

ঐ নিত্য দাস আগে আগে এ বাড়িতে পড়ে থাকত। একটা পয়সা ছিল না তার। তোমার মামাবাবু টাকা দিয়ে ব্যবসায় বসিয়ে দিলে। সেই থেকে তার উন্নতি। এখন তার আড়তে সবসময় দু-তিন হাজার মণ ধান মজুত থাকে ; যখন তখন দশ-বিশ হাজার টাকা বার করে দিতে পারে। যার জন্যে এত, তার কথাটাই রাখল না নিত্য দাস।'

অবনীমোহন কিছু বললেন না, বিষণ্ণ মুখে তাকিয়ে থাকলেন।

॥ ছাব্বিশ ॥

দিনকয়েক পর সন্ধ্যের সময় যথারীতি খবর-কাগজ পড়ার আসর বসেছে। ইচু মণ্ডল হাচাই পালরা অন্ধকার নামতে না নামতেই এসে হাজিরা দিয়েছে।

অবনীমোহন পড়ছিলেন, 'রেঙ্গুনের পতন। মাত্র কয়েকদিন আগে সিঙ্গাপুর অধিকার করিবার পর জাপবাহিনী আজ রেঙ্গুন দখল করিয়াছে। মিত্র সৈন্যরা সাফল্যের সহিত পশ্চাদপসরণ করিতেছে।'

'জাপানী আক্রমণের আতঙ্কে কলিকাতা সন্ত্রস্ত। মহানগরী ত্যাগ করিয়া বহু লোকের নানা দিকে পলায়ন—'

হঠাৎ পড়া থামিয়ে অবনীমোহন বললেন, 'কলকাতায় ইভাক্যুয়েশন শুরু হয়ে গেল মামাবাবু—'

এর ভেতর সেদিনের সেই আঘাতটা অনেকখানি সামলে নিয়েছেন হেমনাথ। বললেন, 'তাই তো দেখছি। আমার মনে হয়, রাজদিয়ার লোক যারা কলকাতায় থাকে, তারাও চলে আসবে।'

হেমনাথ যা অনুমান করেছেন তা-ই। দু-একদিনের ভেতর দেখা গেল স্টিমার বোঝাই হয়ে রাজদিয়ার প্রবাসী সন্তানরা জাপানী বোমার ভয়ে কলকাতা থেকে চলে আসছে। দেখতে দেখতে নাহাপাড়া, গুহপাড়া, দত্তপাড়া, আদালতপাড়া, কলেজপাড়ার ফাঁকা বাড়িগুলো ভরে গেল।

কলকাতা থেকে যারা এসেছে তাদের মুখে চমকপ্রদ সব খবর পাওয়া যাচ্ছে। জলোচ্ছ্বাসের দিশেহারা ঢলের মতন কলকাতার লোকেরা নাকি যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। রেলওয়ে বুকিং অফিসগুলোতে দু'মাইল লম্বা 'কিউ' পড়েছে কিন্তু টিকিট মিলছে না। ন্যায্য দামের সঙ্গে দুগুণ তিনগুণ ঘুষ দিয়েও

না। হাওড়া আর শিয়ালদা স্টেশনে ঢুকবার উপায় নেই। একেক ট্রেনে দশটা ট্রেনের যাত্রী উঠছে। বেঞ্চির তলায় পা রাখবার জায়গা নেই। সেখানেও মানুষ। ল্যাট্রিন, পা-দানী, এমন কি ছাদের ওপর উঠেও মানুষ পালাচ্ছে। ছাদে যারা ওঠে তাদের মধ্যে কত লোক যে ওভার ব্রীজে ধাক্কা খেয়ে মরছে, হিসেব নেই।

মারোয়াড়ী, হিন্দুস্থানী, গুজরাটিরা জলের দরে বাড়ি বেচে দিচ্ছে। রেলের আশায় তারা কলকাতায় বসে থাকছে না। স্রেফ পা দু-খানার ওপর ভরসা করে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে পাড়ি জমাচ্ছে। বাঙালীরা বেশির ভাগ যাচ্ছে গ্রামের দিকে। যাদের অনেক পয়সা তারা মধুপুর, গিরিডি, ঘশিডিতে গিয়ে টপাটপ বাড়ি কিনছে। প্রাণের মায়া বড় কঠিন মায়া।

ত্রৈলোক্য সেনরা আসার পর বর্মার খবর শুনবার জন্য রাজদিয়া-বাসীরা তাঁর কাছে ছুটত। বর্মা সম্বন্ধে উৎসাহ মলিন হয়ে গেছে। এখন কলকাতার খবর শুনতে এখানকার লোকরা নাহাপাড়া, আদালতপাড়া, দত্তপাড়ায় ছুটছে।

সব শুনে অবনীমোহন সুরমাকে বললেন, 'এখানে জমিজমা কিনে বুদ্ধিমানের কাজই করেছিলাম, না কি বল?'

সুরমা বলেন, 'ভাগ্যিস কিনেছিলে। নইলে এ সময়ে কোথায় যে যেতাম!'

ঝিনুকও কলকাতা থেকে লোক পালানোর খবর শুনেছিল। এ সব কথা যখন হত, অসীম আগ্রহে সে গিলতে থাকত।

একদিন সবার আড়ালে ঝিনুক বলল, 'আচ্ছা বিনুদা—'

বিনু বলল, 'কী?'

'কলকাতা থেকে লোক তো পালাচ্ছে—'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে ঝুমারাও আসবে?'

ঝুমাদের কথা অনেকদিন ভাবে নি বিনু। ঝিনুকের কথায় হঠাৎ চকিত হয়ে উঠল। তাই তো, কলকাতা থেকে সবাই চলে আসছে। ঝুমারা তো এখনও এল না।

॥ সাতাশ ॥

কলকাতা থেকে লোক পালাবার হিড়িক শুরু হয়েছে। ফলে শুধু রাজদিয়াই নয়, আশেপাশের গ্রাম-গঞ্জ-জনপদ দ্রুত ভরে উঠছে। চারধারের গ্রামগুলোই কি শুধু? সারা জলবাঙলাই হয়তো মানুষে মানুষে ছেয়ে যাচ্ছে।

এতদিন রাজদিয়ার বাড়ি বাড়ি ঘুরে খবর আনছিলেন হেমনাথ। ইদানীং কিছুদিন ধরে চারপাশের গ্রামগুলোতে যাচ্ছেন। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে যান। ফিরতে ফিরতে বিকেল কিংবা সন্ধ্যে। ফিরে কোনদিন বলেন, 'আজ কেতুগঞ্জে গিয়েছিলাম। শুধু কলকাতারই লোক।' কোনদিন বলেন, 'আজ গিয়েছিলাম বাজিতপুরে, সেখানেও এক অবস্থা।' কোনদিন বলেন, 'ভাগ্যিস যুদ্ধটা বেধেছিল আর জাপানী ব্যাটারা বার্মায় বোমা ফেলেছিল! তাই না ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরে এসেছে। যারা কোনদিন এখানে আসত না, এখানকার পাট চুকিয়ে কলকাতাবাসী হয়েছিল, যুদ্ধের কল্যাণে দেশের বাড়ির জন্য তাদেরও প্রাণ কেঁদে উঠেছে।'

জিনিসপত্রের দাম আগে থেকেই বাড়ছিল, কলকাতায় ইভাকুয়েশেন শুরু হবার পর হু হু করে চড়ছে। এখন সব জিনিসেরই সকালে এক দর, দুপুরে এক দর, সন্ধ্যেয় আরেক দর। দরটা কখন কিভাবে কতগুণ চড়বে, আগে তার কোন হদিসই পাওয়া যায় না। বাজার এখন বড় অস্থির।

তবু যত দামই বাড়ুক, কলকাতার তুলনায় তো অনেক কম।

আজকাল হাটে গেলে মজার মজার অভিজ্ঞতা হয়। কলকাতার বাবুরা হঠাৎ এই সস্তাগণ্ডার দেশে এসে একেবারে অবাক হয়ে গেছেন। যে জিনিস ছাখেন তাই কিনে ফেলেন, দরদস্তুর কিছুই করেন না, যা দাম চাওয়া যায় ঝনাৎ করে ফেলে দেন। আর কথায় কথায় বলেন, 'ড্যাম চীপ—'

সেদিন অবনীমোহন আর হেমনাথের সঙ্গে সুজনগঞ্জের হাটে গিয়েছিল বিনু। সেখানে চমকপ্রদ একটা ব্যাপার ঘটল।

একজন মুসলমান ব্যাপারী কটা গাছপাকা পেঁপে নিয়ে বসে ছিল। সব চাইতে বড় ফল দুটো বেছে নিয়ে অবনীমোহন বললেন, 'দাম কত?'

ব্যাপারী বলল, 'একখান আধলি লাগব বাবু।'

জলবাঙলায় আসার পর প্রথম প্রথম দরদাম করতেন না অবনীমোহন। আজকাল এখানকার হালচাল বুঝে গেছেন। যে জিনিসের দাম চার পয়সা ব্যাপারীরা হাঁকে দু আনা। কাজেই দর-টর না করলে কি চলে!

অবনীমোহন বললেন, 'বল কি, ঐ দুটো পেঁপের দাম আট আনা!'

'হ বাবু। সিকি আধলাও কমাইতে পারুম না।'

'ন্যায্য দাম বল, নিয়ে যাই।'

'চাউলের মণ বাইশ ট্যাকা, বাগুনের স্যার ছয় পহা, ঝিঙ্গার তিন পহা। দুইটা বড় পাউপার (পেঁপে) দাম আট আনা চাইয়া অলেহ্য (অন্যায়) কাম করি নাই।'

'শোন ব্যাপারী, তোমার কথাও থাক, আমার কথাও থাক; ছ আনা দিচ্ছি। দিয়ে দাও।'

ব্যাপারী এবার উত্তর দিল না; মুখ ঘুরিয়ে পাশের মরিচ-ব্যাপারীর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল।

অবনীমোহন বললেন, 'কি হল, আমার কথাটা শুনতে পেলে না?'

মুখ না ফিরিয়েই ব্যাপারী বলল, 'শুনছি।'

'আমি যা বললাম সেই দামে দেবে কি দেবে না, কিছু বললে না তো?'

একটু চুপ করে থেকে ব্যাপারী বলল, 'আপনের কাম না বাবু—'

অবনীমোহন অবাক, 'কী আমার কাজ নয়?'

'আমার পাউপা (পেঁপে) কিনন (কেনা)। আপনের কাছে তো আষ্ট গণ্ডার পয়সা চাইছি। ড্যাঙ্কি বাবুরা (ড্যাম চীপ বাবুরা) আইলে এক ট্যাকা দিয়া লইয়া যাইব।'

সত্যিই তাই। তাঁদের কথাবর্তার মধ্যে এক কলকাতার বাবু এসে ছোঁ মেরে পেঁপে দুটো তুলে নিল; দাম বাবদ একটি টাকা আদায় করে গেঁজেতে পুরতে পুরতে সগর্বে হাসল ব্যাপারী, 'দেখলেন তো?'

এ নিয়ে তর্কাতর্কি ঝগড়াঝাটি বাধানো যেত। অবনীমেহন কিছুই করলেন না। মুখ লাল করে মাছহাটার দিকে চলে এলেন।

সুজনগঞ্জে এসেই হেমনাথ ধানের আড়তগুলোর দিকে চলে গিয়েছিলেন। অবনীমোহন আর বিনু গিয়েছিল বাড়ির জন্য সওদা করতে।

যাই হোক মাছের বাজারে এসে প্রায় একইরকম অভিজ্ঞতা হল।

এক চেনাশোনা মাছ-ব্যাপারী, নাম তার গয়জদ্দি নিকারী, এক কোণে দোকান সাজিয়ে বসেছিল। সুজনগঞ্জে প্রথম যেদিন এসেছিলেন, সেদিন থেকেই গয়জদ্দির কাছে মাছ কিনছেন অবনীমোহন। গয়জদ্দি তাঁর বাঁধা ব্যাপারী।

গয়জদ্দি আজ ভাল ভাল লোভনীয় মাছ এনেছে। তার সামনে দুটো বড় বড় বেতের চ্যাঙাড়ি। চ্যাঙাড়ির ঢাকনার ওপর পেট লাল গরমা, কালবোস, কাজলি এবং কুলীন জাতের চকচকে পাবদা মাছ সাজানো।

এই জলের দেশে যেখানে অঢেল মাছ, সেখানেও এরকম পাবদা দুর্লভ। মাছগুলোর লালচে রুপোলি শরীর এত চকচকে যে মনে হয়, পালিশ করা।

অবনীমোহন বললেন, 'ক' কুড়ি পাবদা আছে গয়জদ্দি?'

গয়জদ্দি বলল, 'তিন কুড়ি।'

'দাম কত নেবে?'

'পাবদাগুলান আপনেরে দিমু না জামাইকত্তা—'

অবনীমোহন অবাক হলেন, 'কেন হে !'

গয়জদ্দি বলল, 'ঐগুলানের অন্য গাহেক (খদ্দের) আছে।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে কৌতুকের গলায় অবনীমোহন বললেন, 'ড্যাঞ্চিবাবুরা নাকি ?'

গয়জদ্দি একগাল হাসল, 'হ। ড্যাঞ্চিবাবুরা একেবারেই মূলায় (দরদাম করে) না। যা কই তাই দিয়া যায়। এই সুযুগে তুইখান পহা কইরা লই।'

অবনীমোহন বললেন, 'পাবদা না দাও, কালবোসটা দাও।'

'কালিভাউসটাও (কালবোস) ড্যাঞ্চিবাবুগো লেইগা রাখছি।'

অগত্যা ডুলা বোঝাই করে কাজলি মাছই কিনলেন অবনীবোহন।

এখন সুজনগঞ্জের হাটে 'ড্যাঞ্চি' বাবুদেরই জয়জয়কার।

॥ আটাশ ॥

বোমার ভয়ে কলকাতা থেকে যারা পালিয়ে এসেছে তাদের ছেলেমেয়েরা রাজদিয়ার স্কুল-কলেজে ভর্তি হতে লাগল।

বিনুর ক্লাসের দশ-বারোটা ছেলে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে সব চাইতে চমকদার হল গোসাই বাড়ির অশোক। প্রথম দিন স্কুলে এসেই সে সবার মনোহরণ করে ফেলল। বিনু আর শ্যামল তো রীতিমত তার ভক্তই হয়ে দাঁড়িয়েছে। হবার মতন যথেষ্ট কারণও রয়েছে।

অশোক স্কুলে আসে সাইকেলে করে। ঝকঝকে নতুন সাইকেল তার। স্কুলের সামনের মাঠটায় বোঁ করে একটা পাক দিয়ে সাইকেলটা যখন সে থামায় সেই বিস্ময়কর দৃশ্যের দিকে অন্য ছেলেরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এত সুন্দর সাইকেল সারা রাজদিয়াতে আর কারো নেই।

সাইকেলের নানারকম খেলাও জানে অশোক। একটু আগে আগে স্কুলে এসে সে-সব দেখায়ও সে। হ্যাণ্ডেল না ধরে অশোক সাইকেল চালাতে পারে। চলন্ত অবস্থায় সীটে বসে জামাকাপড় পরতে পারে।

বিনু আর শ্যামলের চাইতে অশোক বেশ বড়; অন্তত তিন চার বছরের তো বটেই। ফেরতা দিয়ে কাপড় পরে সে, লম্বা জুলপি রাখে। ঘাড়ের কাছে জামার কলারটা সবসময় খাড়া হয়ে থাকে। বুকের কাছে একটা মোটে বোতাম

আটকানো, বাকি দুটো খোলা। ফলে ভেতরের গেঞ্জি দেখা যায়। ছোকরার ঠোঁটের ওপর সরু সৌখিন গোঁফ। যখন কায়দা করে হাঁটে পায়ের চটি দু ফুট আগে আগে চলে। কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে চমৎকার শিস দিতে পারে সে।

একেক দিন একেক রকম করে চুল আঁচড়ে আসে অশোক। একদিন হয়তো ব্যাকব্রাশ করে এল, একদিন এল এ্যালবার্ট কেটে কিংবা চুলে ঢেউ খেলিয়ে।

কোনদিন এসে অশোক বলে, 'কার মতন চুল আঁচড়েছি বল তো ?'

সারা ক্লাস চারদিক থেকে সাগ্রহে সমস্বরে শুধোয়, 'কার মতন ?'

'রবীন বিশ্বাসের।'

বিনু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'রবীন বিশ্বাস কে ভাই ?'

রবীন বিশ্বাসের নাম জানে না, এমন ছেলে হয়তো এই প্রথম দেখল অশোক। অবাক বিস্ময়ে সে বিনুর দিকে তাকিয়ে থাকে। বলে, 'রবীন বিশ্বাসকে চেনো না !'

রবীন বিশ্বাসকে না চেনার লজ্জায় মাথা আপনা থেকেই নুয়ে পড়ে বিনুর।

অশোক আবার বলে, 'স্টাইল যদি শিখতে হয় রবীন বিশ্বাসের সিনেমা দেখতেই হবে।'

বিনু এতক্ষণে বুঝতে পারে, রবীন বিশ্বাস একজন অভিনেতা।

কোনদিন এসে অশোক বলে, 'আজ ছবি মজুমদারের স্টাইলে চুল আঁচড়েছি।'

কোনদিন বলে, 'আজ জহর ব্যানার্জীর মতন আঁচড়েছি।'

জামাও অশোক একরকম পরে না। বেশির ভাগ দিনই কলারওলা অথবা হাতাহীন পাঞ্জাবি পরে আসে। বলে, 'কি একটা বইয়ে মনে পড়ছে না, অমলেশ বড়ুয়া এইরকম জামা পরেছিল।'

ছোটদি আর বড়দির মুখে অমলেশ বড়ুয়ার নাম শুনেছে বিনু। কাজেই তাঁর সম্বন্ধে আর কিছু জিজ্ঞেস করে না।

কিন্তু এসব অতি সামান্য ব্যাপার। ছেলেদের নিশ্বাস বন্ধ করে দেবার মতন আরো অনেক কিছু জানে অশোক। হেন সিনেমা নেই যা সে ছাখে নি। শুধু সিনেমা দেখাই নাকি, ছায়ালোকের তাবত কিন্নর-কিন্নরীকেও সে চেনে। অশোক বলে, স্টার—চিত্রতারকা। কলকাতায় থাকতে সে নাকি তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। সে লীলারাণীকে দেখেছে, কনকবালাকে দেখেছে, ছবি

মজুমদারকে দেখেছে। জহর ব্যানার্জী অমলেশ বড়ুয়া, মহীন্দ্র গাঙ্গুলী কাকে না চেনে সে? কাকে না দেখেছে?

ক্লাসে, ক্লাসের বাইরে সারাক্ষণ সিনেমার নানা গল্প করে যায় অশোক। ফাঁকে ফাঁকে গান। কত গানই না সে জানে।

'এসো যৌবন,

এসো যৌবনমত্তা ওগো
মধুমাস এলো কি—
সাগরের কল্লোল শুনি তব বক্ষে
বিজলির ঝিলিমিলি আনিয়াছ চক্ষে।'

কিংবা

'তাহারে যে জড়াতে চায় দুটি বাহুলতা—
কে শুনেছ মোর কামনার নীরব ব্যাকুলতা।'

কিংবা

'আমার ভুবনে এল বসন্ত তোমারই তরে
আঁখি দুটি তব রাখ, রাখ মোর আঁখির পরে।'

ছায়ালোকের অজস্র জ্ঞানে বোঝাই হয়ে যে এসেছে তার ভক্ত না হওয়াটাই তো আশ্চর্যের।

ক্লাসের সব ছেলেই অশোকের ভক্ত; তবু তাদের মধ্যে বিনু আর শ্যামলের তুলনা হয় না। অশোকের দিকে সর্বক্ষণ তারা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। অশোক যা বলে অভিভূতের মতন শুনে যায়। একই কথা বার বার শুনেও ক্লান্তি নেই। অশোককে একবার পেলে তার সঙ্গ ছাড়তে চায় না। গুড়ের গায়ে মাছির মতন বিনু আর শ্যামল তার গায়ে লেগেই আছে।

এমন ভক্ত পেলে কে না খুশী হয়। অশোকও সবার ভেতর থেকে বিনুদের বেছে বার করেছে। তাদের সঙ্গেই সে বেশি মেশে, বেশি গল্প করে, বেশি ঘোরে। মোট কথা তাদের ওপরেই অশোকের বেশি অনুগ্রহ।

আগে জামা-কাপড় পোশাক-টোশাকের দিকে নজর থাকত না বিনুর। ছেঁড়া হোক, ময়লা হোক—একটু কিছু পরতে পেলেই হত। জুতো পায়ে দেবার বিশেষ বালাই ছিল না। এসব ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন ছিল সে।

অশোক আসবার পর সাজটাজের দিকে মন গেছে বিনুর। আজকাল আর ময়লা জামা প্যাণ্ট পরতে চায় না। পোশাকটি ধবধবে হাওয়া চাই, তাতে কড়া ইস্তিরি থাকা চাই। জুতোটা চকচকে ঝকমকে না হলে আজকাল আর চলে না।

প্রায় কান্নাকাটি করে একটা ধুতি কিনেছে বিনু; কলারওলা হাতাহীন পাঞ্জাবি বানিয়েছে। অশোকের মতন কায়দা করে ফেরতা দিয়ে আজকাল ধুতি পরে সে। বাড়িতে অবশ্য পরে না, রাস্তায় বেরুলেই জামার কলার উল্টে দেয়। চটিটা সামনের দিকে ছুঁড়তে ছুঁড়তে হাঁটে।

এ তো গেল পোশাকের কথা। তা ছাড়াও অশোককে আরো নানা দিক থেকে অনুকরণ করছে বিনু। তার মতন স্টাইল করে চুল আঁচড়ায়; সরু করে শিস দেওয়া প্র্যাকটিশ করে। আর গান তো আছে। দিনরাত গুনগুন করেই যাচ্ছে সে :

'শত জনমের কামনা বাহিয়া।
রূপ ধরে আজ এসেছ কি প্রিয়া?
যত ভালবাসা তত যদি আশা—'

বিনুর হঠাৎ পরিবর্তন সুধা-সুনীতির চোখে পড়েছে। এত দ্রুত বদলে গেলে না পড়ে উপায় কী। সুনীতি গালে হাত দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, 'ও বাবা, দিন দিন ছেলে স্টাইল শিখছে দেখ না!'

সুধা ঝঙ্কার দিয়ে বলে, 'ছোঁড়া একেবারে ঝুনো হয়ে উঠছে। ঐ রুদ্রবাড়ির অশোকটা আসবার পরই পাকামো শুরু হয়েছে। হ্যাঁ রে বিনু, লুকিয়ে লুকিয়ে বিড়িটিড়ি খাচ্ছিস নাকি?'

সুধার কথা শেষ হবার আগেই লঙ্কাকাণ্ড বেধে যায়। বিনু তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ঝিনুক অবশ্য অন্য কথা বলে, 'তুমি অমন গুন গুন কর কেন বিনুদা? গলা ছেড়ে গাইতে পার না? কি সুন্দর গলা তোমার।'

যত জ্ঞানের জাহাজ হয়েই আসুক, তার তো শেষ আছে। একদিন সিনেমার গান আর গল্পের ঝুলি ফুরিয়ে গেল অশোকের। ফুরোবার পর আবার নতুন করে সেগুলো শোনাল সে। তারপর আবার, আবার, আরো অনেকবার।

শুনতে শুনতে সব গান মুখস্থ হয়ে গেছে বিনুর। যত রোমাঞ্চকর আর যত চমকপ্রদই হোক না, একই গল্প কতবার আর শুনতে ভাল লাগে। আজকাল যখন অশোক চিত্রতারকাদের গল্প নিয়ে বসে, বিনু বা শ্যামল ততটা আগ্রহ নিয়ে শোনে না।

ভক্তদের বিস্ময় আর মুগ্ধতা যে কমে আসছে তা লক্ষ্য করে একদিন অশোক বলল, 'চল, মিলিটারিদের ব্যারাক থেকে ঘুরে আসি।'

মিলিটারির কথায় ভয় পেয়ে গেল বিনু। বলল, 'না না, ওখানে গিয়ে দরকার নেই।' নদীর পারে ব্যারাকগুলো যখন তৈরী হচ্ছিল তখন খুব যেত বিনু। নিগ্রো আর আমেরিকান টমিরা ওখানে আসার পর আর যায় না।

অশোক বলল, 'যাবে না কেন ?'

'ওরা যদি ধরে রেখে ছায় ?'

'ভীতু কোথাকার, আমরা কলকাতায় কত মিলিটারির সঙ্গে মিশেছি। কই আমাদের তো ধরত না।'

বিনু বলল, 'কলকাতায় এখন বুঝি খুব মিলিটারি !'

অশোক মাথা নাড়ল, 'মিলিটারি ছাড়া কলকাতায় এখন আর কিছু নেই। রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারি ট্রাক আর জীপ। লালমুখো আমেরিকান টমি আর নিগ্রো সোলজার। লেকের দিকে কখনো গেছ ?'

'অনেক বার।'

'সেখানে এখন মিলিটারিদের ছাউনি পড়েছে। ওদিকে যেতে কেউ সাহস পায় না। কিন্তু বন্ধুদের নিয়ে আমি ঠিক যেতাম—' বলে সগর্বে তাকাল অশোক।

বিনু আর শ্যামল অবাক হয়ে গেল।

অশোক আবার বলল, 'শুধু যেতামই না। ওদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে চকোলেট, টফি, ড্রাইফুড, টিনের মাছ—কত কী আদায় করতাম।'

বিনুরা সবিস্ময়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'তাই নাকি !'

অশোক বলল, 'হুঁ হুঁ—' তারপর হঠাৎ কী মনে পড়তে তাড়াতাড়ি আবার বলে উঠল, 'ধরে রাখার কথা বললে না তখন—'

'হ্যাঁ।'

'ধরে তোমাকে ঠিকই রাখত। যদি—'

'যদি কী ?'

'তুমি মেয়ে হতে।'

'মেয়ে হলে ধরে রাখবে কেন ?'

ঠোট টিপে চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ বিনুকে দেখল অশোক। তারপর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে কী বলল।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ লাল হয়ে উঠল বিনুর, কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।

হাসতে হাসতে অশোক বলল, 'তুমি একটা ভোঁদা; তোমাকে মানুষ করতে অনেক সময় লাগবে।' বলে একরকম টানতে টানতে মিলিটারি ব্যারাকের দিকে নিয়ে গেল।

ব্যারাকের সীমানা তারকাঁটা দিয়ে ঘেরা। কয়েক মাইল জুড়ে এই সীমানা। অবশ্য মাঝে মাঝে কাঠের গেট রয়েছে। সেখানে মিলিটারি পুলিস রাইফেল কাঁধে পাহারা দিচ্ছে।

বিনুরা যখন সেখানে গিয়ে পৌছুল, প্রথম গেটটা থেকে কিছু দূরে তার-কাঁটার ওপর একটা করে পা রেখে পাঁচ-ছটা লালমুখো টমি দাঁড়িয়ে আছে। সীমানার বাইরে একদল আধ-ন্যাংটো কালো কালো ক্ষুধার্ত মানুষ জড়ো হয়ে রয়েছে; তাদের লুব্ধ করুণ চোখ টমিগুলোর দিকে। মনে হয়, ওরা প্রায়ই এখানে আসে। টমিগুলোর সঙ্গে তাদের পরিচয় আছে।

অশোক বিনুদের নিয়ে বাইরের জনতার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'এখানে দেখছি অনেক খদ্দের। এই কালো কালো জানোয়ারগুলো এসে জুটেছে। কলকাতায় আমরা দু-চারজন মোটে যেতাম।' বলেই টমিদের দিকে ফিরে বলল, 'হ্যালো জো—'

টমিরা ভুরু বাঁকিয়ে তাকাল, কিছু বলল না।

অশোক আবার বলল, 'ইউ আর ভেরি কাইণ্ড। প্লীজ গিভ আস চকোলেট, টফি। হ্যালো জো —'

টমিরা নিজেদের ভেতর কী বলাবলি করল। তারপর পকেট থেকে মুঠো মুঠো চকোলেট আর টফি বার করে ছুঁড়তে লাগল। নিমেষে বাইরের জনতার ভেতর চিৎকার চেঁচামেচি মারামারি কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেল। অশোকও তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিনু আর শ্যামল অবশ্য দাঁড়িয়ে রইল।

একটা টমি উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে চেঁচাতে লাগল, 'গো অন ফাইটিং, ইউ ডগ, স্ন্যাচ স্ন্যাচ—বাইট ছাট সোয়াইন—পুশ ছাট ব্যাস্টার্ড—'

আরেকটা টমি দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ব্ল্যাডি, ইণ্ডিয়ানস্—বেগারস্, সন্স্ অফ বীচেস—'

বাকি টমিগুলো কিছুই বলল না, ক্যামেরা বার করে টকাটক ছবি তুলতে লাগল।

কাড়াকাড়ি করে অনেকগুলো চকোলেট কুড়িয়েছে অশোক। সেগুলো নিয়ে বিনুদের কাছে এসে বলল, 'আচ্ছা ছেলে তো তোমরা, চুপচাপ হাঁদার মতন দাঁড়িয়ে রইলে! তোমরা কুড়োলে আরো কত চকোলেট পাওয়া যেত।'

বিনু হঠাৎ বলে ফেলল, 'টমিরা কী বলছিল জানো?'

'কী?'

'ব্লাডি বেগারস, ডগস্, সোয়াইনস—এমনি আরো কত কী। এসব শুনবার পরও ওদের জিনিস কুড়োতে যাব!'

অশোক গ্রাহ্য করল না। গা থেকে গালাগালগুলো ছেড়ে ফেলে বলল, 'বলুক গে। গায়ে তো আর ফোস্কা পড়ছে না। ওদের চকোলেট খেয়ে দেখ, জীবনে এমন জিনিস আর কখনও খাও নি। খাস আমেরিকায় তৈরি।' শুধু টমিদের জন্যে জাহাজে করে আসে। বলে একটা বড় চকোলেট এগিয়ে দিল।

বিনু কিন্তু নিল না।

মিলিটারি ব্যারাকে সেই একদিনই গেল না বিনুরা। অশোক প্রায় রোজই তাদের ধরে নিয়ে যেতে লাগল।

টমিরা তারকাঁটার বেড়ার ওধারে দাঁড়িয়ে রোজ শুধু চকোলেটই ছোঁড়ে না। এক-আধদিন বিস্কুটের টিন, ড্রাই ফুডের টিন ছোঁড়ে। মাঝে মাঝে মুঠো মুঠো রেজগিও ছুঁড়ে ছায়। পয়সা যেদিন ছড়ায় মারামারিটা সেদিন সাংঘাতিক রকমের ঘটে যায়।

প্রথম প্রথম বিনু ওদের কোন জিনিসই ছুঁত না। অশোকদের দেখাদেখি কবে থেকে যে সে কাড়াকাড়ি করতে শুরু করেছে, নিজেই জানে না।

॥ উনত্রিশ ॥

আমেরিকান টমিদের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ানো আজকাল বিনুদের নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। টমিদের খোঁজে এখন আর ব্যারাক পর্যন্ত যেতে হয় না। রাজদিয়ার রাস্তায় রাস্তায়, স্টিমারঘাটে, নদীর পাড়ে ঝাউবনের দিকটায় সবসময় টমিগুলো টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

একদিন বিনুরা দেখতে পেল, তাদের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে সেই কাঠের পুলটার ওপর দুই টমি একটা প্রকাণ্ড পাকা কাঁঠাল নিয়ে বসে আছে। খানিকটা দূরে মুসলমান চাষীদের এক জনতা উদগ্রীব দাঁড়িয়ে; মাঝে মাঝে টমি দুটোকে দেখিয়ে ফিসফিস গলায় নিজেদের ভেতর কি বলাবলি করছে।

বিনুরা প্রথমে চাষীদের কাছে গেল। শ্যামল শুধলো, 'কী ব্যাপার? কী হয়েছে?'

একটি জোয়ান চাষী জনতার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'সায়েবগো কাছে আমরা একখান কাঠল (কাঁঠাল) বেচছি। কত দাম নিছি জানেন ?'

'কত ?'

'চাইর ট্যাকা।'

'তাই নাকি !'

'হ। কাঠলটার দাম বড়জোর আষ্ট আনা। নগদ সাড়ে তিন ট্যাকা লাভ করলাম।' একটা কাঁঠালে সাড়ে তিন টাকা লাভ করা দিগ্বিজয়ের সমান। গর্বে ছোকরার বুক ফুলে উঠছিল।

আরেকটা মধ্যবয়সী চাষী লবল, 'হালারা যে কই থন (কোথা থেকে) আইছে ! যা দাম চাই তাই দিয়া স্থায়। ট্যাকা-পয়সার উপুর দয়ামায়া নাই। একখান কাঠল বেইচা চাইর ট্যাকা পাওন যায়—বাপের জন্মে এমুন কথা শুনি নাই।'

আরেক জন বলল, 'যা গ্যাখে হালারা হেই কিনে (তাই কেনে)। হেই দিন আমি তো আড়াই ট্যাকায় একখান কুমড়া বেচছিলাম।'

তারপর দেখা গেল, শুধু কুমড়োই না, অবিশ্বাস্য অকল্পনীয় দামে আরো অনেকে অনেক কিছু সৈন্যদের কাছে বিক্রি করেছে।

অশোক এই সময় বলে উঠল, 'কাঁঠাল তো বেচেছ ; আবার দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন ?'

সেই জোয়ান চাষীটি বলল, 'সায়েবরা আমাগো কী জানি কইতে আছে ; বুঝতে পারি না।'

মধ্যবয়সীটি বলল, 'এমুন তরাতরি এংরাজি কয় য্যান ছাগলে নাইদা (নেদে) যায়। কার সাইধ্য বোঝে !' ভাবখানা এই, তাড়াতাড়ি না বলে ধীরে-সুস্থে বললে সে ইংরেজী ভাষাটা অক্লেশ বুঝে ফেলত।

অশোক কী বলতে যাচ্ছিল সেই সময় টমি দুটো ডাকল, 'ইউ গায়।'

বিনুরা ফিরে তাকাতে টমিরা হাতের ইশারায় ডাকল।

টমিদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সাহস বেড়ে গিয়েছিল ; এখন আর তাদের ভয় করে না বিনুরা। অশোক বলল, 'চল, ব্যাটারা কী বলছে শুনে আসি।

বিনু, শ্যামল আর অশোক—তিনজনে পায়ে পায়ে পুলটার 'ওপর গিয়ে উঠল। উৎসুক জনতা পেছনে দাঁড়িয়ে থাকল।

একটা টমি শুধলো, 'নো ইংলিশ ?' অর্থাৎ অশোকরা ইংরেজি জানে কিনা ?

অশোক বলল, 'ইয়েস।'

কাঁঠালটা দেখিয়ে এবার টমিটা বলল, 'উয়াটস্ দিস ?'

প্রথমে খুব চাপা গলায় অশোক বাঙলায় বলে নিল, 'ব্যাটারা কী কিনেছে তাই জানে না।' তারপর ইংরেজিতে বলল, 'ফ্রুট।'

'খায় ?'

'নিশ্চয়ই।'

'কেমন করে খেতে হয় ?' বলে দূরের জনতাকে দেখিয়ে টমিরা বলল, 'ব্লাডিগুলোকে জিজ্ঞেস করছি, কিছু বলছে না।'

অশোক বলল, 'ওরা ইংরেজি জানে না ; তাই তোমাদের কথা বুঝতে পারে নি।'

'গ্যাট মে বী—'

এবার কাঁঠালটা ভেঙে খাওযাব কায়দা দেখিযে দিল অশোক। একটা করে কোয়া মুখে পুরতে যেই স্বাদটা টের পাওয়া গেল আর যাবে কোথায় ? দুই টমি চার হাতে কোয়া খুলে টপাটপ খেতে লাগল। খাওয়াটা সত্যিই দর্শনীয়। নিশ্বাস ফেলার যেন সময় নেই। বিচিসুদ্ধ কোয়াগুলো মুখে পুরে চিবোতে চিবোতেই বিচিগুলো গালের পাশ দিয়ে বার করে দিচ্ছে।

দেখতে দেখতে কাঁঠালটা শেষ হয়ে গেল, পড়ে রইল মাঝখানের মোটা বোথা আর কর্কশ কাঁটাওলা ছালটা।

খাওয়া তো হল। তারপরেই দেখা দিল আরেক সমস্যা। কাঁঠালের আঠায় হাত-মুখ, গাল-গলা, নাক-ভুরু, এমন কি জামা পর্যন্ত মাখামাখি হয়ে গেছে। টমিরা যতই ঘষে ঘষে তুলতে চাইছে ততই আঠা লেপ্টে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত বিব্রত হয়ে আবার অশোকের শরণ নিল তারা, 'এ গায়—'

অশোক বলল, 'ইয়েস—'

'ব্লাডি আঠা তো তুলতে পারছি না।'

অশোক চৌখস ছেলে। বিনুদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শালাদের ট্যাঁক কিছু খসাচ্ছি।' তারপর থেমে থেমে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে টমিদের উদ্দেশে বলল, 'আঠা তুলে দিতে পারি ; পাঁচ টাকা লাগবে।'

'ও, ইয়েস—' হিপ পকেট থেকে এক মুঠো রেজগি আর নোট বার করে একটা টমি অশোকের হাতে দিল, গুনল না পর্যন্ত।

অশোক অবশ্য গুনল—প্রায় সাত টাকার মতন। টাকাটা পেয়েই সে

বিনুকে বলল, 'তোমাদের বাড়ি তো কাছে। শিশিতে করে সরষের তেল নিয়ে এসো তো। একটু বেশি করেই এনো।'

সরষের তেল এলে তিন বন্ধু ডলে ডলে টমিদের গা থেকে কাঁঠালের আঠা তুলে ফেলল।

টমি দুটো বেজায় খুশী। মাথা নেড়ে নেড়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ, কাম অন—' বলে তিনজনের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে কাঁধের জোড় প্রায় আলগা করে ফেলল।

উচ্ছ্বাস খানিকটা স্তিমিত হলে টমি দুটো বলল, 'সিট ডাউন। তোমাদের সঙ্গে গল্প করি।'

বিনুরা বসল।

দুই টমি জড়ানো জড়ানো উচ্চারণে কত কথা যে বলতে লাগল। ক্লাস নাইনের ইংরেজি বিদ্যেয় তার সামান্যই বুঝতে পারল বিনু; বেশিটা দুর্বোধ্য থেকে গেল। অশোক অবশ্য টমিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানে 'ইয়েস' 'নো' করে যেতে লাগল। তবে একটা কথা জানা গেল, রাজদিয়া আসার আগে টমি দুটো কলকাতায় ছিল।

অনেকক্ষণ গল্পটল্প করার পর একটা টমি হঠাৎ বলে উঠল, 'হেঃ গায়—'

অশোক জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, 'ইয়েস—'

একটি চোখ কুঁচকে আরেকটা চোখ ইঙ্গিতপূর্ণ করে চাপা গলায় টমিটা বলল, 'বিবি হাউস মালুম?' কলকাতায় থাকার ফলস্বরূপ দু-চারটে হিন্দী শব্দও তারা শিখে এসেছে।

একটু ভেবে অশোক বলল, 'ইয়েস—'

'ইউ গুড গায়। আমাদের নিয়ে চল—'

'টেন রুপীজ—' অশোক বলল। অর্থাৎ দশটি টাকা দিলে, তবেই 'বিবি হাউসে'র দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিয়ে আসবে।

'ইয়া-ইয়া—' হিপ পকেট থেকে আবার এক মুঠো নোট-টোট বার করে অশোককে দিল টমিটা।

'বিবি হাউসে'র ব্যাপারে টমি দুটোর প্রচণ্ড উৎসাহ। টাকা দিয়েই লাফ দিয়ে উঠে পড়েছে তারা এবং অশোকের হাত ধরে টানাটানি শুরু করেছে।

অগত্যা অশোকদের উঠতেই হল। এই সময় বিনু অশোকের কানে ফিস-ফিস করে বলল, 'বিবি হাউস কী?'

অবাক চোখে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অশোক বলল, 'জানো না!'

'না।' বিনু বিমূঢ়ের মতন মাথা নাড়ল।

অশোক বলল, 'পরে বলব।' তারপর আঙুল কামড়াতে কামড়াতে গলাটা নামিয়ে দিল, 'বিবি হাউসে'র নাম করে তো দশ টাকা আদায় করলাম। এখন ব্যাটাদের কোথায় নিয়ে যাই?'

তারপরেই কী মনে পড়তে তার চোখের তারা নেচে উঠল, 'হয়েছে—'

বিনু শুধলো, 'কী?'

'ব্যাটাদের এক জায়গায় নিয়ে যাব।'

'কোথায়?'

'চলই না। গেলেই বুঝতে পারবে।'

অশোক টমিদের নিয়ে দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরল।

পুলের তলায় জনতা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। মাঝবয়েসী সেই মুসলমানটি ভিড়ের মধ্য থেকে বলে উঠল, 'বাবু কাঠলের আঠা তোলনের লেইগা কত নিলেন?'

অশোক বলল, 'সাত টাকা।'

'তাহলে এক কাঠল খাইতে এগার ট্যাকা লাইগা গেল।'

উত্তর না দিয়ে অশোক হাসল।

লোকটা আবার শুধলো, 'সৈন্য দুইটা আরো টাকা দিল না আপনেরে?'

দ্বিতীয়বার টাকা দেওয়াও সে তা হলে লক্ষ্য করেছে। ব্যাপারটা স্বীকার করতেই হল অশোককে।

মাঝবয়েসী চাষীটা বলল, 'এই ট্যাকাটা পাইলেন কোন্ খাতে?'

খানিক চিন্তা করে অশোক বলল, 'সে তোমাকে পরে বলব।'

'অহন অগো নিয়া চললেন কই?'

'শ্বশুরবাড়ি দেখাতে।'

দক্ষিণ দিকে খানিকটা যাবার পর অশোকরা পুবে ঘুরল। তারপর কোণাকুণি কিছুক্ষণ হেঁটে বাংলো মতন একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাইরে থেকেই অশোক বলল, 'যাও, ভেতরে যাও—' বলেই পেছন ফিরে বিনুদের নিয়ে ছুট। মুহূর্তে এর রান্নাঘর, ওর বাগান, তার ঢেঁকিঘরের ওপর দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

বিনুরা থামল একেবারে তাদের পুকুরপাড়ে এসে। ঘাটে গা ঘেঁষাঘেষি করে বসে তিনজন অনেকক্ষণ হাঁপাল।

তারপর বিনু বলল, 'যেখানে টমি দুটোকে দিয়ে এলে ওটা তো পুলিসের বড়সাহেব মিস্টার রজার্সের বাড়ি—'

যেন বিরাট এক কীর্তি করেছে ; ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে কায়দা করে কিছুক্ষণ হাসল অশোক। তারপর বলল, 'ইচ্ছে করেই তো দিয়ে এলাম। একটু পর খোঁজ নিলে জানতে পারবে বাছাধনদের হাড়-মাংস আলাদা করে রজার্স সাহেব মিলিটারি পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছে। উল্লুকরা বাঙলা দেশে এসে 'বিবি হাউস' খুঁজছে!'

চকিতে সেই কথাটা মনে পড়ে গেল বিনুর। বলল, 'বিবি হাউস মানে কী, বললে না তো?'

কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কী বলল অশোক। শুনতে শুনতে নাকমুখ ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল বিনুর। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

কলকতা থেকে জ্ঞানবৃক্ষের অনেক ফল নিয়ে এসেছে অশোক ; একটা একটা করে বিনুকে খাওয়াতে শুরু করেছে সে।

॥ ত্রিশ ॥

দিনকয়েক পরের কথা

বিকেলবেলা স্কুল থেকে ফিরছিল বিনুরা। স্টিমারঘাটের সামনে অসতেই চোখে পড়ল একটা পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকানে ভিড় জমেছে।

কৌতূহলের বশে বড় বড় পা ফেলে কাছে আসতেই বিনুরা দেখতে পেল একটা টমি একের পর এক সিগারেটের প্যাকেট কিনছে ; তারপর সেগুলো খুলে হরির লুটের মতন ছড়িয়ে দিচ্ছে।

চারপাশের মানুষগুলো যেন চোখমুখ শানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ; সিগারেট ছড়ালেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

বিনুরা একপাশে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল।

হঠাৎ টমিটার চোখ বোঁ করে ঘুরে এসে পড়ল বিনুদের ওপর। দেখেই বোঝা গেল, মদে চুর হয়ে আছে সে। তারই মধ্যে হিপ পকেট থেকে চ্যাপ্টা বোতল বার করে মাঝে মাঝে গলায় ঢালছে।

আচমকা টমিটা চেঁচিয়ে উঠল, 'ইউ ব্লাডি সোয়াইন—'

বিনুরা ভয় পেয়ে গেল।

টমিটা ছুটে এসে অশোকের কলার চেপে ধরে চেঁচাল, 'ইউ আর স্ট্যাণ্ডিং—

অমন যে তুখোড় ছেলে অশোক, সে-ও একেবারে তোতলা হয়ে গেল, 'ইয়ে-এ-এ-এস স্যার—'

'ওয়াই ?'

'ফর নাথিং সায়েব, ফর নাথিং —'

টমি গর্জে উঠল, 'নো—'

মাতালটা ঠিক কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল অশোক। ভয়ে তার হাত-পা কাঁপতে লাগল; চোখের তারা যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

হঠাৎ টমিটা ধাক্কা দিয়ে অশোককে দশ হাত দূরে সরিয়ে দিল। তারপর সিগারেট কিনে ছড়াতে ছড়াতে বলল, 'টেক-টেক--'

এতক্ষণে বোঝা গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখলে চলবে না; সবার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে হরির লুটের সিগারেট নিতে হবে। কি আর করা, সিগারেট কুড়োতেই হল।

বিনু আর শ্যামল দাঁড়িয়ে ছি-। টমির ভয়ে তাদেরও সিগারেট কুড়োতে হল। কুড়িয়েই যদি মুক্তি পাওয়া যেত! দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে টমিটা চিৎকার করল, 'ইউ ব্লাডি—স্মোক।'

বিনু ভাবল, একদিন আশু দত্ত রুস্তম আর পতিতপাবনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এই নদীর পাড়ে স্টিমারঘাটের আশে-পাশে এমন কেউ নেই যে তাকে বাঁচাতে পারে।

সিগারেট খাওয়ার কথা ভাবাই যায় না। গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল বিনুর; হাতের আঙুলগুলো থরথর করছিল। মনে হচ্ছিল, মাথাটাথা ঘুরে পড়েই যাবে।

টমির আরেকটা হুঙ্কারে সিগারেট ধরিয়ে টান লাগাল বিনু।

সেই যে একটা নিষিদ্ধ রাজ্যের দরজা খুলে গিয়েছিল তারপর থেকে নদীর পাড়ে ঝাউবনের ভেতর ঢুকে দুই বন্ধুর সঙ্গে সিগারেট খেতে লাগল বিনু। সিগারেট টমিরাই বেশি যোগাত, মাঝে মাঝে তারা নিজেরাও কিনত।

এ ব্যাপারে ভয় আছে, পাছে কেউ দেখে ফেলে। তবু লুকিয়ে লুকিয়ে নিষিদ্ধ কিছু করার ভেতর বিচিত্র এক উত্তেজনাও রয়েছে। সিগারেট টানতে

টানতে বিনুর মনে হতে লাগল, সে যেন আর বাচ্চাদের দলে নেই ; সিগারেটের ধোঁয়ায় চড়ে হঠাৎ অনেক বড় হয়ে গেছে।

সিগারেট খেয়ে চোরের মতন বাড়ি ফেরে বিনু। চনমন করে সবাইকে লক্ষ্য করে ; সহজে কারো কাছে ঘেঁষতে চায় না। তার আশঙ্কা এই বুঝি তার মুখ থেকে কেউ সিগারেটের গন্ধ পেল।

মোটামুটি এইভাবেই চলছিল।

হঠাৎ এক ছুটির দিনের বিকেলবেলা বিনু বেরুচ্ছে, ঝিনুক কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, 'বেড়াতে যাচ্ছ ?'

শ্যামল আর অশোক স্টিমারঘাটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে। বিনু সংক্ষেপে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ—' দিয়েই ব্যস্তভাবে উঠোনে নেমে গেল।

পেছন থেকে ঝিনুক ডাকল, 'বিনুদা—'

বেরুবার মুখে বাধা পড়ায় বিনু বিরক্ত। পেছন ফিরে রুক্ষ গলায় বলল, 'কী বলছ ?'

'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'পরে শুনব।'

'না, এক্ষুনি।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে ঝিনুকের কাছে ফিরে এল বিনু। চোখটোখ কুঁচকে বলল, 'কী বলবে, তাড়াতাড়ি বল—'

ঝিনুক হাসল, 'অত তাড়া কেন ? বন্ধুরা বুঝি দাঁড়িয়ে আছে ?'

শ্যামল আর অশোক যে তার সবসময়ের সঙ্গী, এ কথা জানতে আর কারো বাকি নেই। বিনু কিছু বলল না ; তার চোখ আরো কুঁচকে যেতে লাগল।

ঝিনুক একটু ভেবে বলল, 'তুমি আজকাল একটা জিনিস খাচ্ছ ?'

'কী ?'

'তুমিই বল না—'

'বুঝতে পারছি না।'

চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে খুব চাপা গলায় ঝিনুক বলল, 'সিগারেট।'

পলকে মুখখানা একেবারে কাগজের মতন সাদা হয়ে গেল। ভাল করে কথা বলতে পারল না বিনু। তোতলাতে তোতলাতে কোনরকমে বলল, 'কে বললে ? মিথ্যে কথা।'

তার চোখে চোখ রেখে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝিনুক বলল, 'মিথ্যে কথা ?'

'নিশ্চয়ই—' বিনু খুব জোর দিয়ে বলতে চাইল বটে, গলার ভেতর থেকে সরু দুর্বল একটা আওয়াজ বেরুল মাত্র।

'তা হলে তোমার পকেট থেকে সিগারেট বেরুল কেমন করে?'

'আমার পকেট থেকে!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই।'

বিনু কিছু বলতে চেষ্টা করল; পারল না। তার বুকের ভেতরটা ঢাকের আওয়াজের মতন গুরগুর করতে লাগল।

ঝিনুক আবার বলল, 'ধোপাবাড়ি পাঠাবার জন্যে মাসিমা আমাকে তোমার ময়লা জামা-টামা আনতে বলেছিল। পকেট-টকেটগুলো দেখে নিচ্ছিলাম, যদি পয়সাকড়ি কিছু থাকে। পয়সার বদলে ও মা, একেবারে সাপ বেরিয়ে পড়ল—'

বিনুর এবার মনে পড়ে গেল, সেদিন টমিদের কাছ থেকে অনেকগুলো সিগারেট যোগাড় করেছিল। ঝাউবনে বসে কয়েকটা টেনেছিল; ক'টা রেখেছিল পকেটে। ভেবেছিল, পরে ফেলে দেবে। অসাবধানে ফেলে দিতে ভুলে গেছে।

শ্বাস আটকে আসছিল বিনুর। নাকের ডগাটা ঝিঁ ঝিঁ করছিল। সমস্ত শরীর যেন অসাড় হয়ে আসছে। কোনরকমে সে বলতে পারল, 'মাকে সিগারেট দেখিয়েছ নাকি?'

আস্তে মাথা হেলিয়ে দিল ঝিনুক, 'হুঁ—'

বিনুর হৃৎপিণ্ডটা লাফ দিয়ে গলার কাছে উঠে এল যেন, 'সত্যি!'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ঝিনুক। তারপর মাথাটা ধীরে ধীরে দু'ধারে নাড়ল। অর্থাৎ বলেনি।

'সত্যি বলছ?'

'সত্যি।'

'আমাকে ছুঁয়ে বল।'

বিনুর গায়ে আঙুল ঠেকিয়ে ঝিনুক বলল, 'হল তো?'

এতক্ষণে সহজভাবে শ্বাস টানতে পারল বিনু। একটু হেসে বলল, 'বাঁচালে।'

'এই প্রথম, এই শেষ। এর পর খেলে আর বাঁচাব না; ঠিক মাসিমাকে বলে দেব।'

'আর খাবই না।'

'শ্যামলদা আর অশোকদার সঙ্গে মিশে মিশে তুমি খুব খারাপ ছেলে হয়ে যাচ্ছ।'

বিনু এ কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'সিগারেটগুলো কোথায় ?'

ঝিনুক বলল, আমার কাছে।'

বিনু মুখ কাঁচুমাচু করে অনুনয়ের গলায় বলল, 'আমাকে দিয়ে দাও না—'

ঝিনুক বললে, 'উঁহু—'

'দাও না, দাও না—'

'না। ওগুলো আমার কাছে থাকবে।'

'সিগারেট দিয়ে তুমি কী করবে ?'

'তুমি যদি আমার কথা না শোন, মাসিমাকে-দাদুকে-দিদাকে সবাইকে দেখাব।'

কি সাংঘাতিক মেয়ে ! বিনুর মনে পড়ল, ঝুমার সঙ্গে কাউফল পাড়তে গিয়ে মাঠের জলে ডুবে গিয়েছিল। সেই কথাটা মাকে বলে দেবে—এই ভয় দেখিয়ে অনেকদিন ঝিনুক তাকে অস্থির করে রেখেছে ; এক মুহূর্তও সুখে থাকতে দ্যায় নি।

জলে ডোবার ব্যাপারটা মলিন হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে সিগারেট বেরুল। আর কি আশ্চর্য, যত কুকীর্তি সবই কিনা ঝিনুকের হাতে ধরা পড়ছে ! ভাগ্যিস ঝিনুক ধরেছে। অন্য কারো হাতে পড়লে কী যে হত ! ভাবতে সাহস হয় না বিনুর।

যাই হোক বিনু আর পীড়াপীড়ি করল না। শুধু বলল, 'সিগারেটগুলো একটু লুকিয়ে রেখো ; কেউ যেন দেখে না ফ্যালে।'

'সে তোমাকে বলতে হবে না। এমন জায়গায় রেখেছি, কারো সাধ্যি নেই খুঁজে পায়।'

একটু চুপ করে থেকে বিনু বলল, 'আমি তা হলে এখন যাই।'

আস্তে আস্তে মাথা ঝাকালো ঝিনুক, 'উঁহু—' এভাবে মাথা ঝাকানো তার কতকালের অভ্যাস।

'যাব না তো, এখন কী করব ?'

'আমার সঙ্গে ক্যারম খেলবে।'

নদীর পাড়ে ঝাউবনে কি স্টিমারঘাটায় কি মিলিটারি ব্যারাকে কোথায় অশোকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে, তা নয়। শুধু বাড়িতে বসে থাকো। করুণ গলায় বিনু বলল, 'ক্যারম !'

'হ্যাঁ। নতুন বন্ধু পেয়ে আজকাল বাড়িই থাকো না। এখন আমার সঙ্গে খেলতেই হবে।'

জলে ডোবার পর এই নতুন এক অস্ত্র পেয়ে গেছে ঝিনুক। নাঃ, মেয়েটার হাত থেকে কোনদিনই মুক্তি নেই।

বিষণ্ণ মুখে ক্যারম খেলতে বসে গেল বিনু।

॥ একত্রিশ ॥

ঝিনুকের কাছে ধরা পড়বার পর অশোকদের এড়িয়ে চলতে লাগল বিনু। আজকাল টিফিনের সময় তাদের ফাঁকি দিয়ে স্কুলের পেছন দিকের সোনাল ঝোপে গিয়ে একা একা বসে থাকে। ছুটি হলেই চোখ কান বুজে বাড়ির দিকে ছোটে।

কিন্তু ক'দিন আর। একদিন ছুটির পর চারদিক দেখে ছুটতে যাবে তার আগেই অশোকরা ধরে ফেলল।

শ্যামল বলল, 'কি ভাই, আজকাল যে আমাদের সঙ্গে মিশতেই চাও না।'

বিনু আবছা গলায় বলল, 'না, মানে পরীক্ষা এসে গেল। তাই—'

চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অশোক বলল, 'হঠাৎ গুড বয় হয়ে গেলে যে! পরীক্ষা বুঝি আমাদের নেই?'

'না, মানে—'

'বার বার মানে মানে কী করছ? এসো—'

'কোথায়?'

'বা রে, তুমি দেখছি এ ক'দিনে সব ভুলে গেছ! ছুটির পর আমরা যেখানে যাই সেখানেই যাব। স্টিমারঘাটে, টমিদের ব্যারাকে, ঝাউবনে—'

তীব্র আকর্ষণও বোধ করছিল বিনু, আবার ভয়ও লাগছিল। শেষ পর্যন্ত ভয়ের দিকটাই ভারী হয়ে দাঁড়াল। বিনু বলল, 'তোমরাই যাও ভাই, আমার বাড়িতে একটু কাজ আছে।'

'কোন কাজ নেই।'

জোর করে বিনুকে টানতে টানতে অশোকরা ঝাউবনে নিয়ে গেল। গাছের আড়ালে বসে অশোক পকেট থেকে সিগারেট বার করল।

দেখেই বিনু হাত নেড়ে ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমি কিন্তু ভাই সিগারেট খাব না।'

'কেন ?'

ঝিনুকের কাছে যে ধরা পড়ে গেছে তা আর জানাল না বিনু। শুধু বলল, 'এমনি।'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আঙুলের ডগায় বিনুর থুতনিটা নাড়তে লাগল অশোক। ঠাট্টার গলায় বলল, 'সিগারেট তো খাবে না, তা হলে কী খাবে? দুধ? কচি খোকা।' বলতে বলতে একটা সিগারেট বিনুর ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে ফস করে দেশলাই ধরাল।

কয়েক দিনের জন্য ঝিনুক বিনুকে ফিরিয়েছিল ঠিকই কিন্তু অশোকদের টান এত প্রবল, নিষিদ্ধ দেশের আকর্ষণ এত তীব্র যে আবার সে ভেসে যেতে লাগল।

অশোকদের সঙ্গে আবার ঘুরতে শুরু করেছে বিনু; আবার লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খাচ্ছে। যুদ্ধ লাগবার পর পূর্ববাঙলার হৃদয়ের গভীরে লুকনো এই মায়াবী রাজদিয়াকে ঘিরে যে উদ্‌ভ্রান্ত ঘূর্ণি ঘুরে চলেছে তা যেন হাজার হাতে তাকে টানতে লাগল। বিনুকে ফেরাতে পারে তেমন শক্তি ঝিনুকের ক্ষুদ্র দুর্বল বাহুতে নেই।

অশোকদের পাল্লায় পড়ে সিগারেট টানে বটে তবে আগের চাইতে অনেক বেশি সাবধান হয়ে গেছে বিনু। বাড়ি ফেরার সময় ভাল করে পেয়ারা পাতা চিবিয়ে নেয়, যাতে মুখে গন্ধ না থাকে। পকেট-টকেটগুলো অনেকবার করে দেখে নেয়।

মোটামুটি এইরকম চলছিল।

হঠাৎ একদিন অঘটন ঘটে গেল। সেদিন আর ঝাউবনে বসে সিগারেট খাচ্ছিল না বিনুরা। সাহস দেখাবার জন্য বড় রাস্তা দিয়ে তিন বন্ধু বুক ফুলিয়ে হাঁটছিল; তাদের ঠোঁটের একধারে সিগারেট। ভাবখানা এই, কারোকে পরোয়া করি না।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যখন তারা আদালতপাড়ার কাছে এসেছে, সেই সময় বিনু টের পেল একটা কর্কশ শক্ত হাত তার কানে সাঁড়াশির মতন চেপে বসেছে।

চমকে পেছনে ফিরতেই বিনু দেখতে পেল, মজিদ মিঞা। মুখ থেকে সব রক্ত যেন নিমেষে নেমে গেল; ঠোঁট থেকে সিগারেট খসে পড়ল। ভয়ে চোখের তারা স্থির; হাত-পা একেবারে জমে গেছে।

মজিদ মিঞাকে চেনে না অশোক। একটি অপরিরিচিত মুসলমানকে বিনুর কান ধরতে দেখে প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল সে; তারপরেই রুখে উঠল, 'আপনি ওর কান ধরছেন যে?'

মজিদ মিঞা বলল, 'বেশ করছি।'

'আপনি কি ওর গার্জেন?'

'গার্জেন-গুর্জেন, ঐ সগল এংরাজি বুঝি না। অর কানটা যদি ছিড়াও ফালাই কেউ কিছু কইব না। কানটা তো পরথমে ছিড়ুমই, হের (তার) পর ভাইবা দেখুম, আর কী করণ দরকার—' বলে বিনুর কানে প্রচণ্ড এক মোচড় দিল মজিদ মিঞা।

অশোক এবার ধমকের গলায় বলল, 'ভাল চান তো শিগ্‌গির ওর কান ছেড়ে দিন।'

'ছ্যামরা তর কথায় নিহি?'

'হ্যাঁ, আমারই কথায়।'

'মোচের র‍্যাখ (রেখা) পড়ে নাই, গলায় টিফি দিলে (টিপলে) মায়ের দুধ উইঠা আইব। ওই বয়সে সিক্রেট খাও, আবার চোখ লাল কর। র' ছ্যামরা, তরে দেখাই।' বিনুর কানটা ডান হাতে ধরা ছিল; বাঁ হাত দিয়ে ঠাস করে অশোকের গালে এক চড় কষিয়ে দিল মজিদ মিঞা। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় ঘুরে পড়ল অশোক।

মজিদ মিঞা একাই ছিল না; তার সঙ্গে একটা লোকও ছিল। অশোক পড়ে যেতেই মজিদ মিঞা সঙ্গীকে বলল, 'ধর্ তো ছ্যামরারে, কত বড় বান্দর (বাঁদর) হইছে একবার দেখি।'

মজিদ মিঞার মুখ থেকে কথা খসবার আগেই লোকটা বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে অশোককে ধরে ফেলল। ব্যাপার সুবিধের নয় বুঝে শ্যামল এই সময় উর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল।

পেছন থেকে মজিদ মিঞা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'তোমারে আমি চিনি বাসী, তৈলোক্য স্যানের নাতি তুমি। লৌরাইয়া (দৌড়ে) পলাইবা কই; যাইতে আছি তোমাগো বাড়িত্।'

এদিকে অশোককে টানতে টানতে সেই লোকটা সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। মজিদ মিঞা তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কাগো বাড়ির পোলা তুমি?'

অশোকের অবস্থা অবর্ণনীয়। এত যে তুখোড় সে, এত চৌখস, চোখে-মুখে

যার কথার খই ফোটে, একটু আগেও যে রুখে রুখে উঠছিল, এখন তার ঠোঁট কাঁপছে, চোখ জলে ভরে গেছে।

মজিদ মিঞা ধমকে উঠল, 'কী হইল, মুখ দিয়া দেখি রাও (শব্দ) বাইর হয় না।'

কাঁদো কাঁদো মুখে অশোক বলল, 'আর কক্ষনো করব না।'

'কান্‌তে (কাঁদতে) আরম্ভ করলা দেখি। গজ্জন-তজ্জন গেল কই? কান্দনে আমি ভুলুম না। কোন্ বাড়ির পোলা আগে কও—না কইলে কিলাম ল্যাঠা আছে।'

ভয়ে ভয়ে অশোক এবার বলল, 'রুদ্রবাড়ির—'

'তোমার বাপের নাম কী?'

'অনন্তকুমার রুদ্র।'

হঠাৎ বেগে গেল মজিদ মিঞা। অশোকের গালের কাছে চড় নিয়ে এসে চিৎকার করে উঠল, 'হারামজাদা, বাপেরে সোম্মান দিতে জান না! নামের আগে শিরিযুক্ত বাবু বসাইতে মানে লাগে!'

মুখ নামিয়ে চুপ করে রইল অশোক।

মজিদ মিঞা এবার তার সঙ্গীকে বলল, 'কাশমা, তুই ঐ ছ্যামরারে রুদ্রবাড়ি লইয়া যা। আমি হ্যামকত্তার বাড়িত্ থনে আইতে আছি।'

কাশমা অর্থাৎ কাশেম অশোককে নিয়ে চলে গেল। আর মজিদ মিঞা বড় রাস্তার ওপর দিয়ে বিনুর কান ধরে বাড়ি নিয়ে এল। তার এমন ভয়ানক চেহারা আগে আর কখনও দেখেনি বিনু।

হেমনাথ, অবনীমোহন, স্নেহলতা, সুরমা, সবাই বাড়িতেই ছিলেন। মজিদ মিঞা আর বিনুকে এভাবে আসতে দেখে তাঁরা উদ্বিগ্ন মুখে বেরিয়ে এলেন।

হেমনাথ শুধোলেন, 'কী হয়েছে রে মজিদ?'

সংক্ষেপে সব ঘটনা বলে গেল মজিদ মিঞা। শুনতে শুনতে অবনীমোহন, সুরমা এবং স্নেহলতার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল। অবনীমোহন মাথায় হাত দিয়ে সেখানেই বসে পড়লেন। স্নেহলতা আর সুরমা কিছু বলতে চেষ্টা করলেন, গলা দিয়ে তাঁদের স্বর বেরুল না। সুধা-সুনীতি ফিসফিস করে নিজেদের ভেতর কী বলাবলি করতে লাগল। আর স্তব্ধ মূর্তির মতন একধারে দাঁড়িয়ে রইল ঝিনুক।

হেমনাথ একদৃষ্টে পলকহীন তাকিয়ে ছিলেন। কথাটা যেন তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। অনেকক্ষণ পর আস্তে করে বললেন, 'বলিস কী।'

'হ হ্যামকত্তা। এইর এট্টা বিহিত করেন।' মজিদ মিঞা বলতে লাগল, 'অহনও সময় আছে। পোলা চৌখের সামনে নষ্ট হইয়া যাইব, এ আমি সইতে পারুম না।'

হেমনাথ হঠাৎ রেগে উঠলেন, 'বিহিতের জন্যে আমার কাছে ধরে এনেছিস! কেন, নিজে শাসন করতে পার নি? তুমি ওর কেউ হও না?'

অবনীমোহন এই প্রথম কথা বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আপনি যা ভাল বোঝেন করুন। আমি তো ভাবতেই পারি না, ছেলেটা এত বড় উল্লুক হয়ে উঠেছে!'

মজিদ মিঞা আবেগের গলায় বলল, 'হ, আমারই শাসন করা উচিত আছিল। আমি পরের লাখান (মতন) কাম করছি, এইবার আপন মাইন্ষের লাখান কাম্ করি।' বলে উঠোনের একধার একটা খুঁটির সঙ্গে বিনুকে কষে বাঁধল। তারপর কোত্থেকে একটা কাঠের লম্বামতন টুকরো যোগাড় করে এনে সমানে মারতে লাগল।

একেকটা ঘা পড়েছে আর চামড়া ফেটে ফেটে রক্ত ছুটছে। বিনু আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল, 'আমাকে মেরে ফেলল, আমাকে মেরে ফেলল। আর কক্ষনো ওকাজ করব না।'

দেখাদেখি ঝিনুকও কান্না জুড়ে দিল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, বিনুদাদাকে মেরে ফেললে গো—'

স্নেহলতাও ঝিনুকের সঙ্গে সুর ধরলেন, 'মজিদ আর ওকে মেরো না।'

অবনীমোহন বললেন, 'মারুন আপনি, মেরে শেষ করে দিন। এরকম ছেলের দরকার নেই আমার।'

সুরমাও তা-ই বললেন। হেমনাথ উঠে গিয়ে স্নেহলতা আর ঝিনুককে রান্নাঘরে দিয়ে এলেন।

একসময় মেরেটেরে মজিদ মিঞা চলে গেল।

মারের চোটে কত জায়গায় যে কেটে গেছে, হাত-পায়ের আর কিছু নেই; ফুলে ঢুমো ঢুমো হয়ে উঠেছে; রক্ত জমাট বেঁধে কালশিরাও পড়েছে অনেক। ব্যথার তাড়সে সন্ধ্যেবেলায় জ্বর এসে গেল বিনুর—ধুম জ্বর।

জ্বর আসার খানিকক্ষণ পর হাঁড়িভর্তি রসগোল্লা, মোহনবাঁশি কলার ছড়া আর একটা নতুন ফুটবল নিয়ে আবার এল মজিদ মিঞা। বাড়িতে পা দিয়েই বিনুর খোঁজ করল।

হেমনাথ বললেন, 'ওর জ্বর এসেছে।'

'জ্বর!' মজিদ মিঞা চমকে উঠল, 'বিনু কই?'

'পুবের ঘরে শুয়ে আছে।'

পাগলের মতন ছুটে পুবের ঘরে গিয়ে ঢুকল মজিদ মিঞা। তারপর বিনুর মাথার কাছে ফুটবল, মিষ্টির হাঁড়িটাড়ি রেখে তার সারা গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে কাঁদতে লাগল, 'অয় রে কী পাষাণ পরান আমার; দুধের শিশুরে মাইরা ফেললাম—'

কিছুক্ষণ হাত বুলোবার পর মজিদ মিঞা চলে গেল। ঘণ্টাখানেক পর লারমোরকে নিয়ে আবার এসে হাজির হল। বলল, 'দ্যাখেন লালমোহন সায়েব, পোলায় নি আমার বাঁচব!' বলে তার কী কান্না।

অবনীমোহন হেমনাথ যত বোঝান, 'জ্বর হয়েছে, সেরে যাবে—' মজিদ মিঞা শোনে না। তার কান্না বাড়তেই লাগল, 'অয় রে কী পাষাণ পরান আমার—'

সারা রাত বিনুর শিয়রে জেগে বসে থাকল মজিদ মিঞা।

*   *   *

এরই ভেতর একদিন ঢাকা ইউনিভার্সিটির এম-এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়ে গেল। যা আশা করা গিয়েছিল, তা-ই হল। হিরণ ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছে।

কলেজের চাকরি ঠিক হয়েই ছিল। রেজাল্ট বেরুবার পরই রাজদিয়া এসে প্রফেসারি নিল হিরণ।

॥ বত্রিশ ॥

জ্বর ছাড়ার পর অবনীমোহনের সঙ্গে একদিন সুনামগঞ্জের হাটে গেল বিনু। হেমনাথ আসেন নি। ক'দিন ধরে তাঁর জ্বর; একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। বিনু সেরে উঠবার পরই তিনি জ্বরে পড়েছেন।

দু বছর হল বিনুরা রাজদিয়া এসেছে। এই প্রথম হেমনাথকে সে অসুস্থ হতে দেখল।

যাই হোক হাটে পা দিতেই বিনুদের কানে এল, সুজনগঞ্জের হাটে চাল পাওয়া যাচ্ছে না। এতবড় একটা গঞ্জ, যেখানে ফি হাটে কম করে পাঁচ-দশ হাজার মণ ধান-চাল বিকিকিনি হয় সেখানে একদানা শস্যও নেই। নদীর ধার ঘেঁষে সারি সারি আড়তগুলোতে তালা ঝুলছে। পুব দিকে হাটুরে চালার তলায় চারপাশের গ্রাম থেকে চাষীরা ঘরে ভানা চাল এনে বসত। চালাগুলো আজ ফাঁকা।

চাল নেই, চাল নেই।

তামাকহাটা, বেগুনহাটা, মরিচহাটা, নৌকোহাটা—যেখানেই বিনুরা যাচ্ছে ভীত সন্ত্রস্ত গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছে।

'হায় আল্লা, বাজারে চাউল নাই। নিজেরা খাই কী? পোলাপানরে বাচাই কেমনে?'

'হে ভগবান, অদ্দিষ্টে কী যে আছে!'

বিনুরা দেখতে পেল, হাটের নানা জায়গায় থোকা থোকা ভিড় জমেছে। সবাই ভয়ার্ত, বিহ্বল, দিশেহারা। চাল ছাড়া আজ আর কেউ কোন কথা বলছে না।

ঘুরতে ঘুরতে বেগুন-ব্যাপারী গয়জদ্দির সঙ্গে দেখা। সে বলল, 'হাটে কুন্ সময় (কখন) আইলেন জামাই কত্তা?'

অবনীমোহন বললেন, 'একটু আগে।'

'খপর শুনছেন?'

'হ্যাঁ, শুনলাম।'

'পঞ্চাশ ষাইট বছর বয়স হইল, চাউলের এমুন আকাল আগে আর দেখি নাই। ঘরে এক পাসারি চাউল আছে; তিন ওক্ত কইরা খাইলে তিনদিনও চলব না। দুই ওক্ত কইরা খাইলে বড় জোর চাইর রোজ। হের (তার) পর কী যে করুম!'

অবাক হয়ে অবনীমোহন বললেন, 'তোমার ঘরে মোটে এক পাসারি চাল থাকবে কেন? তোমার না দশ কানি ধানের জমি!'

গয়জদ্দি কপালে চাপড় মেরে বলল, 'আর কইয়েন না জামাই কত্তা, বুদ্ধির দোষ আর লোভ। দুইয়ে পইড়া এইবার গুষ্টিশুদ্ধা মরলাম।'

'কি রকম?'

'ধান-চাউলের দর যখন চ্যাতনের (চড়বার) মুখে হেই সময় ঘরের বেবাক ধান-চাউল দিলাম বেইচা। টাকা হাতে পাইয়া মাথা গেল গরম হইয়া। চাষীর হাতে কাচা ট্যাকা; বুঝলেন কিনা জামাই কত্তা। বড় পোলারে সাদি দিলাম। সাদির পর পনের দিন ধইরা খাওয়ানের কি চোট! আত্ম-বান্দব মিলাইয়া চাল্লিশজন বাড়িত্ বইসা খাইল। রুজ (রোজ) মাছ। এইবেলা চিতল তো ঐ বেলা কাতল। তার উপর গোস্ত, মিষ্টান্ন, পাতক্ষীর। অন্য পোলারা কমলাঘাটের বড় গুঞ্জ থনে নয়া জোতা (জুতা) কিনা আনল, পিরহান কিনা আনল, টর্চ বাত্তি, লুঙ্গি, ফাণ্টার পেন (ফাউণ্টেন পেন), কত জিনিস যে কিনল! অহন ঘরে

চাউলও নাই, ট্যাকাও নাই। অথন খালি কপাল থাপড়াই আর পাছা থাপড়াই। সগলই বুদ্ধির দোষ।'

অবনীমোহনদের কথা বলতে দেখে আরো অনেকে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। যেমন মোতালেফ নিকারী, মনা ঘোষ, বৃন্দাবন ভুঁইমালী—এমনি পনের-কুড়িজন। তারাও একই কথা বলল। দর চড়তে দেখে অনেকই ধান-চাল ছেড়ে দিয়ে কাঁচা টাকা দু-হাতে উড়িয়ে দিয়েছে।

মনা ঘোষ বলল, 'চাউলের কী করণ? একখান বুদ্ধি ছান দেখি জামাই কত্তা—'

অবনীমোহন বললেন, 'কী বুদ্ধি দেব, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

বৃন্দাবন ভুঁইমালী বলল, 'সুজনগঞ্জে চাউল নাই। কাইল একবার মীরকাদিম, বেতকা, আউশ্‌শইতে (আউটশাহীতে) যামু। দেখি পাওয়া যায় কিনা—'

মোতালেফ নিকারী এই সময় বলে উঠল, 'কুনোখানে চাউল নাই। আমার বুইনের জামাই পরশু ঘুইরা আইছে।'

'তয়?'

'তয় আর কী; মরণ। একখান কথা শুনছ?'

'কী?'

'কাইল গিরিগুঞ্জের বাজারে দুইটা দোকান লুট হইছে।'

'নিহি!'

'হ।'

'জন্ম ইস্তক চাউল লুটের কথা আর শুনি নাই।'

'প্যাটের জ্বালায় মাইন্‌ষের মাথা কি ঠিক থাকে! লুটপাট তো হপায় (সবে) আরম্ভ হইল। ছাখ না, কী কাণ্ড হয়!'

'আরেকখান কথা শুনছ?'

'কী?'

'ভাটির ছাশে চাউল না পাইয়া মাইন্‌ষে শাক-পাতা খাইতে আছে।'

'কী যে হইব!'

কথায় কথায় দুপুর হয়ে গেল। এখন সূর্যটা মাথার ওপর। অবনীমোহন কি বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় বিষহরিতলার ওধারের মাঠ থেকে ঢাকের আওয়াজ ভেসে এল। চমকে বিনু দেখতে গেল, ঢেঁড়াদার হরিন্দ উঁচু প্যাকিং বাক্সের ওপর

দাঁড়িয়ে আছে। তার দুই চেলা কাগা-বগা সমানে ঢাক বাজিয়ে যাচ্ছে। এস-ডি-ও সাহেব একধারে চেয়ারে বসে আছেন ; একটা লোক তাঁর মাথায় ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে। চারপাশে অসংখ্য লাল পাগড়ি। নতুনত্বের ভেতর আজ কয়েকজন মিলিটারী অফিসারকে দেখা যাচ্ছে।

বিনু ফিসফিস করে বলল, 'বাবা মিলিটারি এসেছে।'

অবনীমোহন বললেন, 'হ্যাঁ।'

'আগে তো মিলিটারি দেখি নি।'

'তিন-চার হাট তুই আসিস নি, তাই জানিস না। আজকাল ফি হাটে মিলিটারি আসছে।'

'কেন ?'

'যুদ্ধের জন্যে লোক যোগাড় করছে। একে রিক্রুট করা বলে।'

বিনু আবদারের গলায় বলল, 'বাবা আমি রিক্রুট করা দেখব।'

খুব একটা ইচ্ছা ছিল না অবনীমোহনের। তবু ছেলে যখন ধরেছে তখন আর না বলতে পারলেন না। বললেন, 'চল্—'

বিষহরিতলার কাছে আসতে দেখা গেল, লারমোর ঝাঁকড়া বটগাছের তলায় যথারীতি তাঁর রুগীপত্তর নিয়ে বসে আছেন। এত যে ডামাডোল, আকাল, যুদ্ধ, সমস্ত জলবাঙলা জুড়ে যে এত দুর্ভিক্ষের দুর্ভাগ্যের ছায়া—সে সবের কোনদিকেই লক্ষ্য নেই তাঁর। বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় এক প্রশান্ত ধ্যানের ভেতর তিনি মগ্ন হয় আছেন।

বিষহরিতলা বায়ে ফেলে খোলা মাঠের কাছে আসতে দেখা গেল, ঢাকের বাজনা থেমে গেছে। এর ভেতর হাটের নানাদিক থেকে মানুষ গিয়ে সেখানে জমা হতে শুরু করেছে।

এস-ডি-ও সাহেব জমায়েতটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মোটামুটি শ'চার পাঁচেক লোক জমেছে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যারা সৈন্যদলে নাম লেখাবে তারা ডানদিকের ঐ ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াও।'

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন দুজন করে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে লাগল। বিনুর মনে পড়ল, তিন-চার সপ্তাহ আগে যখন সুজনগঞ্জের হাটে এসেছিল তখন রিক্রুটমেন্টের কথায় হাটুরে লোকেরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এক মাসেরও কম সময়ের ভেতর কী এমন ঘটল যাতে তাদের ভয় কেটে গেছে।

হঠাৎ বিনুর চোখে পড়ল, তার ঠিক পাশে খলিল, বছির, তাহের এবং আরো ক'জন চরের মুসলমান দাঁড়িয়ে আছে। ধানকাটার মরসুমে তারা হেমনাথের

বাড়ি আসে। কিছুদিন আগেও তাদের রাজদিয়ায় মাটি ভরাট এবং মিলিটারি ব্যারাক তৈরি করতে দেখা গেছে।

বছিরদের দেখে বিনু অবাক। বলল, 'তোমরা এখানে?'

বছরি বলল, 'যুজ্যে নাম লিখাইতে আইছি।'

'তোমরা যুদ্ধে যাবে!'

'হ।'

এই সময় অবনীমোহন তাদের দিকে ফিরলেন। বছিরদের শেষ কথাগুলো তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। বিস্ময়ের সুরে বললেন, 'যুদ্ধে যাবে কেন?'

বছির বলল, 'কাম কাইজ নাই। কিছু এট্টা তো করণ লাগব।'

বিনু বলে উঠল, 'কাজ নেই মানে! এই তো ক'দিন আগে মিলিটারিদের ওখানে মাটি কাটছিলে। ব্যারাক তৈরী করছিলে—'

'হে আর কয়দিনের কাম। শ্যাষ হইয়া গেছে।'

খানিক ভেবে অবনীমোহন বললেন, 'আর কোথাও কোন কাজ পেলে না!'

'না জামাইকত্তা—' বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল বছির, 'কুনোখানে কাম নাই। এই দিকে ধান-চাউল মিলে না। আগে চাষবাসের খন্দ গেলে মাইন্ষের বাড়িত কামলা খাটতাম। অহন কেউ কামলা নেয় না। উপাস দিয়া দিয়া আর পারি না জামাইকত্তা। পোলাপান মরতে বইছে।'

তাহের বলল, 'শুনছি, যুজ্যে গেলে প্যাটভরা খাওন মিলব; মাস মাস ট্যাকা পাওয়া যাইব। না খাইয়া মরার থনে যুজ্যে যাওন ভাল না?'

অবনীমোহন কী বলবেন, ভেবে পেলেন না।

তাহের আবার বলল, 'আমাগো চরের কেউ আর ঘরে বইসা থাকব না। সগলে যুজ্যে যাইব গিয়া।'

খলিল বলল, 'হুদা (শুধু) আমাগো চরের নিহি, চাইর দিকে যা আকাল লাগছে, হেয়াতে যাগো ঘরে চাউল আছে তারা ছাড়া বেবাক মাইন্ষে যুজ্যে যাইব। না গিয়া উপায় নাই জামাইকত্তা। নিজেরা না খাইয়া থাকে হে এক কথা। কিন্তুক চৌখের সামনে পোলামাইয়া প্যাটের জ্বালায় দাপাইয়া মরব, এ সয় না।'

অবনীমোহন অসহায়ের মতন তাকিয়ে থাকলেন। এবারও কিছু বলতে পারলেন না।

ওদিক থেকে একটা কনস্টেবলের গলা ভেসে এল, 'যারা যুজ্যে যাইবা, ঐ ধারে গিয়া লাইন দিয়া খাড়ও—যারা যুজ্যে যাইবা—'

প্রথমে এস-ডি-ও সাহেব যুদ্ধে যাবার ডাক দিয়েছিলেন। এখন তাঁর প্রতিভূ হিসেবে কনস্টেবলটা চেঁচিয়ে যাচ্ছে। আর এস-ডি-ও সাহেব চেম্বারে বসে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করছেন। তাঁর পাশে বসে আছে মিলিটারি অফিসাররা।

বছির আর অপেক্ষা করল না। ডান দিকে যে লম্বা লাইন পড়েছে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

চোখের পলকে লাইনটা বিশ হাত বেড়ে গেল।

যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক লোকগুলির সংখ্যা যখন এক'শ ছাড়িয়ে গেছে সেই সময় এস-ডি-ও সাহেব বললেন, 'এবার বাছাইয়ের কাজ শুরু কর।'

তিন-চারটে কনস্টেবল ফিতে নিয়ে ব্যস্ত ভাবে মাপামাপি শুরু করে দিল। একবার তারা লোকগুলোর পা থেকে মাথা পর্যন্ত মাপছে। তারপর বুকের ছাতি মাপছে।

সেনাদলে যাকে তাকে নেয় না। সেখানে নাম লেখাতে হলে বিশেষ শারীরিক উচ্চতা আর বুকের মাপ থাকা দরকার। তার কম হলে চলবে না।

কেউ লম্বায় ঠিক হচ্ছে তো বুকের মাপে আটকে যাচ্ছে। কারো বুকের মাপ ঠিক হচ্ছে তো লম্বায় আটকে যাচ্ছে।

এর ভেতর যারা চালাক তারা পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দৈর্ঘ্য বাড়াবার চেষ্টা করছে। যাদের বুক রোগা পাখির মতন তারা বাতাস টেনে টেনে ফুলিয়ে রাখছে। কিন্তু কনস্টেবলদের চোখে ধুলো ছিটানো সহজ নয়। যারা ডিঙি মেরে লম্বা হয়েছিল এক রুলের গুঁতোয় তাদের বেঁটে করে দিচ্ছে তারা। যারা বুক ফুলিয়ে রেখেছে তাদের পেটে ঘুষি মেরে হাওয়া বার করে দিচ্ছে।

যাদের মাপ মিলল মুর্গি বাছাইয়ের মতন তাদের একধারে দাঁড় করিয়ে রাখল কনস্টেবলরা, বাদ-বাকিদের ভাগিয়ে দিল। দেখা গেল শ'খানেক লোকের ভেতর অর্ধেকই বাতিল হয়ে গেছে।

বাছাইয়ের প্রথম কাজ হল দৈর্ঘ্য-প্রস্থের মাপ নেওয়া। তারপর বাক্সের মতন চৌকো একটা যন্ত্রের ওপর বসিয়ে পছন্দ-করা লোকগুলোর ওজন নেওয়া হল। ওজন করতে গিয়ে আরো কিছু লোক বাতিল হয়ে গেল।

ওজনের পর যারা টিকে রইল এস-ডি-ও সাহেব নিজের হাতে তাদের নাম-ঠিকানা লিখে নিলেন। তারপর বললেন, 'পরশুদিন তোমরা রাজদিয়া মিলিটারি ব্যারাকে চলে যাবে।'

লোকগুলো শুধলো, 'কহন যামু?'

'সকালবেলা। হ্যাঁ, ভালো কথা, খালি পেটে আসবে। সেদিন তোমাদের মেডিক্যাল হবে।'

'মেডিক্যাল কী?'

'স্বাস্থ্য পরীক্ষা।'

ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করে এস-ডি-ও সাহেব মিলিটারি অফিসার এবং পুলিস বাহিনী নিয়ে চলে গেলেন।

চরের যে মুসলমান কামলারা ধানকাটার সময় হেমনাথের বাড়ি আসে তাদের ভেতর একজনকে মোটে পছন্দ করা হয়েছে। সে তাহের। প্রাথমিক পরীক্ষায় বাকি কারো যোগ্যতা প্রমাণিত হয়নি।

খলিল বছিররা অযোগ্যতার গ্লানি দুই কাঁধে ঝুলিয়ে হতাশ মুখে ফিরে এল। তাহেরও তাদের সঙ্গে এসেছে। অন্য কেউ সেনাদলে চাকরি পাবে না; সেজন্য বেচারা প্রাণ খুলে আনন্দ পর্যন্ত করতে পারছে না। রিক্রুটমেণ্টের লোকেরা সবাইকে বাদ দিয়ে তাকে পছন্দ করেছে, এ যেন তারই অপরাধ। খলিলদের পিছু পিছু মুখ চুন করে তাহের এসে দাঁড়াল।

বিনুরা এখনও সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

অবনীমোহন বললেন, 'তোমাদের একজনকে বেছে নাম লিখে নিল, দেখলাম।'

খলিল বলল, 'হ। তাহেররে অগো পছন্দ হইছে। আর আমরা ফ্যালনা, গাঙ্গের পানিতে ভাইসা আইছি।'

অবনীমোহন চুপ করে থাকলেন।'

খলিল আবার বলল, 'আমি উচায় (উচ্চতায়) খাটো হইলাম। আরে আমি যে খাটো হেয়াতে (তাতে) কি আমার হাত আছে? খোদায় যেমুন বানাইছে তেমন হইছি। ইচ্ছা কইরা তো আর খাটো হই নাই।'

অবনীমোহন আস্তে করে মাথা নাড়লেন, 'তা তো বটেই।'

বছির এবার বলল, 'বুকের মাপে আমি খারিজ হইয়া গেলাম। ছাতির ওসার (প্রস্থ) নিহি আমার কম। কম হইব না তো কি বেশি হইব? উপাস দিয়া দিয়া পরান যায়, ছাতি বড় হইব কেমনে? বাইচা যে আছি, হেই না কত!'

সবাই ক্ষুব্ধ, আশাহত, দুঃখিত। অবনীমোহনের উত্তর দেবার মতন কিছুই ছিল না।

খলিল বলল, 'সগলই নছিব জামাইকত্তা। আমরা যুদ্ধে গিয়া যে দু'গা (দুটি) খাইয়া বাচুম খোদাতাল্লায় তা চায় না।'

হেমনাথ সেই যে জ্বরে পড়েছিলেন, সারতে দশ দিন লেগে গেল। জ্বর সারলেও দুর্বলতা কাটল না। একটু হাঁটলেই পা ভেঙে আসে, মাথা ঘুরতে থাকে।

চিরকাল বয়েসকে অস্বীকার করে এসেছেন হেমনাথ। বয়েসও এতকাল উদাসীন ছিল। হঠাৎ সে তাঁর দিকে নজর দিতে শুরু করেছে এবং প্রথম সুযোগেই বিছানায় ফেলে দিয়েছে।

অসুস্থ দুর্বল শরীর নিয়ে কোথায় গিয়ে কী বিপদ ঘটাবেন, সেই ভয়ে স্নেহলতা তাঁকে বাইরে বেরুতে দেন না। পাছে বেরিয়ে যান, সেজন্য চোখে চোখে রাখছেন।

এতবড় সংসার যাঁর মাথায় তাঁর তো এক জায়গায় বসে থাকলে চলে না। কোন দরকারে উঠে যেতে হলে ঝিনুক কিংবা সুধা-সুনীতিকে পাহারাদার হিসেবে হেমনাথের কাছে বসিয়ে রেখে যান স্নেহলতা।

হেমনাথ চেঁচামেচি করেন, 'বসিয়ে বসিয়ে আমাকে একেবারে অথর্ব করে ফেলছ স্নেহ।'

স্নেহলতা হাসেন, 'তাই নাকি?'

'নিশ্চয়ই। দেখো, আমাকে ঠিক বাতে ধরবে।'

'তা হলে আমি খুশীই হব।'

ভ্রূকুটি করে হেমনাথ বলেন, 'খুশী হবে!'

নিতান্ত লীলাভরে ঘাড় হেলিয়ে দ্যান স্নেহলতা, 'হব, হব, একশ'বার হব।'

'কেন?'

'বাতে শুয়ে থাকলে অন্তত চরকির মতন ঘোরাটা তোমার বন্ধ হবে। এত বয়েস হল, তবু ঘোরা বাই যাচ্ছে না।'

একটু চুপ করে থেকে কৌতুকের গলায় হেমনাথ বলেন, 'তুমি তো অসুখের জন্যে আমাকে বেরুতে দিচ্ছ না। রাজদিয়ার লোক কিন্তু অন্যরকম ভাবতে শুরু করেছে।'

অস্বস্তিকর সুরে স্নেহলতা জিজ্ঞেস করেন, 'কী?'

'বুড়ো বয়েসে তোমার নাকি রস উথলে উঠেছে। দিনরাত আমাকে কোলে শুইয়ে মুখে মুখ রেখে—'

কথা আর শেষ করতে পারেন না হেমনাথ। তার আগেই স্নেহলতা মুখ লাল করে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, 'আহা, কথার কি ছিরি! কিছুই আটকায় না মুখে!'

হেমনাথ হাসতে থাকেন।

স্নেহলতা আগের সুরে বলতে থাকেন, 'তোমার চালাকি আমি বুঝি। লোকের ওসব কথা বলতে বয়ে গেছে। বললেও তোমাকে বাড়ির বার হতে দিচ্ছি না।'

হেমনাথের বন্দিত্ব যেন আর ফুরোতে চায় না। এরই ভেতর একদিন বিকেল-বেলা মীরকাদিমের রজবালি শিকদার এসে হাজির।

রজবালিকে আগে আরো বার তিন-চারেক দেখেছে বিনু। এই বাড়িতেই এসেছে সে। একদিন হেমনাথের সঙ্গে নৌকোয় করে মীরকাদিমও গিয়েছিল। সেখানেই অবশ্য প্রথম দেখেছে।

রজবালির বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। গায়ের রঙ উজ্জ্বল। এই বয়েসেও শরীরের বাঁধুনি বেশ মজবুত। হাতের হাড় চওড়া, চোয়াল শক্ত, চিবুক ধারাল। দাড়ি এবং গোঁফ সৌখিন করে ছাঁটা। চোখদুটি সবসময় সজাগ এবং তীক্ষ্ণ। তাকে ফাঁকি দিয়ে কিছু হবার উপায় নেই। যার দিকে রজবালি তাকায় তার বুকের গভীর পর্যন্ত যেন সে দৃষ্টিতে বিঁধে যায়।

পরনে ডোরাকাটা সিল্কের লুঙ্গি আর ফিনফিনে পাঞ্জাবি। তার তলায় জালিকাটা গেঞ্জির আভাস। মাথায় নক্সাকরা ধবধবে টুপি। কানে আতর-মাখানো গোলাপী রঙের তুলো। পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা। চোখের কোলে সুর্মার সূক্ষ্ম টান। সব মিলিয়ে মানুষটি রীতিমত সৌখিন।

মীরকাদিমের গঞ্জে রজবালির ধান-চাল মুগ-মসুর তিল-তিসি ইত্যাদি শস্যের ব্যবসা। শাল কাঠের খিলান-দেওয়া টিনের প্রকাণ্ড চারটে আড়ৎ রয়েছে তার। সব সময় সেগুলো বোঝাই, কম করে দশ পনের হাজার মণ জিনিস মজুত থাকে। এ ছাড়া আছে হাঁড়ি-বালতির দোকান, মনোহারি দোকান। সব মিলিয়ে এলাহী ব্যাপার।

হেমনাথ বললেন, 'রজবালি যে; আয়—আয়—' বিনু কাছেই ছিল। তাকে একটা জলচৌকি এনে দিতে বললেন।

জলচৌকি এলে তার ওপর বসতে বসতে রজবালি বলল, 'কেমুন আছেন হ্যামকত্তা? শরীল কেমুন? যিনি (যেন) কাহিল কাহিল ঠ্যাকে!'

হেমনাথ তাঁর অসুখের কথা বললেন এবং কিছুদিন ধরে বন্দীজীবন যাপন করছেন, তা-ও জানালেন।

রজবালি আন্তরিক সুরে বলল, 'আপনের এমুন অসুখ, খপর পাই নাই তো। পাইলে আগেই আসতাম।'

হেমনাথের মুখ দেখে মনে হল, রজবালির আন্তরিকতাটুকু খুবই ভাল লেগেছে তাঁর। মৃদু হেসে বললেন, 'তোদের খবর ভাল তো ?'

'আপনেরা যেমুন রাখছেন।'

'আমরা রাখবার কে ? যিনি রাখবার তিনিই রেখেছেন।'

'হে যা কইছেন।'

'তারপর কী মনে করে ? কোন দরকারে এসেছিস, না এমনি বেড়াতে ?'

রজবালি হাসল, 'ব্যবসায়ীত মানুষ, বিনা দরকারে কোনখানে যাওনের উপায় আছে ? সময় কই ?'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন হেমনাথ।

রজবালি বলল, 'এখানে যে মিলিটারিরা আইছে আমি তাগো কাছে ছাপ্লাইয়ের এট্টা 'অডার' পাইছি।'

'কী সাপ্লাই ?'

'হাস-মুরগি-পাঠা-ডিম, চাউল-ডাইল—এই সগল। অডারের ব্যাপারটা পাকা করতে আইজ আইছিলাম।'

বিনুর হঠাৎ নিত্য দাসের কথা মনে পড়ল। দেখা যাচ্ছে মিলিটারির কল্যাণে চারদিকের বড় বড় ব্যবসায়ী আর আড়তদাররা রাজদিয়ায় হানা দিতে শুরু করেছে।

হেমনাথ শুধালেন, 'অর্ডারের কথা পাকা হল ?'

'হ।'

'কবে থেকে সাপ্লাই দিতে হবে ?'

রজবালি বলল, 'পরশু থনে। ভাবতে আছি রাইজদায় এট্টা বাড়ি ভাড়া নিমু। এইখানে 'রাখি' কইরা না রাখতে পারলে রুজ রুজ ঠিক সময়ে মাল ছাপ্লাই দিতে পারুম না। এয়া তো এতি-পেতি লইয়া কারবার না ; মিলিটারি বইলা কথা। টাইমে দিতে না পারলে ঘেটিতে মাথা থাকব না।'

রজবালি আরো জানাল, স্টিমারঘাটার কাছে মন্তাজ মিঞা যে নতুন বাড়িখানা করেছে, সেটাই ভাড়া করতে চাইছে ; মোটামুটি কথাবার্তা হয়ে গেছে। কাল পরশু বাড়িটার দখল পাওয়া যেতে পারে।

হেমনাথ এবার অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে এলেন, 'তোদের ওদিকে ধানচালের খবর কী বল্—'

'খবর খারাপ হ্যামকত্তা। দশ পনের দিন ধইরা মীরকাদিমের বাজারে এক-দানা চাউল নাই। চাউল বইলা কথা। মাইন্‌ষে পাগলের লাখান ঘুরতে আছে।'

চিন্তিত মুখে হেমনাথ বললেন, 'খুবই বিপদের কথা। তা হ্যাঁ রে, তোর আড়তে তো অত ধান চাল ছিল। সব বিক্রি করে ফেলেছিস?'

চকিতে চারদিক একবার ভাল করে দেখে নিয়ে রজবালি বলল, 'না। অত ধান চাউল কি দুই-চাইর-দশ দিনে বেচা যায়! ছয় মাস ধইরা বেচলেও শ্যাষ করণ যাইব না।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'সগল ব্যবসায়ীতে যা করছে আমিও হেই করছি হ্যামকত্তা।

'কী করেছিস?'

'ধান চাউল সরাইয়া ফালাইছি।'

'কেন?' বিমূঢ়ের মতন জিজ্ঞেস করলেন হেমনাথ।

রজবালি বলল, 'দর আরো চেতুক (চড়ুক); হেয়ার পর ছাড়ুম। আমার এক সুমুন্দি (সম্বন্ধী) মানিকগঞ্জের ঐ দিকে চাউলের ব্যবসায়ী। হ্যায় (সে) কইছে, দর আরো চেতবো। যত পারি অহন য্যান ধান-চাউল 'রাখি' করি।'

হেমনাথ বললেন, 'রাখি' তো করছিস। এদিকে দেশের লোক না খেয়ে শুকিয়ে মরছে, সেদিকে খেয়াল আছে?'

কথাটা শুনেও শুনল না রজবালি। অন্যমনস্কের মতন বলতে লাগল, 'আমরা ব্যবসায়ীত্। দ্যাশের মাইন্ষের দিকে তাকাইলে আমাগো কি চলে!' একটু থেমে আবার বলল, 'আপনের তো মেলা জমিন। বাড়তি ধান চাউল কিছু আছে? থাকলে আমারে দিতে পারেন। ভাল দাম দিমু।'

হেমনাথ মাথা নাড়লেন, 'নেই। প্রত্যেকবার ধান উঠবার পরই বাড়তি ধান বেচে দিই। এবারও দিয়েছি। বেশি কিছু থাকলেও তোকে দিতাম না; লোককে বিলিয়ে দিতাম।'

রজবালি কথাটা গায়ে মাখল না। হাসতে হাসতে বলল, 'আপনের লগে কার তুলনা! আপনে নিজে না খাইয়াও মাইন্ষেরে খাওয়াইতে পারেন। কিন্তুক আমরা হইলাম ব্যবসায়ীত্ মানুষ।'

হেমনাথ উত্তর দিলেন না।

রজবালি বলল, 'অনেকক্ষণ আইছি। এইবার যাই হ্যামকত্তা।' উঠতে গিয়ে হঠাৎ কী মনে পড়তে বসে পড়ল, 'ভাল কথা, আপনেরে একখান খপর দেওয়া হয় নাই—'

'কী খবর?'

'মুছলিম লীগের নাম শুনছেন?'

'মুসলিম লীগ! শুনব না কেন?'

'হ্।' রজবালি মাথা নাড়ল, 'কয়দিন আগে ঢাকার থনে মুছলিম লীগের বড় মিঞারা মীরকাদিমে আইসা মীটিন্ করল। মীটিনে তেনারা কী কইল জানেন?'

'কী?'

'মুছলমানগো লেইগা একখান দ্যাশ চাই। তার নাম হইব পাকিস্তান। তেনারা আরো কইল, যেখানে যত মুছলমান আছে সগলের মুছলিম লীগে নাম লিখান দরকার। অত বড় বড় মানুষগুলো কইছে, কেও আর না কইতে পারল না। আমাগো ঐদিকের মেলা মাইনষে মুছলিম লীগে নাম লিখাইছে আছে।'

একটু পর রজবালি চলে গেল।

॥ তেত্রিশ ॥

কনট্রোল হবার আগেই চিনি, কেরোসিন আর কাপড় বাজার থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল। তারপর এই রাজদিয়ায় তিনখানা কনট্রোলের দোকান বসল। একটা নিত্য দাসের, একটা অখিল সাহার আর তৃতীয়টি রায়েবালি সর্দারের।

প্রথম প্রথম রেশন কার্ড দেখিয়ে জিনিস তিনটে পাওয়া যাচ্ছিল। তারপর কনট্রোলের দোকান থেকেই সেগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল।

মিলিটারি ব্যারাকগুলো বাদ দিলে রাজদিয়ার ঘরে ঘরে আজকাল আর হেরিকেন জ্বলে না। গন্ধকশলা কি রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে সবাই রাতের কাজ সারে। চারদিকের গ্রামগুলোর অবস্থা আরো করুণ। সেখানকার মানুষেরা বিকেল থাকতে থাকতেই খেয়েদেয়ে (যে খাবার জোটাতে পারে) ঘরে খিল লাগিয়ে দেয়। ফলে সন্ধ্যে নামতে না নামতেই গ্রামগুলো নিশুতিপুর। সারা পুববাঙলা জুড়ে পাতালের অন্তহীন গাঢ় অন্ধকার যেন অনড় হয়ে আছে।

বিনুদের রেশন কার্ড পড়েছে নিত্য দাসের দোকানে। চিনি আর কেরোসিন আনতে বিনুই সেখানে যায়। যখনই যায়, তার চোখে পড়ে, দোকানটার সামনে উল্টো চণ্ডীর মেলা লেগে আছে। শুধু নিত্য দাসের দোকানেই না, অখিল সাহা আর রায়েবালি সর্দারের দোকান দুটোরও একই হাল।

বাইরে রেশনকার্ড আর বোতল হাতে ঝুলিয়ে জনতা তাথের কাকের মতন তাকিয়ে থাকে। ভেতরে দেখা যায়, নিত্য দাস একটা তক্তপোষে বসে আছে। তার সামনে ক্যাশবাক্স, রসিদ বই। ডানধারে বড় বড় কেরোসিনের ড্রামগুলো শূন্য, চিনির বস্তাগুলো ফাঁকা। পেছন দিকে কাপড় রাখার জন্য যে সারি সারি কাচের আলমারি বসানো আছে সেগুলোতে কিচ্ছু নেই।

বাইরের জনতা করুণ গলায় গোঙানির মতন আওয়াজ করে ডাকে, 'অ দাস মশয়, অ দাস মশয়—

একশ'বার ডাকলে তক্তপোষের ওপর থেকে একবার মোটে সাড়া ছায় নিত্য দাস, 'কী কও—'

'এট্টু ক্রাচিন ছান। আন্ধারে থাইকা থাইকা আর পারি না। হেইদিন রাইতে ঘরে সাপ ঢুকছিল।'

'ক্রাচিন নাই।'

'এট্টু ব্যবস্থা করেন দাস মশয়—'

'ব্যবস্থা কি আমার হাতে! ঐ ছাখনা, ক্রাচিনের ডেরামগুলান শূইন্য (শূন্য)।'

'দয়া করেন দাস মশয়—'

'দয়ার কী আছে। তোমরা ট্যাকা দিয়া মাল কিনবা, কিন্তুক বাপারখান কী জানো?'

'কী?'

'ছাপ্লাই নাই। ছাপ্লাই না থাকলে আমি কই থনে কী করি। তোমরা বুঝমান মানুষ হইয়া বোঝো না ক্যান?'

'ক্রাচিন নাই তো এট্টু চিনি ছান—'

'চিনিরও ছাপ্লাই নাই। ঐ ছাখ চিনির ছালাগুলা (বস্তাগুলো) শূইন্য পইড়া রইছে।'

'মিঠার লেইগা পোলাপানগুলা কাইন্দা মরে। কনটোলে চিনি পাইলে কিনতে পারি। কিন্তুক বাইরে গুড়ের দর এক্কেবারে আগুন। কাছে আউগান (এগুনো) যায় না।'

'ক্যান যে তোমরা এত ঘ্যান ঘ্যান কর? কইতে আছি চিনি নাই, নিজের চোখে সগলে দেখতেও আছ। তবু বিশ্বাস যাও না।'

'চিনি না ছান, কাপড় ছান—'

'কাপড়েরও ছাপ্লাই নাই।' আঙুল দিয়ে সারি সারি ফাঁকা আলমারিগুলো দেখিয়ে দেয় নিত্য দাস।

জনতা বলে, 'চিনি-ক্রাচিন না খান তো না দিলেন। কিন্তুক একখান শাড়ি না দিলে চলব না দাস মশয়। কাপড় বিহনে ঘরের বউ-মাইয়া বাইর হইতে পারে না। গামছায় কি সরম ঢাকে! তারা কয় গলায় দড়ি দিব।'

অসীম ধৈর্য নিত্য দাসের। সবার কথা, সবার মিনতি, সবার আবেদন কান পেতে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে যায়। তারপর বলে, 'কাপড় কই পাই? ছাপ্লাই না থাকলে আমি কী করতে পারি। আমার তো আর ধুতি-শাড়ির মেচিন নাই যে বানাইয়া দিমু।'

'আপনের কুনো কথা শুনুম না। কাপড় না পাইলে এইখানে 'হত্যা' (হত্যে) দিয়া পইড়া থাকুম।'

'হত্যা দিলে কি কাপড় মিলব! তার থনে এক কাম কর—'

'কী?'

'গরমেণ্টেরে গিয়া ধর।'

'গরমেণ্ট বুঝি না, আপনেই আমাগো সব। বাচান দাস মশয়, ঘরের বউ-ঝির ইজ্জত বাচান।'

এই সব আবেদন-নিবেদন কাকুতি-মিনতির মধ্যে হঠাৎ বিনুকে দেখতে পেলেই হাতের ইশারা করে নিত্য দাস। ভিড় ঠেলে ঠেলে বিনু দোকানের ভেতর চলে আসে।

নিত্য দাস তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে, 'কি ছুটোবাবু, ক্রাচিন নিতে আইছ?'

বিনু মাথা নাড়ে, 'হ্যাঁ।'

'যাও গা, রাইতে পাঠাইয়া দিমু।'

'কিন্তু—

'কী?'

'আপনার দোকানে তো কেরোসিন নেই।'

'থাউক না-থাউক, হে তোমার দেখতে হইব না। তুমি ক্রাচিন পাইলেই তো হইল।' নিত্য দাস বলতে থাকে, 'রাইতে যে ক্রাচিন পাঠামু হেই কথাটা গুপন (গোপন) রাইখো। একবার জানতে পারলে ঐ শকুনের গুষ্টি আমারে ছিড়া খাইব।' বলে সামনের জনতাকে দেখিয়ে দেয়।

বিনু যেদিনই কেরোসিন আনতে যায়, ঐ একই কথা বলে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয় নিত্য দাস। তারপর রাত্রিবেলা তার লোক ঢাকাঢুকি দিয়ে কেরোসিনের টিন নিয়ে আসে।

এইভাবেই চলছিল।

নিত্য দাসের যে গোমস্তা কেরোসিন দিয়ে যায় তার নাম সুচাঁদ। হঠাৎ একদিন সে হেমনাথের সামনে পড়ে গেল।

হেমনাথ বললেন, 'তুই নিত্য দাসের দোকানে কাজ করিস না ?'

সুচাঁদ বলল, 'আইজ্ঞা।'

'এই রাত্রিবেলা আমার বাড়ি কী মনে করে ?'

'আইজ্ঞা ক্রাচিন।'

'কেরোসিন !'

'হ—' সতর্ক চোখে চারদিক দেখে নিয়ে কাপড়ের আড়াল থেকে ছোট্ট একটা টিন বার করল সুচাঁদ।

হেমনাথ বিমূঢ়ের মতন বললেন, 'কী ব্যাপার ? এভাবে চোরের মতন কেরোসিন নিয়ে এসেছিস ! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

তাঁর বাড়িতে এভাবে গোপনে যে কেরোসিন পাঠানো হচ্ছে, হেমনাথ জানতেন না। তাঁর বিমূঢ় হবার কথাই।

বিনু কাছেই ছিল। সে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলল।

শুনে চিৎকার করে উঠলেন হেমনাথ, 'হারামজাদার এত বড় সাহস, কেরোসিন ঘুষ দিয়ে আমাকে খুশী করতে চায় !' সুচাঁদকে বললেন, 'বেরো— বেরো আমার বাড়ি থেকে।'

সুচাঁদ ভয় পেয়ে গিয়েছিল, 'আইজ্ঞা—'

উত্তেজিত সুরে হেমনাথ আবার বললেন, 'এখনও দাঁড়িয়ে আছিস ! কেরোসিনের টিন নিয়ে এক্ষুনি চলে যা—'

সুচাঁদ পালিয়ে গেল।

চেঁচামেচি শুনে স্নেহলতারা বেরিয়ে এসেছিলেন।

স্নেহলতা বললেন, 'কী হল, অত চেঁচাচ্ছ কেন ?'

উত্তেজনা যেন শীর্ষবিন্দুতে পৌছুল হেমনাথের, 'ঐ নিত্যদাসের স্পর্ধা দেখেছ !'

'কেন, কী করেছে সে ?'

'কী করে নি ? রেশনের চিনি-কেরাসিন-কাপড় ব্ল্যাকে দশ গুণ দামে বিক্রি করছে। রাজদিয়া-কেতুগঞ্জ-রসুলপুর, চারদিকের গ্রামগুলোর কোন লোক ন্যায্য দামে এক দানা চিনি পাচ্ছে না, এক ফোঁটা কেরোসিন পাচ্ছে না, কাপড়ের একটা সুতো পাচ্ছে না। আর রাত্রিবেলা লোক দিয়ে আমাকে ঘুষ পাঠানো হচ্ছে ! ওকে আমি পুলিসে দেব ; জেলে পাঠাব।'

স্নেহলতা শুধোলেন, 'সুচাঁদ কি কেরোসিন এনেছিল ?'

হেমনাথ বললেন, 'এনেছিল। আমি তাড়িয়ে দিয়েছি।'

'তাড়িয়ে তো দিলে, হেরিকেন জ্বলবে কেমন করে ?'

'জ্বলবে না। গন্ধকশলা আর রেড়ির তেল দিয়ে কাজ চালাও। তা যদি না পার, অন্ধকারে থাকবে। সারা দেশে আলো নেই, আর তুমি নিজের ঘরে দেয়ালি জ্বালবে—এ হতে পারে না স্নেহ।'

বিনু অভিভূতের মতন হেমনাথের দিকে তাকিয়ে থাকল।

॥ চৌত্রিশ ॥

সিগারেট খাওয়ার জন্য মজিদ মিঞার হাতে সেই যে মার খেয়েছিল, তারপর থেকে শ্যামল আর অশোকের সঙ্গে মেশে না বিনু। হেমনাথ-অবনীমোহন-সুরমা-স্নেহলতা, সবাই ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করে দিয়েছেন। নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে ; স্কুল ছুটির পর আর ওদের সঙ্গে বেড়ায় না বিনু ; সোজা বাড়ি চলে আসে।

আজও ফিরছিল সে।

পশ্চিম আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি নেমে গেছে। রোদের রঙ এখন বাসি হলুদের মতন। বিকেলের নিবুনিবু অনুজ্জ্বল আলো গায়ে মেখে ঝাঁকে ঝাঁকে বালিহাঁস আর পানিকাউ উড়ছিল। উত্তর আকাশে তুলোর স্তূপের মতন সাদা সাদা ভবঘুরে মেঘ।

বরফ কল, মাছের আড়ত পেরিয়ে স্টিমারঘাটার কাছে আসতেই কে যেন ডাকল, 'বিনুদা—বিনুদা—'

চমকে ঘুরে দাঁড়াতেই বিনু দেখতে পেল, জেটির কাছে ঝুমা।

চোখাচোখি হতেই ঝুমা হাতছানি দিল।

প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারল না বিনু। এই বিকেলবেলায় নদীর দিক থেকে যখন এলোমেলো হাওয়া দিয়েছে, সূর্যটা ডুবু-ডুবু, রোদের রঙ বাসি হলুদের মতন, যখন পশ্চিমের ভাসমান মেঘ ফুলে ফুলে পাহাড়ের মতন হয়ে আছে, সেই সময় স্টিমার ঘাটার কাছে ঝুমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল। অবাক বিনু দাঁড়িয়েই থাকল।

ঝুমা আবার ডাকল, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? এসো—'

ছু চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল বিনু।

স্তূপাকার মালপত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ঝুমা। ট্রাঙ্ক, স্যুটকেশ, বেতের বাস্কেট, কুঁজো, চার-পাঁচটা হোল্ডঅল, টিফিন-কেরিয়ার—কত যে জিনিস, লেখাজোখা নেই। ঝুমা ছাড়া আর কারোকেই দেখা যাচ্ছে না।

পলকহীন তাকিয়েই ছিল বিনু। চোখ কুঁচকে ঝুমা বলল, 'একেবারে বোবা হয়ে গেলে যে ? আমাকে যেন চিনতেই পারছ না—'

হঠাৎ দেখলে সত্যিই চেনা যায় না। মাথায় অনেকখানি লম্বা হয়ে গেছে ঝুমা। ছু'বছর আগে যে ছিল বালিকা, বড় বড় পা ফেলে কখন সে কৈশোরকে ধরে ফেলেছে, কে বলবে। গায়ের চামড়া এখন টান-টান, মসৃণ ; তাতে চক-চকে আভা ফুটেছে। প্রচুর স্বাস্থ্য মেয়েটার, গায়ের আঁটো-সাঁটো জামাটায় ধরতে চায় না।

চোখ এমনিতেই বড় ; তার মাঝখানে কালো কুচকুচে মণিছুটো নিয়ত অস্থির, নিয়ত-ছটফটে।

বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না বিনু। অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে বিব্রতভাবে বলল, 'না, মানে—'

'মানে আবার কী ?'

'অনেকদিন পর তোমাকে দেখলাম কিনা।' একটু সামলে নিয়ে বিনু আবার বলল, 'তুমি একলা এখানে—এই স্টিমারঘাটায় !'

ঝুমা বলল, 'আজই আমরা কলকাতা থেকে এলাম যে—'

'কখন এসেছ ?'

'এক্ষুনি এলাম। ঐ দেখছ না স্টিমারটা—'

বিনু তাকিয়ে দেখল, জেটিঘাটের ওপাশে রাজহাঁসের মতন সেই স্টিমারটা দাঁড়িয়ে আছে। তার মাস্তলে খয়েরি রঙের শঙ্খচিল। হঠাৎ বিনুর মনে পড়ল ওবেলা স্কুলে আসার সময় স্টিমারটা চোখে পড়ে নি। সে বলল, 'স্টিমার তো সকালবেলা আসবার কথা—'

ঝুমা বলল, 'হ্যাঁ, বড্ড দেরি করে এসেছে। পাক্কা দশ ঘণ্টা লেট—'

এবার বিনু ভাল করে লক্ষ্য করল, ঝুমার চুল রুক্ষ, উস্কখুস্ক। প্রায় ছু'দিন স্টিমার এবং ট্রেনে কাটিয়ে আসার ফলে মুখচোখ মলিন। তারপর একটা কথা খেয়াল হতে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তোমাকেই তো শুধু দেখছি ; আর সবাই কোথায় ?'

'জেটিঘাটের ভেতর। কুলীদের দিয়ে মালপত্তর এনে এনে রাখছে। আমি এখানে পাহারা দিচ্ছি। দাদু আর বাবা গেছেন একটা ঘোড়ার গাড়ি যোগাড় করতে। ওঁরা এলেই আমরা বাড়ি যাব।' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল ঝুমার, 'আচ্ছা বিনুদা—'

'কী বলছ?'

'তোমরা তো সেই থেকেই দেশে আছ, আর কলকাতায় যাও নি—তাই না?'

'হ্যাঁ। তোমায় কে বললে?'

'বা রে, কলকাতায় গেলে তুমি বুঝি আমাদের বাড়ি যেতে না? তা ছাড়া—'

'কী'?

চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঝুমা এবার বলল, 'তোমরা যে দেশে আছ, সে খবর আমরা পেয়েছি।'

বিনু শুধলো, 'কেমন করে?'

'হাঁদা-গঙ্গারাম, কিছুই জানো না! সুনীতিদি প্রত্যেক সপ্তাহে আমার মামাকে দু'খানা করে চিঠি লেখে। তাতেই জানতে পেরেছি।'

বিনু মনে মনে ভাবল, সত্যিই সে হাঁদা। সুনীতির সব চিঠিই তো সে নিজের হাতে ডাকবাক্সে দিয়ে আসত অথচ এই সোজা জিনিসটা তার মাথায় ঢুকল না!

ঝুমা এবার গলা নামিয়ে ফিসফিস করল, 'তোমার দিদি আর আমার মামার ভেতর ব্যাপার আছে, না বিনুদা—' বলে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে কেমন করে যেন হাসতে লাগল।

ঝুমার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছে বিনু। তার মুখ লাল হয়ে উঠল। দু'বছর আগে মেয়েটা ছিল দুর্দান্ত, ডানপিটে। ভয়-টয় বলে তার কিছুই ছিল না। টের পাওয়া যাচ্ছে, সেই ঝুমা এবার অন্য দিক থেকে পেকে টুসটুসে হয়ে এসেছে।

একটু নীরবতা।

তারপর ঝুমাই আবার ডাকল, 'বিনুদা—'

'কী বলছ?'

'সেই হিংসুটে মেয়েটা এখন কোথায় গো?'

'কার কথা বলছ?'।

'ঝিনুক—ঝিনুক—'

বিন্নু বলল, 'ঝিনুক আমাদের বাড়িতেই আছে।'

ঝুমা ঘাড় বাঁকিয়ে শুধলো, 'সেই তখন থেকে?'

'হ্যাঁ।' গভীর সহানুভূতির গলায় বিন্নু বলতে লাগল, 'কোথায় আর যাবে বল। ওর মা তো এখানে নেই—'

'ঝিনুকের মা এখানেও আসে নি?'

'না।'

'আর আসবে না মনে হয়।'

'তা-ই শুনেছি।'

একটু কি ভেবে ঝুমা এবার জিজ্ঞেস করল, 'ঝিনুক এখন কত বড় হয়েছে বিন্নুদা?'

ঝুমার কথায় চকিত হল বিন্নু। সত্যিই বড় হয়ে উঠেছে ঝিনুক; প্রায় ঝুমার মতনই কিশোরী।

দু' বছর হতে চলল—একই বাড়িতে সাতাশের বন্দের ছ'খানা ঘর, ঢালা উঠোন, স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন বাগান, টলটলে পুকুর, পাখিদের অশ্রান্ত কিচির-মিচির আর গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত দিয়ে ঘেরা ছোট্ট মনোরম একটি ভুবনের মাঝখানে তারা পাশাপাশি আছে। অথচ তিল তিল করে কখন যে ঝিনুক বড় হয়ে উঠেছে লক্ষ্যই করে নি বিন্নু। আজ ঝুমার কথায় আচমকা তা মনে পড়ে গেল।

ঝিনুক যেন নিশ্বাস-বায়ুর মতন। সে কাছেই আছে কিন্তু তার কথা মনেই থাকে না।

বিন্নু বলল, 'তোমার মতনই বড় হয়েছে।'

'তা হলে তো—' বলে চোখ কুঁচকে ঠোঁট কামড়াতে লাগল ঝুমা।

'তা হলে কী?'

ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে ঝুমা বলল, 'দু'জনে বেশ চালাচ্ছ—' কথায় কথায় ভুরু নাচানো মেয়েটার স্বভাব।

কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল বিন্নুর; আবছা গলায় সে বলল, 'কী যা-তা বলছ!'

ঝুমা আবার কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় জেটিঘাটের ভেতর থেকে চার-পাঁচটা কুলীর মাথায় বড় বড় লোহার ট্রাঙ্ক চাপিয়ে স্মৃতিরেখা বেরিয়ে এলেন। তাঁর পেছনে রুমা আর আনন্দ।

আনন্দও তবে এসেছে!

কাছাকাছি এসে কুলীরা ট্রাঙ্কগুলো নামাল। স্মৃতিরেখা বিনুকে দেখতে পেয়েছিলেন। একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বিনু না?'

বিনু বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'চিনতেও পারা যায় না। কত বড় হয়ে গেছ!'

লজ্জায় চোখ নামল বিনু। স্মৃতিরেখা বললেন, 'তুমি এখানে কোত্থেকে এলে?'

বিনু বলল, 'স্কুল থেকে? বাড়ি ফিরছিলাম; ঝুমা ডাকল।'

একটু চুপ করে থেকে স্মৃতিরেখা এবার বললেন, 'বোমার ভয়ে পালিয়ে এলাম। কলকাতায় যে কোনদিন এখন বোমা পড়তে পারে।'

চোখ মাটির দিকে রেখেই বিনু বলল, 'কলকাতা থেকে অনেক লোক রাজদিয়ায় চলে এসেছে।'

'তাই নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

স্মৃতিরেখা বললেন, 'কলকাতা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। যে যেদিকে পারছে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সে যাক গে। হ্যাঁ বিনু—'

এবার মুখ তুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল বিনু।

স্মৃতিরেখা বললেন, 'শুনেছি, তোমরা নাকি সেই থেকেই রাজদিয়ায় আছ—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'জমিজমাও কিনেছ—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কতটা?'

'তিরিশ কানির মতন।'

'তোমার বাবা বুদ্ধিমানের মতন কাজ করেছেন।'

একটু চুপ।

তারপর স্মৃতিরেখা আবার বললেন, 'বাড়ির সবাই ভাল তো?'

বিনু মাথা নাড়ল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

এরপর এলোমেলো অসংলগ্ন নানারকম কথা হতে লাগল। যুদ্ধের কথা, জাপানী বোমার কথা, রাজদিয়ার কথা, কলকাতা থেকে আসার সময় ট্রেনে-স্টিমারে অসম্ভব ভিড়ের মধ্যে অত্যধিক কষ্টের কথা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

একসময় শিশির আর রামকেশব ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে ফিরে এলেন।

দেখেই বিনু চিনতে পারল, গাড়িটা ঝিনুকদের। শিশিররা তা হলে ঝিনুকদের ফীটন চেয়ে আনতে গিয়েছিলেন ?

কুলীগুলো একধারে দাঁড়িয়ে ছিল। রামকেশব তাড়া লাগালেন, 'মাল তুলে ফেল—'

বাক্সপ্যাঁটরা তোলা হলে কুলীরা ভাড়া নিয়ে চলে গেল। রামকেশব বললেন, 'সবাই গাড়িতে ওঠ।'

স্মৃতিরেখা বিনুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের বাড়ি যাবে নাকি ? চল না—'

ঝুমাও তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'চল না, চল—' আগ্রহে তার চোখ চকচকে করতে লাগল।

যাবার খুব যে একটা অনিচ্ছা ছিল, তা নয়। হয়তো যেতও বিনু। কিন্তু পরক্ষণে সেই নিষেধাজ্ঞার কথা মনে পড়ে গেল। আজকাল স্কুল ছুটির পর আর এক মুহূর্তও বাইরে থাকার উপায় নেই। মজিদ মিঞা তার কি সর্বনাশটাই না করেছে। একটু ভেবে বিনু বলল, 'এইমাত্র আপনারা এলেন। আজ বিশ্রাম-টিশ্রাম করুন গিয়ে। আমি পরে যাব।'

স্মৃতিরেখা বললেন, 'সেই ভাল। ট্রেনে-স্টিমারে দু'দিন যা ধকল গেছে ! এখন চান করে একটু শুতে পেলে বাঁচি। তোমাকে নিয়ে গিয়ে ভাল করে কথাই বলতে পারব না। পরে আসবে কিন্তু—'

'আসব।'

ঝুমা বলল, 'কালই এস—'

বিনু হাসল।

স্মৃতিরেখা আর কিছু না বলে ফীটনে উঠলেন। তাঁর পিছু পিছু শিশির, রুমা আর রামকেশবও উঠলেন।

উঠতে উঠতে রামকেশব বিনুকে বললেন, 'হেমদাদা আর বৌঠাকরুনকে বলিস, কলকাতা থেকে শিশিররা আজ এসেছে।'

বিনু ঘাড় হেলিয়ে দিল, 'বলব।'

আনন্দ আর ঝুমা এখনও নীচে দাঁড়িয়ে। সবার কান বাঁচিয়ে নীচু চাপা গলায় আনন্দ বলল, 'বাড়িতে আমার কথাও বোলো।'

ঝুমাটা কাছেই আছে ; তাকে ফাঁকি দেওয়া যায় নি। চোখ কুঁচকে ঠোঁট ছুঁচলো করে সে বলল, 'কার কাছে বলবে মামা ? সুনীতিদির কাছে ?'

'তুই ভীষণ ফাজিল হয়েছিস।' আলতো করে ঝুমার মাথায় চাঁটি কষিয়ে দিল আনন্দ।

নাকের ভেতর থেকে কপট কান্নার মতন শব্দ করতে লাগল ঝুমা, 'উ-উ-উ—'

'আর বাঁদরামো করতে হবে না। গাড়িতে ওঠ্—' দুজনে ফীটনে উঠে দরজা বন্ধ করল।

সঙ্গে সঙ্গে রামকেশব চেঁচিয়ে বললেন, 'গাড়ি চালা রে রসুল—' ঝিনুকদের কোচোয়ানটার নাম রসুল।

ফীটন চলতে শুরু করল। জানলার বাইরে মুখ বার করে হাত নাড়তে লাগল ঝুমা। যতক্ষণ দেখা যায়, নদীর পারে স্টিমারঘাটায় দাঁড়িয়ে থাকল বিনু।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে আজ সন্ধ্যে হয়ে এল। পুকুরের ওপারে ধানের খেত এর মধ্যেই ঝাপসা হয়ে গেছে। আকাশ যেখানে ধনুরেখার দিগন্তে নেমেছে, সেই জায়গাটা নিরাকার, অস্পষ্ট। বাগানের একোণে-ওকোণে থোকা থোকা অন্ধকার জমতে শুরু করেছে। সোনাল আর পিঠক্ষীরা ঝোপের ভেতর জোনাকিদের নাচানাচি শুরু হয়ে গেছে।

স্টিমারঘাটায় যে সূর্যটা ছিল ডুবু-ডুবু, এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। আকাশ জুড়ে যুঁই ফুলের মতন অগণিত তারা ফুটতে শুরু করেছে।

উঠোনে পা দিতেই সুরমা ছুটে এলেন, 'তোর তো লজ্জা নেই বিনু। সেদিন যে মজিদ মিঞা অত করে মারল, এর মধ্যেই ভুলে গেলি!'

স্নেহলতা, সুধা-সুনীতি, শিবানী, ঝিনুক, সবাই একধারে দাঁড়িয়ে আছে। খুব সম্ভব তার ফেরার জন্য ওরা উঠোনে অপেক্ষা করছিল। অবনীমোহন আর হেমনাথকে অবশ্য দেখা গেল না।

স্নেহলতা বললেন, 'গায়ের ব্যথাও মরল, আবার যে কে সে-ই হয়ে দাঁড়ালি!'

বিনু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তোমরা যা ভাবছ তা নয় দিদা—'

সুধা এই সময় গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে ভেংচি কাটার মতন মুখ করে বলল, 'তোমরা যা ভাবছ তা নয় দিদা! নিশ্চয়ই তা-ই। আবার ঐ বাঁদরগুলোর সঙ্গে মিলিটারী ব্যারাকে গিয়ে ভিখিরিদের মতন চকলেট চাইছিলি; সিগারেট খাচ্ছিলি। দাঁড়া, আজই মজিদ মামাকে খবর পাঠাচ্ছি। চ্যালা কাঠ দিয়ে যাতে—'

সুধার কথা শেষ হল না, তার আগেই বিনু ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিমেষে দেখা গেল সুধার চুলের গোছা বিনুর মুঠোয়। সুধাও ছাড়ে নি, দু'হাতের দশটা নখ বিনুর গালে বসিয়ে দিয়ে ধরে আছে।

চেঁচামেচি এবং টানাটানি করে স্নেহলতারা তুজনকে ছাড়িয়ে দিলেন।

যে সুনীতি চিরদিনই ধীর স্থির শান্ত, হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল তার। ছুটে এসে বিন্নুর গালে এক চড় কষিয়ে দিল। চোখ পাকিয়ে বলল, 'অন্যায়ও করবে আবার লোকের গায়ে হাতও তুলবে। দিন দিন তোমার আস্পর্ধা বেড়েই চলেছে। খুনী কোথাকার—'

তুর্বিনীত ঘাড় বাঁকিয়ে বিন্নু বলল, 'আমি অন্যায় করি নি।' চড় খেয়ে তার চোখ টসটস করছে। মনে হচ্ছে সে তুটো বুঝি ফেটেই যাবে।

সুরমা বললেন, 'অন্যায় করিস নি তো এতক্ষণ ছিলি কোথায়? তোকে না বলে দেওয়া হয়েছে স্কুল ছুটির পর এক মিনিট বাইরে থাকবি না। আবার সন্ধ্যে করে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছ!'

বিন্নু বলল, 'স্কুল ছুটির পর আমি তো আসছিলামই। স্টিমারঘাটার কাছে ঝুমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

'কোন্ ঝুমা?'

'ঐ যে রামকেশবদাতুর নাতনী—'

স্নেহলতা বললেন, 'ওরা এসেছে নাকি?'

বিন্নু বলতে লাগল, 'হ্যাঁ, আজই বিকেলবেলা এসেছে। স্টিমারঘাটায় নেমেই আমাকে দেখতে পেয়ে ওরা আটকাল। কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেল।'

সুধাটা চিরকালের ঘরশত্রু। সে হঠাৎ বলে, 'গোয়ালন্দের স্টিমার তো আসে সকালে। বিকেলবেলা এসেছে কিরকম?'

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলল বিন্নু, 'বিশ্বাস না হয় ঝুমাদের বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করে আয় না রাক্ষুসী।'

আবার একটা কুরুক্ষেত্র বেধে যাবার উপক্রম হচ্ছিল। তাড়াতাড়ি তুজনকে থামিয়ে স্নেহলতা বললেন, 'ঝুমাদের জন্যে দেরি হয়েছে, সে কথা বলবি তো? কী বোকা ছেলে তুই! শুধু-শুধু মার খেলি।'

অভিমানের গলায় বিন্নু বলল, 'তোমরা আমাকে বলতে দিলে কোথায়?'

বিন্নুর একখানা হাত ধরে স্নেহের সুরে স্নেহলতা বললেন, 'চল্, হাত-মুখ ধুয়ে খাবি। সেই কখন চাট্টি খেয়ে স্কুলে গিয়েছিলি।'

খেয়েটেয়ে বিন্নু যখন পড়তে বসল, বেশ রাত হয়ে গেছে। ধানখেত, পুকুর, সুদূর বনানী, গাছপালা—সব কিছুই এখন গাঢ় অন্ধকারে অবলুপ্ত।

সুধা-সুনীতি আর ঝিনুক আগেই পড়তে বসছিল।

এ বাড়িতে আজকাল আর কেরোসিন ঢোকে না; হেমনাথের বারণ। সারাদেশ যখন অন্ধকারে ডুবে আছে তখন নিজের ঘরে তিনি দেয়ালি জ্বালাতে চান না। তা ছাড়া নিত্য দাসের ওপর তিনি এত অসন্তুষ্ট যে তার দোকানের একটা কুটো বাড়িতে আসতে দেবেন না।

কেরোসিন আসে না। এ বাড়িতে আজকাল রেড়ির তেল জ্বলে।

এই মুহূর্তে পুবের ঘরের এক কোণে ছুটো আড়াইতলা কাঠের পিলসুজে প্রদীপ জ্বলছে। রেড়ির তেলের নিরুত্তেজ আলোয় চারধার স্নিগ্ধ। বিন্নুরা তিন ভাই-বোন আর ঝিনুক সুর করে পড়ে যাচ্ছিল।

বিন্নুর ডান পাশে বসে সুনীতি। তারপর সুধা এবং ঝিনুক।

পড়তে পড়তে মুখ তুলে সুনীতি একবার বিন্নুকে দেখে নিল। তারপর আবার বইয়ের দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ পর আবার বিন্নুকে দেখল, তারপর চোখ নামিয়ে আবার বই নাড়াচাড়া করতে লাগল।

অনেকক্ষণ ইতস্তত করার পর খুব আস্তে করে গলার ভেতর থেকে সুনীতি ডাকল, 'বিন্নু—'

বিন্নু শুনেও শুনল না। গলা চড়িয়ে পডতে লাগল।

বিরক্ত অপ্রসন্ন চোখে তাকাল বিন্নু।

সুনীতি বলল, 'খুব পড়া দেখাচ্ছিস, না?' বলে হাসল।

বিন্নু কিছু বলল না; চোখ কুঁচকেই থাকল।

সুনীতি এবার কোমল গলায় বলল, 'গালে খুব লেগেছিল, নারে?

মুখ বাঁকিয়ে বিন্নু বলল, 'না, লাগবে না!'

'সত্যি, আর মারব না। হঠাৎ এমন রাগ হয়ে গিয়েছিল।' বিন্নুর মাথায় হাত বুলোতে লাগল সুনীতি।

এক ঝটকায় সুনীতির হাতটা সরিয়ে দিল বিন্নু, 'মারবার সময় মনে ছিল না, এখন আদর ফলানো হচ্ছে।'

সুনীতি আবার বিন্নুর মাথায় হাত রাখল। খোশামোদের গলায় বলল, 'জীবনে আর কক্ষনো তোর গায়ে হাত তুলব না। মা কালীর দিব্যি। আর—'

'আর কী?'

'তোকে একটা জিনিস দেব।'

'কী জিনিস?'

'ছুটো টাকা।'

বিন্থ এবার নরম হল। একটু ভেবে বলল, 'কখন দেবে ?'

'আজকেই।'

'ঠিক ?'

'ঠিক।'

একটু চুপ করে থেকে স্থনীতি গলার স্বর আরো নামিয়ে দিল, 'এ্যাই—'

'কী বলছ ?'

'ঝুমারা কে কে এসেছে রে ?'

'ঝুমা, রুমাদি, শিশিরমামা, মামী আর—'

নিশ্বাস বন্ধ করে পলকহীন তাকিয়ে ছিল স্থনীতি। চাপা গলায় ফিসফিস করে বলল, 'আর কে ?'

বিন্থর চোখ ঝিকঝিক করতে লাগল। সে বলল, 'যার কথা শুনবার জন্যে দম বন্ধ করে আছ, সে। আনন্দদাও এসেছে।'

'আহা, দম বন্ধ করে থাকবার আর লোক পেলাম না।' বলেই বইয়ের ওপর ঝুঁকে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগল স্থনীতি।

বিন্থ বলল, 'আমার টাকা দাও—'

'দেব'খন।'

'ও, কাজের বেলায় আঁটিস্থটি, কাজ ফুরোলে দাঁত কপাটি। টাকা না দিলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে।'

কিছুক্ষণ পড়াশোনার পর বিন্থ হঠাৎ শুনতে পেল, নীচু গলায় স্থধা স্থনীতিকে বলছে, 'তোর মনস্কামনা পূর্ণ হল তো দিদি—'

স্থনীতি বলল, 'কিসের আবার মনস্কামনা ?'

উত্তর না দিয়ে স্থধা রগড়ের গলায় বলল, 'আনন্দদার খবর জানবার জন্যে নগদ ত্নটো টাকা খরচ করতে হল দিদিভাই।'

স্থনীতি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'আহা—হা—'

একসময় খাবার ডাক পড়ল।

বইটই গুছিয়ে প্রথমে স্থধা-স্থনীতি রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

পুবের ঘর আর রান্নাঘরের মাঝখানে উঠোন। স্থধা-স্থনীতির পর বিন্থ আর ঝিন্থক খেতে গেল।

অন্ধকারে যেতে যেতে হঠাৎ ঝিন্থক বলল, 'তোমার তো এখন ভারি মজা, না বিন্থদা ?'

বিন্থ বলল, 'কেন ?'

'ঝুমা এসেছে।'

বিনু কিছু বলল না ; রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে ঝিনুকের কথাগুলো বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল শুধু।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

দিন দুই পর ছিল রবিবার। দুপুরবেলা বিনুরা সবে খেয়েদেয়ে উঠেছে, সেই সময় ঝুমা আর আনন্দ এসে হাজির।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়িময় সাড়া পড়ে গেল। সুরমা-শিবানী-হেমনাথ-অবনীমোহন সবাই ছুটে এলেন।

আনন্দ বলল, 'কলকাতা থেকে আমরা বেস্পতিবার এসেছি।' বলে হাসল, তার হাসিটা কেমন যেন লজ্জার রঙে ছোপানো।

সুরমা বললেন, 'বিনুর কাছে সেদিনই আমরা খবর পেয়ে গেছি।'

'বিনুর সঙ্গে স্টিমারঘাটে আমাদের দেখা হয়েছিল।'

স্নেহলতা বললেন, 'উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা নয়। চল, ঘরে চল—' ঝুমাদের হাত ধরে তিনি নিজের ঘরে এনে বসালেন। অন্য সবাই তাদের সঙ্গে সঙ্গে এল।

ঘরে এসে আনন্দ বলল, 'জাপানী বোমার ভয়ে কলকাতা থেকে লোক পালাবার হিড়িক পড়ে গেছে। আমার বাবা মা, ভাই-বোনেরা মধুপুরে চলে গেছে—'

সুরমা শুধোলেন, 'মধুপুরে কে আছে ?'

'কেউ নেই। আমাদের একটা বাড়ি আছে, একজন মালী দেখাশোনা করে।'

'কলকাতায় একখানা বাড়ি আছে না তোমাদের ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

আগের বার সুযোগ হয়নি। এবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা জেনে নিলেন সুরমা। আনন্দর বাবা অ্যাডভোকেট, দুই দাদা বড় সরকারী চাকুরে। ছোট ভাইটা বি. এ. পড়ছে। বড় বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট যে বোন দুটো রয়েছে তারা এখনও ছাত্রী। বাকি রইল আনন্দ নিজে। আগেই এম. এ. আর ল'টা পাশ করেছিল। কিছুদিন হল, বাবার সঙ্গে কোর্টে যেতে শুরু করেছে। আশা, বাবা বেঁচে থাকতে থাকতেই সে দাঁড়িয়ে যাবে। অ্যাডভোকেট

হিসেবে বাবার বিপুল প্রতিষ্ঠা। তাঁর প্রতিষ্ঠা এবং খ্যাতি আনন্দকে অনেকখানি এগিয়ে দেবেই। দু-চার বছর বাবার সঙ্গে বেরুতে পারলে সাফল্যের চাবিকাঠিটার সন্ধান নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তবে যুদ্ধটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওটা না থামলে কিছুই হবে না।

সুরমার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেল আনন্দ, 'জাপানী বোমার ভয়ে আমাদের বাড়ির সবাই গেল মধুপুর। দিদি-জমাইবাবু আমাকে কিছুতেই ছাড়লেন না, টানতে টানতে রাজদিয়ায় নিয়ে এলেন।'

কৌতুকের গলায় হেমনাথ হঠাৎ বলে উঠলেন, 'রাজদিয়ায় আসতে তোমার বুঝি একটুও ইচ্ছা ছিল না?' বলে চোখের মণি দুটো কোণে এনে আড়ে আড়ে সুনীতির দিকে তাকালেন।

বিনু লক্ষ্য করেছে, এতক্ষণ একদৃষ্টে আনন্দের দিকে তাকিয়ে ছিল সুনীতি। তার চোখেমুখে ঢেউয়ের মতন কী খেলে যাচ্ছিল। হেমনাথ তাকাতেই দ্রুত মুখ নামিয়ে নখ খুঁটতে লাগল।

এদিকে আনন্দ থতমত খেয়ে গিয়েছিল, 'না—মানে, দু বছর আগে যখন এসেছিলাম রাজদিয়া আমার খুব ভাল লেগেছিল। তাই—'

বাধা দিয়ে হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'তুমি আর যাই হও, উৎকৃষ্ট উকিল হতে পারবে না—' বলে ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগলেন, 'নিজের কেসটা পর্যন্ত ভাল করে সাজাতে পার না!'

অপলক তাকিয়ে থেকে কি যেন বুঝতে চেষ্টা করল আনন্দ, তারপর হেমনাথের সঙ্গে সুর মিলিয়ে হেসে উঠলো।

একটু ভেবে হেমনাথ বললেন, 'এবার বন্দুক-টন্দুক এনেছ তো? তোমার যা শিকারের নেশা।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, এনেছি। টোটা আর ছর্‌রা মিলিয়ে এনেছি পুরো এক বাক্স।'

স্নেহলতা বললেন, 'রাজদিয়ার জন্তু-জানোয়ার আর পাখিদের দেখছি বড়ই দুর্দিন।

প্রগলভতার ঈশ্বর আজ বুঝি হেমনাথের কাঁধে ভর করে বসেছে। চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রগড়ের সুরে আনন্দকে বললেন, 'তুমি যা শিকারী তা আমার জানা আছে। নিশানার এক শ' হাত দূর দিয়ে গুলি চয়ে যায়। অবশ্য—'

আনন্দ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'এক জায়গায় তীর ঠিক বিঁধিয়েছ। সেখানে নিশানা ভুল হয় নি—' বলে চোরা চোখে সুনীতিকে বিদ্ধ করলেন।

সুনীতি সেই যে মুখ নামিয়েছিল, আর তোলে নি। সমানে নখ খুঁটেই চলেছে।

হকচকিয়ে আনন্দ কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় বিনুর মনে হল কাঁধের কাছে কেউ মৃদু টোকা দিচ্ছে। মুখ ফেরাতেই সে দেখতে পেল, ঝুমা।

চোখে চোখ পড়তেই ঝুমা বলল, 'চল—'

'কোথায় ?'

'তোমাদের বাগানে বেড়াই গে। এখানে বসে বসে বড়দের কথা শুনে কী হবে ? তার চাইতে আমরা গল্প করব।'

একটু চুপ করে থেকে বিনু বলল, 'চল—,

দু'জনে ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে চলে এল।

হেমনাথের বাড়ির নক্সা-করা টিনের চালগুলোতে রোদ ঝলকে যাচ্ছে। পুকুরে, দূর ধানখেতে, গাছপালার মাথায় কিংবা আকাশ জুড়ে—যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, রোদের ছড়াছড়ি। কিন্তু বাগানের ভেতরটা বড় ছায়াচ্ছন্ন, নিঝুম, মায়ের কোলের মতন ঠাণ্ডা। এখানে এলেই যেন ঘুমে চোখ জুড়ে যায়।

মৌটসুকি আর হলদিমনা পাখিগুলো ঘন জামরুল পাতার ভেতর বসে বসে খুনসুটি করছিল। চোখ-উদানে ঝোপের জঙ্গলে ঝাঁকে ঝাঁকে সোনাপোকা উড়ছিল। বড় বড় ঘাসের মাথায় সবুজ রঙের গঙ্গাফড়িং ঢ্যাঙা পায়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল। কতকগুলো বহুরূপী অকারণেই ছোটাছুটি করছিল। আর শোনা যাচ্ছিল ঝিঁঝির ডাক। কোন পাতাল থেকে তাদের বিলাপ উঠে আসছিল, কে বলবে।

মুত্রাঝোপের পাশে, কাঁটাবেতের বনের ধারে, কিংবা আম-জাম-বাতাবী লেবু গাছের তলায় তলায় বিনুরা কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল। কিন্তু একটা জায়গাও মনঃপূত হল না।

শেষ পর্যন্ত ঝুমা বলল, 'চল, পুকুরঘাটে গিয়ে বসি—'

বিনু তক্ষুনি সায় দিল, 'চল—'

পুকুরঘাটটা নারকেল গুঁড়ি দিয়ে বাঁধানো। বসতে গিয়েই ঝুমার চোখে পড়ল, ডান ধারে সরু পিঠক্ষীরা গাছটার গায়ে একটা ছোট একমাল্লাই নৌকো বাঁধা রয়েছে।

ঝুমা তাড়াতাড়ি মত বদলে ফেলল, 'এখানে বসব না।'

'তা হলে কোথায় বসবে ?'

'নৌকোয় চড়ব।'

নৌকোর নামে বিনুও উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'সেই ভালো। এসো—'

দু'জনে পিঠক্ষীরা গাছটার দিকে এগিয়ে গেল।

প্রথমে ঝুমাকে নৌকোয় তুলল বিনু, তারপর নিজে উঠে বাঁধন খুলে বৈঠা হাতে গলুইর কাছে বসল।

ঝুমা বলল, 'সেবার তুমি আর আমি নৌকোয় করে অথৈ জলে চলে গিয়েছিলাম, মনে আছে বিনুদা?'

'হুঁ—' বলেই বৈঠার খোঁচায় নৌকোটাকে মাঝ-পুকুরে নিয়ে এল বিনু।

'সেবার কিন্তু আমরা নৌকো বাইতে জানতাম না। কি কষ্টে যে পুকুর পার হয়ে ঐ ধানখেতের দিকে গিয়েছিলাম।'

'এবার আর কষ্ট হবে না। আমি নৌকো বাওয়া শিখে গেছি।'

সেবারের মতন এবারও চারদিকে শুধু জল। পুকুরের ওপারে ধানখেত, মাঠ—সব একাকার। মাঠের মাঝখানে হিজল আর বন্য গাছগুলোর বুক পর্যন্ত ডুবে গেছে। হিজলের যে ডালগুলো জলের ওপরে, ফুলে ফুলে সেগুলো ছাওয়া। আর বন্য গাছের ডাল থেকে শক্ত শক্ত অসংখ্য গোলাকার ফল ঝুলছে। ধানখেত বাদ দিলে যে মাঠ, সেখানে শুধু শাপলা শালুক আর পদ্মবন।

পুকুর, ধানখেত পার হয়ে একসময় শাপলাবনে এসে পড়ল বিনুরা।

হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়তে ঝুমা বলে উঠল, 'তোমাকে তো নিয়ে এলাম। সেবারের মতন আবার কাণ্ড করে বসবে না?'

'কিসের কাণ্ড?'

'কাউফল পাড়তে গিয়ে জলে ডুবে গিয়েছিলে, মনে পড়ে?'

বিনু বলল, 'এখন আর ডুবব না, সাঁতার শিখে গেছি।'

চোখের তারা স্থির করে ঝুমা বলল, 'বাবাঃ, তুমি দেখছি অনেক কিছু শিখে গেছ। নৌকো বাইতে শিখেছ, সাঁতার দিতে শিখেছ—'

'বা রে, আমি বড় হয়েছি না?'

'বড় হয়েছ!' বলে নৌকোর মাঝখান থেকে অনেক কাছে চলে এল ঝুমা। তারপর মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এদিক থেকে ওদিক থেকে মিটমিটে দুষ্টুমির চোখে বিনুকে দেখতে লাগল।

বিব্রত মুখে বিনু বলল, 'কী দেখছ?'

'সত্যিই তো বড় হয়ে গেছ! ঠোঁটের ওপর গোঁফ উঠছে—'

বিনু লজ্জা পেয়ে চোখ নামাল।

ঝুমা আবার বলল, 'বড় তো হয়েছ, সিগারেট খাও?'

সিগারেট খাওয়ার সঙ্গে যে স্মৃতিটা জড়ানো তা খুব মনোরম নয়। বিনু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে জানাল, সে সিগারেট খায় না।

ঈষৎ ধিক্কারের গলায় ঝুমা বলল, 'সিগারেট খাও না, কি বড় হয়েছ!'

বিনু চুপ।

কিছুক্ষণ পর ঝুমা শুধলো, 'সেই কাউগাছটা এখনও আছে বিনুদা?'

বিনু বলল, 'আছে।'

'চল, কাউ পাড়ি গে—'

'কাউ এখনও পাকে নি। কাঁচা কাউ পেড়ে কী হবে?'

'তা হলে থাক। শাপলাই তুলি।'

নৌকোর ধারে গিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে কাচের মতন টলটলে জল থেকে শাপলা তুলতে তুলতে ঝুমা বলল, 'আচ্ছা বিনুদা—'

বিনু তক্ষুনি সাড়া দিল, 'কী বলছ?'

'মনে পড়ে, সেবার রাত্রিবেলা লুকিয়ে লুকিয়ে যাত্রা শুনতে গিয়েছিলাম—'

'হুঁ।'

'ঝিনুকটার কি হিংসে; আগে থেকে নৌকোয় উঠে বসে ছিল—'

'হুঁ।'

'আমরা কলকাতায় চলে যাবার পর তুমি আর যাত্রা দেখেছ?'

'না।'

'কেন?'

'কে দেখাবে বল?'

'কেন, যুগল।'

'যুগল তো এখানে নেই।'

'কোথায় গেছে?'

'বিয়ের পর ভাটির দেশে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে।'

'ও মা, তাই নাকি। আর ফিরবে না?'

'না।'

অতেকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর ঝুমাই আবার শুরু করল, 'জানো বিনুদা—'

'কী?'

'কলকাতায় যাবার পর তোমার কথা খালি মনে পড়ত।'

'আমারও।'

'ছাই।' ঠোঁট উল্টে দিল ঝুমা।

বিনু বলল, 'বিশ্বাস কর, সত্যি মনে পড়ত।'

'রোজ ভাবতাম, আমাদের বাড়ি আসবে।'

'কি করে যাব বল? আমরা তো রাজদিয়ায় থেকে গেলাম। কলকাতায় যাওয়া হল না।'

ঝুমা বলল, যাওয়া না হয় না-ই হয়েছিল, চিঠি লিখলেও তো পারতে।'

বিমূঢ়ের মতন বিনু বলল, 'চিঠি লিখব!'

'হ্যাঁ; জানো না 'লাভার'রা চিঠি লেখে। তোমার দিদি আর আমার মামা ঝুড়ি ঝুড়ি চিঠি লিখত।'

'লাভার' শব্দটার মানে বিনুর অজানা নয়। তবু সে জিজ্ঞেস করল, 'লাভার কী?'

'আহা-হা। তুমি একটি গর্দভচন্দ্র শিকদার—' লাজুক হেসে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে ঝুমা বলল, 'যাদের মধ্যে ভাব থাকে তাদের লাভার বলে।'

ফস করে বিনু বলে ফেলল, 'আমি কি তোমার—'শেষ শব্দটা গলার ভেতর থেকে কিছুতেই বার করে আনতে পারল না সে।

ঘাড় বাঁকিয়ে কেমন করে যেন হাসল ঝুমা, 'তুমি আমার কী?'

বিনু কিছু বলতে পারল না, ঝুমার দিকে তাকিয়েও থাকতে পারল না। মুখ নামিয়ে এলোমেলো নৌকো বাইতে লাগল।

এরপর কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ। শাপলা আর বড় বড় পদ্মপাতা তুলে তুলে নৌকো বোঝাই করে ফেলতে লাগল ঝুমা, আর বিনু লক্ষ্যহীনের মতন কখনও উত্তরে কখনও দক্ষিণে নৌকোটা ছুটিয়ে বেড়াতে লাগল।

একসময় ঝুমা ডাকল, 'বিনুদা—'

'কী বলছ?' এক পলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল বিনু।

'কলকাতা থেকে আসবার আগের দিন একটা ইংরেজি সিনেমা দেখেছিলাম—'

'কী সিনেমা?'

'ফাইটের। খুব লড়াই ছিল। আর—'

'আর কী?'

ঠোঁট টিপেটিপে চোখের তারায় হাসতে লাগল ঝুমা, 'এখন বলব না।'

বিন্নু শুধলো, 'কখন বলবে ?'

'একদিনে সব শুনতে চাও নাকি ? কাল স্কুল ছুটির পর আমাদের বাড়ি যেও তখন বলব।'

সেবার ঝুমা ছিল দুরন্ত, দুর্দান্ত, দুঃসাহসী। দু বছর পর কলকাতা থেকে অসীম রহস্যময়ী হয়ে ফিরে এসেছে মেয়েটা।

একটু ভেবে বিন্নু বলল, 'স্কুল ছুটির পর দেরি করে বাড়ি ফিরলে মা বকে—'

ঝুমা বলল, 'আমি মাসিমাকে বলব'খন।'

'আচ্ছা।'

নৌকোয় ওঠার পর থেকে কত কথা যে বলেছে ঝুমা! অনেক সময় এক কথার সঙ্গে আরেক কথার মিল ছিল না। তবু এই অসংখ্য অসংলগ্ন কথা, ঝুমার হাসি, চোখের তারায় অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত—সব যেন বিন্নুকে হাতছানি দিয়ে দিয়ে এক অচেনা রহস্যের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

আদিগন্ত এই মাঠের ভেতর শুধু জল আর জল। মাঝে মাঝে ধানখেত, নলখাগড়ার ঝোপ, মুত্রার জঙ্গল, শাপলাবন, শালুকবন, পদ্মবন, কদাচিৎ আধটা বন্য কি হিজল গাছ ছাড়া কেউ নেই, কিছু নেই। এই নির্জন জলপূর্ণ চরাচরে নিঝুম দুপুরবেলায় ঝুমাকে বড় ভাল লাগছে। আবার কেমন যেন ভয়ও করছে বিন্নুর। বুকের ভেতর ছোট ছোট ঢেউয়ের মতন কি যেন বয়ে যাচ্ছে তার।

রোদের রঙ যখন গাঁদাফুলের মতন হলুদ হয়ে এল সেই সময় ঝুমা বলল, 'অনেকক্ষণ এসেছি। এবার ফিরবে না ?'

বিন্নু বলল, 'হ্যাঁ।'

পুকুরঘাটে ফিরে এসে বিন্নু অবাক। জলে পা ডুবিয়ে নারকেল গুঁড়ির সিঁড়িতে একা একা বসে আছে ঝিনুক।

সেই পিঠক্ষীরা গাছটার গায়ে নৌকো বাঁধতেই প্রথমে লাফ দিয়ে পারে নামল ঝুমা, তারপর বিন্নু। নেমেই বিন্নু ঝিনুককে শুধলো, 'এখানে বসে আছ যে ?'

আধফোটা গলায় ঝিনুক বলল, 'এমনি।'

'কখন থেকে বসে আছো ?'

'অনেকক্ষণ। তোমরা যখন নৌকোয় করে ধানখেতের ভেতর ঢুকলে সেই তখন থেকে—'

বিন্নুর একবার ইচ্ছে হল, জিজ্ঞেস করে, তাদের পিছু পিছু কি ঘর থেকে

পুকুরঘাট পর্যন্ত চলে এসেছিল ঝিনুক ? কি ভেবে জিজ্ঞেস করল না। বিনুর মন ছায়াচ্ছন্ন হয়ে রইল।

বাড়িতে এসে বেশিক্ষণ থাকতে পারল না ঝুমা। একটু পর তাকে নিয়ে আনন্দ চলে গেল।

যাবার আগে অবশ্য ঝুমা সুরমাকে বলে গেছে, 'স্কুল ছুটির পর বিনুদা কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি যাবে মাসিমা। আপনি বকতে পারবেন না।'

সরল মনে সুরমা বলেছেন, 'তোমাদের বাড়ি গেলে বকব কেন ? নিশ্চয়ই যাবে।'

বিনু লক্ষ্য করেছে, সেইসময় একবার তার দিকে আরেকবার ঝুমার দিকে তাকাচ্ছিল ঝিনুক। কি যেন খুঁজবার চেষ্টা করছিল সে।

॥ ছত্রিশ ॥

পরের দিনই স্কুল ছুটির পর ঝুমাদের বাড়ি গেল বিনু।

তাকে দেখেই চোখের কোণে হেসে ফেলল ঝুমা, 'একেবারে গুড বয়। আজ আসতে বলেছি, আজই এসেছ—'

খানিকক্ষণ এ-গল্প সে-গল্পের পর ঝুমাকে একলা পেয়ে বিনু বলল, 'এবার সিনেমার কথাটা বল।'

'ও বাবা, ছেলের আর তর সয় না।'

কিছুতেই সিনেমার কথাটা সেদিন বলল না ঝুমা।

সেদিন কেন, আরো দিনকয়েক বিনুকে ঘোরাল ঝুমা। তারপর একদিন বিকেলবেলা বিনু ওদের বাড়ি যেতেই তাকে ছাদে নিয়ে গেল। কার্নিসের ধারে নিরালা একটু কোণ দেখে তারা দাঁড়াল।

দূরে স্টিমারঘাটা আর বরফকলের চুড়োটা চোখে পড়ছে। ডানধারে ঝাউ-বনের ওপারে সারি সারি মিলিটারি ব্যারাক। ব্যারাকের ওধারে বিকেলের রোদ গায়ে মেখে নদীর ঢেউগুলো টলমল করছে। মোচার খোলার মতন কেরায়া আর ভাউলে নৌকোগুলো দুলছে। ছেঁড়া ছেঁড়া রঙীন পাঁপড়ির মতন আকাশময় ঝাঁক ঝাঁক পাখি উড়ছে।

বিনু বলল, 'এবার বল—'

ভুরু দুটো বাঁকিয়ে-চুরিয়ে ঝুমা বলল, 'শুনবার জন্যে ঘুম হচ্ছিল না বুঝি ?'

এবার প্রথম দু-একদিন মুখচোরার মতন ছিল বিনু, এখন সাহস বেড়ে গেছে। সে বলল, 'হচ্ছিলই না তো—'

একটু চুপ করে থেকে ঝুমা বলল, 'সিনেমাটায় কী ছিল জানো—' বলেই দুহাতে মুখ ঢেকে খিল খিল করে হেসে উঠল।

'হাসছ কেন, বল—'

অনেকক্ষণ হাসবার পর স্থির হল ঝুমা। তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ফিসফিস গলায় বলতে লাগল, 'সিনেমায় একটা সাহেব একটা মেমসাহেবকে খুব 'কিস' খাচ্ছিল—'

নাক-মুখ ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল বিনুর। অবিশ্বাসের গলায় সে বলল, 'যাঃ—'

'সত্যি বিনুদা, মা কালীর দিব্যি।'

খানিক চিন্তা করে বিনু বলল, 'সাহেবটার কত বয়েস?'

'সাতাশ আটাশ—'

'আর মেমটার?'

'বাইশ তেইশ।'

'এত বড় ছেলেমেয়ে কখনো 'কিস' খায়!'

মুখ ফিরিয়ে ঝুমা বলল, 'তুমি একটা হাঁদারাম, কিচ্ছু জানো না। 'লাভার' হলেই 'কিস' খায়। এই যে আমার দিদি—'

বিনু শুধলো, 'তোমার দিদি কী?'

'কলকাতায় দিদির এক 'লাভার' আছে—অনিমেষদা। আমাদের বাড়ি এলেই দু'জনে ছাদে চলে যেত। তারপর খুব 'কিস' খেত।

সমস্ত শরীর কেমন যেন জ্বরের মতন লাগছিল। ঝাপসা কাঁপা গলায় বিনু বলল, 'সত্যি?'

'সত্যি।'

তারপর কী হয়ে গেল, কে বলবে। কিছুক্ষণের জন্য সময় যেন তার গতি হারিয়ে এই নির্জন ছাদে স্তব্ধ হয়ে রইল। বিনুর যখন জ্ঞান ফিরল, দেখতে পেল, বুকের ভেতর ঝুমা চোখ বুজে আছে। চকিত বিনু এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়িঘরের দিকে ছুটল। তরতর করে নীচে নেমে রাজদিয়ার রাস্তা দিয়ে আচ্ছন্নের মতন সে ছুটতে লাগল, ছুটতেই লাগল। তার চারধারে চরাচর যেন দুলতে শুরু করেছে।

বিনু জানে না, একটু আগে ঝুমা তার হাত ধরে কৈশোর থেকে যৌবনের সিংহদরজায় পৌঁছে দিয়েছে।

স্কুলের ছুটি হলে আজকাল আর কোন দিকে তাকায় না বিন্নু, সম্মোহিতের মতন নেশাগ্রস্তের মতন ঝুমাদের বাড়ি চলে যায়। এই সময়টার জন্য সারাদিন অস্থির উন্মুখ হয়ে থাকে সে।

অশোকের কাছে জীবনের রহস্যময় একটা দিকের কথা কিছু কিছু শুনেছিল বিন্নু। কিন্তু সে সব ভাসা-ভাসা, মৌখিক। ঝুমা যেন একটানে চারদিকের সব পর্দা ছিঁড়ে সেই রহস্যটাকে তার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

এইভাবেই চলছিল। হঠাৎ একদিন স্কুল ছুটির পর ঝুমাদের বাড়ি এসে বিন্নু অবাক; ঝিনুক বসে আছে।

বিন্নু শুধলো, 'তুমি!'

ঝিনুক বলল, 'সুধাদিদি, সুনীতিদিদির ছুটি হতে আজ অনেক দেরি হবে। কতক্ষণ আর স্কুলে বসে থাকব! তুমি আমাকে বাড়ি নিয়ে চল।'

স্কুল ছুটির পর ঝিনুক তার ক্লাসে বসে থাকে। কলেজ থেকে ফেরার পথে সুধা-সুনীতি বাড়ি নিয়ে যায়। দু বছর এই নিয়মেই কেটেছে। আগেও তো সুধা-সুনীতি কত দেরি করে তাকে বাড়ি নিয়ে গেছে! এতকাল পর হঠাৎ বিন্নুর সঙ্গে বাড়ি ফেরার কেন যে দরকার হল ঝিনুকের, কে বলবে।

যাই হোক, আজ আর ঝুমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলতে পারল না বিন্নু। একটু পর ঝিনুককে নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

আশ্চর্য! পরের দিনও ছুটির পর দেখা গেল ঝুমাদের বাড়ি এসে বসে আছে ঝিনুক। তারপরের দিনও সেই ব্যাপার।

দু-চারদিন দেখে ঝিনুকের চাতুরি ধরে ফেলল বিন্নু। এখন আর ছুটির পর ঝুমাদের বাড়ি যায় না সে, স্কুল কামাই করে দুপুরবেলা ঝুমাদের বাড়ি যেতে লাগল।

ঝিনুকের সাধ্য কি ঝুমার কাছ থেকে বিন্নুকে ফেরায়!

॥ সাঁইত্রিশ ॥

কিছুদিন ধরেই খবরকাগজে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল, ঝড় আসছে।

পরাধীন দেশের আত্মা অপমানে অত্যাচারে টগবগ করে ফুটছিল। টের পাওয়া যাচ্ছিল, যে কোনদিন বিস্ফোরণ ঘটে যাবে।

কিছুদিন আগে ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। তারপর কয়েকটা মাস সমস্ত ভারতবর্ষ যেন রুদ্ধশ্বাসে অনিবার্য কোন পরিণামের প্রতীক্ষা করছিল।

শেষ পর্যন্ত সেই দিনটি এসে গেল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে গান্ধীজী আগেই 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনের কথা বলেছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটি তাকে একটা প্রস্তাবে রূপ দেয়।

আটই আগস্ট বোম্বাইতে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হল।

এইসময় বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেছেন, 'এই আন্দোলনে আমি আপনাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করছি। অধিনায়ক হিসেবে নয়, আপনাদের সকলের ভৃত্য হিসেবে।' তারপরেই সমস্ত জাতির উদ্দেশ্যে ডাক দিলেন, 'ব্রিটিশ ভারত ছাড়—কুইট ইণ্ডিয়া—'

সারা দেশে যেখানে যত বিক্ষোভ, যত বেদনা, যত অসম্মান পুঞ্জীভূত হয়েছিল সব এক নিমেষে দৃপ্ত অগ্নিশিখা হয়ে উঠল যেন। আর সেই ঊর্ধ্বমুখ শিখার শীর্ষে দুটি অক্ষর জ্বলতে লাগল, 'কুইট ইণ্ডিয়া—'

'কুইট ইণ্ডিয়া—' শৃঙ্খলিত দেশ এই মন্ত্রটির জন্য যুগ যুগ তপস্যা করেছে। কোটি কোটি মানুষ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন চকিত হয়ে উঠল।

কিন্তু তারপরেই নিদারুণ খবর এল। 'রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনের পর গান্ধীজী, রাষ্ট্রপতি আজাদ, প্যাটেল, জওহরলাল, সরোজিনী নাইডু, ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ, আসফ আলী, কৃপালনী, সীতারামাইয়া এবং সৈয়দ মামুদ সহ ওয়ার্কিং কমিটির সব সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

'বিড়লাভবনে কস্তুরবা, গান্ধীজীর একান্ত সচিব প্যারেলাল, ডাক্তার সুশীলা নায়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ। এলাহাবাদে ট্যাণ্ডন এবং কাটজু।'

সারা দেশ জুড়ে শুধু ধরপাকড়ের খবর। নেতাদের কেউ বাইরে নেই, সবাই কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

নেতৃহীন অনাথ দেশ এ অসম্মান নীরবে মেনে নিল না। যুগ-যুগান্তর ধরে বুকের ভেতর যে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ বারুদ হয়ে ছিল দিকে দিকে তার বিস্ফোরণ শুরু হল। কোথায় মহারাষ্ট্র, কোথায় বিহার, কোথায় পাঞ্জাব—দিগ্‌দিগন্ত থেকে কত খবর যে আসতে লাগল। এখানে টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়েছে, ওখানে মাইলের পর মাইল রেল লাইন উপড়ে ফেলেছে, সেখানে থানা আক্রমণ, ডাকঘরে আগুন। ওদিকে বিদেশী শাসকও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকল না।

রক্তচক্ষু মেলে তারা দিগ্বিদিকে ছুটতে লাগল। পরাধীন দেশের জাগ্রত বিবেককে স্তব্ধ করে না দেওয়া পর্যন্ত তার ঘুম নেই।

শুরু হয়ে গেল সন্ত্রাসের রাজত্ব। গুলি, ধরপাকড়, গ্রেপ্তার। বেয়নেটের ধারাল ফলায় কত মানুষের বুক ফালাফালা হয়ে গেল, রাইফেলের নল থেকে বুলেট ছুটে গিয়ে কত মানুষের পাঁজর বিদীর্ণ করে দিল। জেলখানাগুলো ভরে উঠতে লাগল।

সৌরাষ্ট্র থেকে আসাম, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী—সমস্ত দেশ উত্তাল, ছোট-বড় অসংখ্য ঢেউয়ে তরঙ্গিত। কোটি কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণের মতন একটি মাত্র শব্দ শোনা যায়, 'কুইট ইণ্ডিয়া—'

'বৃটিশ—'

'ভারত ছাড়—'

সারা দেশ যখন দুলছে, রাজদিয়া কি স্থির থাকতে পারে? ঝড়ের ঢেউ এই ছোট রাজদিয়াতে এসেও ভেঙে পড়ল।

বিনুদের স্কুলের হেডমাস্টার মোতাহার হোসেন সাহেব, কংগ্রেসের স্থানীয় সেক্রেটারি, সেদিন একটা মিছিল বার করলেন। পতিতপাবন খলিল থেকে শুরু করে কে নেই তাতে? কলেজের ছেলেরা এসেও যোগ দিল। শুধু কি স্কুল কলেজের ছেলেরা? রাজদিয়া-বাসীদের অনেকেই মিছিলে এসেছে। সারা শহর বেরিয়ে পড়েছে। বিনু কি চুপ করে ঘরে বসে থাকতে পারে? সেও ছুটে এসেছে। প্রায় সবার হাতেই একটা করে ত্রিবর্ণ পতাকা।

সমস্ত দেশ জুড়ে যে বর্বরতা চলছে তার প্রতিবাদ করতে হবেই। শোভাযাত্রা শহরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। সেই সঙ্গে অসংখ্য কণ্ঠে শোনা যেতে লাগল:

'বন্দে মাতরম্—'

'বন্দে মাতরম্—'

'ভারত মাতাকি—'

'জয়—'

'ব্রিটিশ—'

'ভারত ছাড়—'

ঘুরতে ঘুরতে থানার কাছে আসতেই হঠাৎ পুলিসরা লাঠি চার্জ শুরু করে দিল। একটা লাঠি পড়ল বিনুর হাঁটুতে। লুটিয়ে পড়তে পড়তে বিনু দেখতে পেল, মোতাহার হোসেন সাহেবের মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। শুধু কি মোতাহার সাহেবই, কত ছেলের যে হাত-পা ভেঙেছে হিসেব নেই।

শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। অনেকে পালাচ্ছে। থেকে থেকে গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে।

দেখতে দেখতে একসময় বেহুঁশ হয়ে পড়ল বিনু। জ্ঞান ফিরলে দেখল সদর হাসপাতালে শুয়ে আছে, পায়ে মস্ত ব্যাণ্ডেজ। তার পাশের বেডে মোতাহার সাহেব। চারদিকের সারি সারি বেডগুলোতে আরো অনেক ছেলে। বেড বেশি নেই বলে অনেককে মেঝেতে ফেলে রাখা হয়েছে।

হাসপাতালে সাতদিন থাকতে হল। এর ভেতর হেমনাথ আর ঝিনুক রোজই আসে।

ঝিনুক ছলছল করুণ চোখে তাকিয়ে বলে, 'তোমার খুব লেগেছে, না বিনুদা?'

বিনু হাসে, 'না, তেমন কিছু নয়।'

সুরমা, অবনীমোহন, সুধা-সুনীতি একদিন পর পর এসে দেখে যায়। ঝুমাও এল একদিন। ঠোঁট টিপে বলল, 'আচ্ছা বীরপুরুষ!'

হাসপাতালে থাকার সময় বিনু লক্ষ্য করেছে, দিনরাত পুলিস সারা হাসপাতালটা ঘিরে রেখেছে। সাতদিন পর পুলিস পাহারাতেই কোর্টে যেতে হল। তাদের বিরুদ্ধে থানা আক্রমণের অভিযোগ আনা হয়েছে।

বিচারে পনের দিনের জেল হয়ে গেল বিনুর, মোতাহার সাহেবের হল দু মাস। অন্য ছেলেদেরও দশ থেকে পনের দিনের সাজা হল।

মুক্তির দিন জেল গেটে সে কি দৃশ্য! সারা রাজদিয়া যেন ভেঙে পড়েছে সেখানে। বিনুরা বেরিয়ে আসতেই কারা যেন গলায় ফুলের মালা দিয়ে কাঁধে তুলে ফেলল। কাঁধে চড়েই বাড়ি ফিরল সে।

জেল খাটা, পা-ভাঙার জন্য অবনীমোহন বা সুরমা সুখী নন। তাঁরা বলতে লাগলেন, 'হৈ-হৈ করে কতগুলো দিন নষ্ট করল। এ বছর কিছুতেই ও পাশ করতে পারবে না। একটা বছর মাটি হবে।

হেমনাথ বিনুর পক্ষ নিয়ে বললেন, 'হোক নষ্ট, পড়াশোনার জন্য সারা জীবন পড়ে আছে কিন্তু এমন দিন আর কখনও আসবে না। সেদিন নিজে থেকে প্রসেশানে না গেলে আমিই ওকে দিয়ে আসতাম।'

'ভারত ছাড়' আন্দোলনের উত্তেজনা কেটে যেতে বেশ সময় লাগল। তারপর স্কুল, পড়াশোনা, ছুটির পর ঝুমাদের বাড়ি যাওয়া, ঝিনুকের সঙ্গে লুকোচুরি দিয়ে ঘেরা সেই পুরনো অভ্যস্ত জীবনের ভেতর আবার ফিরে গেল বিনু।

।। আটত্রিশ ।।

অবনীমোহনের সঙ্গে একদিন সুজনগঞ্জের হাটে গিয়ে বিনু দেখে এসেছিল, একদানা ধানচাল পাওয়া যাচ্ছে না। নদীর পার ঘেঁষে সারি সারি আড়তগুলো তালাবন্ধ। বিনু শুনে এসেছিল, এখান থেকে বিশ মাইল উত্তরে গিরিগঞ্জ নামে যে বাজারটা আছে সেখানে ক'টা খাদ্যশস্যের দোকান লুট হয়ে গেছে।

সেই থেকে অবস্থা দিন দিন আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সারা রাজ্য থেকে ধানচাল উধাও হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে দূর দূরান্তের হাট থেকে লুটপাটের খবর আসে। চারদিকের গ্রামগুলো থেকে, নদীর চরগুলো থেকে আরো যা খবর আসে তা ভয়াবহ। ধানচাল নেই, তাই ওসব জায়গার বাসিন্দারা মেটে আলু, মিট কুমড়ো, কচু, কন্দ, শাপলা, শালুক সেদ্ধ করে প্রথম দিকে চালিয়েছে। তারপর আমপাতা, জামপাতা, শিউলি পাতা ; যা পেয়েছে তাই খেয়েছে। এখন নাকি ইঁদুর, খরগোশ পুড়িয়ে খাচ্ছে।

ধানচাল উধাও হবার পর হেমনাথের বাড়ি লোকজনের আনাগোনা বেড়ে গেছে। প্রতিদিনই দুপুরে আট দশজন করে বাইরের লোক খেয়ে যাচ্ছে। আজকাল নিবারণ পিওন প্রায়ই আসে। এ ছাড়া এ গ্রামের, ও গ্রামের চেনা-অচেনা কত মানুষ যে আসছে। ঠিক দুপুরবেলা বার-বাড়ির উঠোনে এসে করুণ গলায় তারা বলে, 'অতিথ্ আসলাম গো মা-ঠাইরেন ; সাত দিন প্যাটে ভাত পড়ে নাই।'

এ তো গেল দুপুরবেলার কথা, রাতের অন্ধকারে যুগীপাড়া-ঋষিপাড়া-নমঃ-শূদ্রপাড়ার বৌ-ঝিরা আসে। স্নেহলতাকে বলে, 'দুই মুঠা চাউল দ্যান গো বইনদিদি ; তিনদিন আখা (উনুন) ধরাই নাই।'

চিরদিন স্নেহলতা বা হেমনাথ দিয়েই এসেছেন ; কারোকে কখনও বিমুখ করেন নি। এই দুঃসময়েও তাঁরা দিয়েই যাচ্ছেন। কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে, কে জানে।

প্রতি বছরই মাঠ থেকে ধান ওঠাবার পর খোরাকির চাইতে কিছু বেশি রেখে বাদবাকি বেচে দ্যান হেমনাথ। যেভাবে লোকজন খেয়ে যাচ্ছে, যুগীপাড়া-ঋষিপাড়ার বউ-ঝির চাল নিচ্ছে, তাতে নিজেদেরই হয়তো একদিন

উপোস দিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু পরের কথা ভেবে স্নেহলতা বা হেমনাথ মন ভারাক্রান্ত করেন না। পরে যা হবার হবে; এখন মানুষের প্রাণ তো বাঁচুক।

দেখতে দেখতে আরেক পুজো চলে গেল।

পুজোর পর মাঠের জলে যখন টান ধরল, ধানের শিষগুলো গাঢ় সবুজ হয়ে এল সেইসময় একদিন হরিন্দ এবং তার দুই মোষের মতন ঢাকী কাগা-বগা রাজদিয়ার রাস্তায় রাস্তায় ঢেঁড়া দিয়ে গেল, 'যার যত নাও আছে তিন দিনের ভিতর সগল থানায় জমা দিবা। গরমেণ্টের হুকুম। জমা না দিলে বিপদ আছে।'

বিনু স্কুলে যেতে যেতে ঢেঁড়া শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'নৌকো জমা দিতে হবে কেন?'

হরিন্দ যা বলল তা এইরকম। জাপানীরা যে কোনদিন পুববাংলায় এসে পড়তে পারে। এসেই যদি নৌকো পেয়ে যায় মিত্রশক্তির পক্ষে বিপদ ঘটে যাবে। তাই সতর্কতা হিসেবে নৌকো আটক করা হচ্ছে। বিপদ কেটে গেলেই ফেরত দেওয়া হবে।

বিনু একাই না, রাজদিয়ায় আরো অনেকে হরিন্দর চারপাশে ভিড় জমিয়েছিল। তাদের ভেতর ভীত সন্ত্রস্ত গুঞ্জন উঠল, 'হে ভগবান, নাও হইল আমাগো হাত-পাও। নাও যদি আটকায় আমরা কী করুম? খামু কী?'

'এইবার মরণ, মরণ—'

তিন দিনের মধ্যেই দেখা গেল, খাল-বিল-নদী শূন্য করে থানার পাশের মস্ত মাঠটায় অসংখ্য নৌকো উঠে এসেছে। গাছি, ভাউলে, মহাজনী, কোষ, একমাল্লাই, দুমাল্লাই, চারমাল্লাই—কত রকমের যে নৌকো তার লেখাজোখা নেই।

শুধু রাজদিয়ারই না, চারদিকের গ্রাম-গঞ্জ-চর-জনপদ, সব জায়গার নৌকোই আটক করা হয়েছে!

নৌকো আটকের পর একটা সপ্তাহও কাটল না।

আরেক দিন স্কুলে যাবার সময় বিনু দেখতে পেল, নদীর পারে বিরাট ভিড় জমেছে। পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে যেতেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে সে বিমূঢ়।

শত শত লোক নদী সাঁতরে রাজদিয়ার দিকে আসছে। তারা পারে উঠতেই কে যেন জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কোন্‌খানের মানুষ?'

আগন্তুকদের একজন বলল, 'চর-বেউলার।'

'নদী সাতরাইয়া আইলে যে ?'

'কি করুম, গরমেণ্ট নাও লইয়া গেছে। হেয়া ছাড়া আমাগো চরে এক দানা চাউল নাই। পোলামাইয়া লইয়া না খাইয়া আর পারি না।'

আরেকজন বলল, 'হুদা (শুধু) আমাগো চর নিহি, কুনো চরেই চাউল নাই। ছ্যাখেন না দু-একদিনের ভিতর আরো কত মানুষ রাইজদার শহরে আসে।'

সত্যিই দেখা গেল, কয়েকদিনের মধ্যে অসংখ্য মানুষ খাদ্যের আশায় রাজদিয়াতে হানা দিল।

লোকগুলো সারাদিন দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ায় আর গোঙানির মতন শব্দ করে বলে, 'দু'গা (চাট্টি) ভাত দিবেন মা, এট্টু ফ্যান দিবেন—'

বিমর্ষ হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'দুর্ভিক্ষ—দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেছে।'

॥ উনচল্লিশ ॥

শুধু নদীর চরগুলো থেকেই না, চারদিকে গ্রাম-গঞ্জে থেকেও খাদ্যের সন্ধানে কত মানুষ যে রাজদিয়ায় ছুটে এল। এমন কি আঞ্জুমান বেবাজিয়ানীরা পর্যন্ত এসেছে। থানা থেকে তাদের নৌকাও 'সীজ' করে নিয়েছে। যুদ্ধ ভাসমান বেদেবহরকেও রেহাই দ্যায় নি।

আজকাল সমস্ত রাজদিয়া জুড়ে দিনরাত শুধু শোনা যায়, 'মা জননী, দু'গা ভাত দ্যান, এট্টু ফ্যান দ্যান—'

'না খাইয়া খাইয়া শরীলে আর দ্যায় না।'

রাস্তায় বেরুলেই চোখে পড়ে কঙ্কালসার প্রেতের মতন দলে দলে মানুষ দুর্বল অশক্ত পায়ে টলমল করে হাঁটছে, এক দুয়ার থেকে তাড়া খেয়ে যাচ্ছে আরেক দুয়ারে।

অবশ্য রাজদিয়া-বাসীরা একেবারে নির্দয় না। সব বাড়ি থেকে চাল-ডাল যোগাড় করে শহরের দু মাথায় দুটো লঙ্গরখানা খুলে ফেলেছে। সারাদিন পর বেলা হেলে গেলে মাথাপিছু দু হাতা করে তরল ট্যালটেলে খিচুড়ি দেওয়া হতে লাগল।

কিন্তু দেশজোড়া দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে দুটো মোটে লঙ্গরখানা খাড়া করে কতক্ষণই বা যুদ্ধ চালানো যায়! ক'টা লোককেই বা খাওয়ানো চলে!

কাজেই চারিদিকে চুরির হিড়িক পড়ে গেল।

বাজার থেকে ধান-চাল উধাও হবার পর থেকেই চুরি শুরু হয়েছিল। কিন্তু এখন যা চলছে তার সঙ্গে আর কিছুর তুলনাই হয় না।

থালা ঘটি-বাটি-গাড়ু-বদনা, কাঁসা বা পেতলের একটুকরো বাসনও বাইরে ফেলে রাখবার উপায় নেই। রান্নাকরা ভাত-তরকারি পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। তবে সব চাইতে বেশী যা চুরি হচ্ছে তা ধান।

কার্তিকের মাঝামাঝি মাঠের জল নেমে গিয়েছিল। রাজদিয়ার দক্ষিণে এসে দাঁড়ালে, যতদূর চোখ যায়, এখন শুধু ধান, ধান আর ধান।

সবে অঘ্রান পড়েছে। এই মাসের শেষ থেকে আমনের মরসুম। ধানের শিষগুলো এখনও কাঁচাই রয়েছে, তাতে সোনালী আভা লাগেনি। সবুজ তুঁষের ভেতরকার শস্য এখনও যথেষ্ট পুষ্ট নয়। তা হলে কি হবে, রাতের অন্ধকারে মাঠকে মাঠ কাঁচা ধানই কেটে নিয়ে যাচ্ছে।

ধানই যদি চলে যায়, সারা বছর লোকে খাবে কি? চুরি ঠেকাবার জন্য রাজদিয়ার সব বাড়ি থেকে ছেলে নিয়ে নিয়ে ডিফেন্স পার্টি তৈরি হল।

ডিফেন্স পার্টির দুটো কাজ। প্রথমত, রাত জেগে জেগে জমির ধান পাহারা দেওয়া। দ্বিতীয়ত, নদীর ধারে ধারে ঘুরে মহাজনী নৌকোগুলোর ওপর নজর রাখা।

এ অঞ্চলের প্রায় সব নৌকোই যুদ্ধের কল্যাণে 'সীজ' করা হয়েছে। তবে 'স্পেশাল পারমিট' নিয়ে কেউ কেউ দু-একখানা রাখতে পেরেছে। যেমন ব্যবসাদারেরা।

যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ শুরু হবার পর ধান-চাল জামা-কাপড়ের কারবারীরা আর মানুষ নেই। দুঃশাসনের মতন সারা দেশকে বিবস্ত্র এবং নিরন্ন করে তারা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

রাতের অন্ধকারে বেশি লাভের আশায় ব্যবসায়ীরা নৌকো বোঝাই করে রাজদিয়ার ধান-চাল এবং অন্য সব শস্য দূর-দূরান্তে পাচার করে দিতে চাইছে। ডিফেন্স পার্টি তা হতে দেবে না। ঘুরে ঘুরে তারা মহাজনী নৌকো ধরছে।

সব বাড়ি থেকেই দুটি একটি করে যুবক নেওয়া হয়েছে ডিফেন্স পার্টিতে। ঠিক ঐ বয়েসের ছেলে হেমনাথদের বাড়িতে নেই। কাজেই বিনুকেই দলে নিতে হল।

যুদ্ধের দৌলতে রাজদিয়ায় তো কম ছেলে নেই। সবাইকে একসঙ্গে রাত

জাগতে হয় না। ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে পালা করে তারা জাগে। আজ এর পালা পড়লে, কাল ওর। সপ্তাহে দু'দিন জাগতে হয় বিনুকে।

ছেলেরা রাত জাগবে। তাই বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুলে পাঁচ ব্যাটারীর বড় বড় অনেকগুলো টর্চ কেনা হয়েছে, চা আর মুড়মুড়ে 'এস' বিস্কুটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রথম দিন রাত জাগতে এসে বিনু দেখল, তার দলে শ্যামল আর অশোকও রয়েছে।

মজিদ মিঞার হাতে মার খাবার পর অশোক-শ্যামলের সঙ্গে আর মিশত না বিনু। অশোকরাও খুব সম্ভব কম মার খায় নি। মজিদ মিঞা ওদের বাড়ি গিয়েও সিগারেট খাবার কথা বলে এসেছিল। মারটার খাবার পর দু পক্ষই পরস্পরকে এড়িয়ে যাচ্ছিল।

যাই হোক ডিফেন্স পার্টিতে তার দলে অশোকরা না থাকলেই ভাল হত। বিনুর খুবই অস্বস্তি হতে লাগল।

বিনুদের দলে সবসুদ্ধ বারোটি ছেলে। তাদের কাজ হল, নদীর পারে ঘুরে ঘুরে ধান-চাল বোঝাই মহাজনী নৌকো খোঁজা। টর্চ নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ল।

প্রথম দিকে বিনু অশোকদের সঙ্গে কথা বলছিল না। অশোকরাও মুখ বুজেই ছিল। আড়চোখে তিন জন তিন জনকে দেখে যাচ্ছিল শুধু।

নদীর পারে এসে অশোক আর পারল না। বিনুর কাছে নিবিড় হয়ে এসে বলল, 'সেই লোকটা সেদিন তোমাকে কান ধরে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল?'

বিনু বুঝল, মজিদ মিঞার কথা বলছে অশোক। বিব্রতভাবে বলল, 'হাঁ।'

'লোকটা এক নম্বরের ডাকাত।'

বিনু উত্তর দিল না।

অশোক আবার বলল, 'বাড়ি নিয়ে গিয়ে তোমাকে মেরেছিল?'

মুখ নীচু করে বিনু মাথা নাড়ল।

অশোক আবার বলল, 'খুব?'

'হ্যাঁ। মারের চোটে জ্বর এসে গিয়েছিল।'

গভীর সহানুভূতির গলায় অশোক বলল, 'ইস, এমন করে কেউ মারে! খানিক নীরব থেকে আবার বলল, 'আমাকেও বাবা খুব মার দিয়েছিল।'

'তাই নাকি?'

'মারতে মারতে বাড়ির বার করে দিয়েছিল। ঠাকুমা গিয়ে আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।'

এতক্ষণ শ্যামল চুপ করে ছিল। এবার মুখ খুলল, 'তোমাদের শুধু মেরেইছিল ; আমার অবস্থা কী হয়েছিল জানো ?'

ধীরে ধীরে বিব্রত ভাবটা কেটে যাচ্ছিল বিনুর। উৎসুক স্বরে সে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছিল ?'

শ্যামল বলতে লাগল, 'মার তো খেয়েছিলামই ; তার ওপর দু'দিন কিছু খেতে দ্যায় নি।'

'আহা রে—'

দেখা গেল তিনজনেই তিনজনের দুঃখে দুঃখী, সমব্যথী। একটি রাত একসঙ্গে জাগবার আগেই তাদের বন্ধুত্ব আবার আগের মতন গাঢ় হয়ে গেল।

ওধারে লালমোরের গীর্জা আর এধারে সারি সারি মিষ্টির দোকানগুলোর সামনে ঘন হিজলবন। নদীর দীর্ঘ পার ধরে ডিফেন্স পার্টির ছেলেরা কতবার যে টহল দ্যায়। নদীর জলে সন্দেহজনক কিছু নড়তে দেখলেই তারা থমকে দাঁড়ায়, একসঙ্গে পাঁচটা টর্চ জ্বলে ওঠে।

সবে অঘ্রান পড়েছে। কিন্তু এরই ভেতর জলবাঙলার এই ছোট্ট নগণ্য শহরটিতে শীত নেমে গেছে।

নদীর দিক থেকে যে উল্টো-পাল্টা জোলো হাওয়া ঘোড়া ছুটিয়ে যায় তা বরফের মতন ঠাণ্ডা। গুঁড়ো গুঁড়ো হিমে নদী, আকাশ, দূরের ঝাউবন, সারি সারি হিজলগাছ কিংবা রাজদিয়া শহরের বাড়ি-ঘর, মিলিটারি ব্যারাক—সব কেমন যেন ঝাপসা মতন।

সারা গা আলোয়ানে মুড়ে, কানে-মাথায় কম্ফোর্টার জড়িয়েও শীত কাটে না।

একদিন ডিফেন্স পার্টির সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে মানিক বলল, 'আজ বড্ড ঠাণ্ডা, না ?' মানিক নাহা-বাড়ির ছেলে, মাসখানেক হল কলকাতা থেকে এসে এখানকার কলেজে বি. এ-তে ভর্তি হয়েছে। বিনুদের গ্রুপটার সে নেতা।

অন্য ছেলেরা হি-হি কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'হ্যাঁ মানিকদা—'

'একটা জিনিস খেলে শীতটা কিন্তু কেটে যেত।'

'কী ?'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে দেখাল মানিক।

আবার সিগারেট ! বিনু চমকে উঠল। লক্ষ্য করল, অশোক শ্যামলও খুব একটা আরাম বোধ করছে না।

বিনু বলল, 'আমি তো সিগারেট খাই না।' মজিদ মিঞার মারের কথা ভেবে মনে আর সুখ নেই তার। অশোক শ্যামলও তাই বলল।

মানিক বলল, 'যা শীত ! এক-আধটা খেলে গা গরম হয়ে যাবে। হি-হি করে কাঁপছ, কাঁপুনি বন্ধ হবে। নাও-নাও, সবাই একটা করে নিয়ে ধরিয়ে ফেল।'

'কিন্তু—'

'কী ?'

'কেউ যদি দেখে ফেলে ?'

'এই শীতের রাত্তিরে তোমাদের সিগারেট খাওয়া দেখবার জন্যে লোকের বাইরে বেরুতে বয়ে গেছে। সবাই লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে, দ্যাখো গে। সিগারেট টেনে ভাল করে পেয়ারাপাতা চিবিয়ে বাড়ি যাবে, কেউ টেরও পাবে না।'

'কিন্তু ?'

'আবার কী ?'

'আপনি রয়েছেন।'

'আমার কাছে লজ্জা কী। আমরা সবাই বন্ধু—ফ্রেণ্ড—'

কোন অজুহাতই খাটল না, একটা করে সিগারেট নিতেই হল সবাইকে।

আবার সিগারেট খাওয়া শুরু হয়েছে। ডিফেন্স পার্টিতে রাত জাগতে এসে শুধু কি সিগারেট, আরো চমকপ্রদ সব ব্যাপার ঘটতে লাগল।

একদিন রাত্রিবেলা বিনু শ্যামলকে আর সবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে অশোক বলল, 'আজ আর আমরা ওদের সঙ্গে সঙ্গে নদীর পারে ঘুরব না।'

বিনু শুধলো, 'তা হলে কী করবে ?'

'এক জায়গায় যাব।'

'কোথায় ?'

চোখ টিপে রহস্যময় হেসে অশোক বলল, 'চল না, গেলেই বুঝতে পারবে। দারুণ মজা হবে।'

অশোক শ্যামল আর বিনুকে নিয়ে মল্লিকদের ঝুপসি বাগান পেরিয়ে একটা ঘরের বন্ধ জানলার সামনে এসে দাঁড়াল।

বিনু বলল, 'এখানে কী ?'

চাপা গলায় অশোক বলল, 'একদম চুপ। কথা না বলে জানলায় কান দিয়ে দাঁড়াও।'

দিন কয়েক আগে মল্লিকদের ছোট ছেলে সুখরঞ্জনের বিয়ে হয়েছে। এটা তাদেরই ঘর। বিনু তা জানে, খুব নীচু গলায় সেকথা অশোককে বললও।

বিরক্ত সুরে অশোক বলল, 'ছেলেটা তো খালি বক বক করে! মুখ বুজে জানলায় একটু কান পাতো না ভাই—'

জানলায় কান রাখতেই সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম করতে লাগল। সুখরঞ্জন যা-যা বলে তার বউকে আদর করছে, এমন সব সোহাগের ভাষা আগে কখনও শোনেনি বিনু।

অনেকক্ষণ পর সুখরঞ্জনদের গলা ঘুমে জড়িয়ে এল। তখন অশোক বলল, 'চল—'

বাগানের বাইরে বড় রাস্তায় এসে অশোক আবার বলল, 'কিরকম লাগল ?'

শ্যামল শিষ টানার মতন শব্দ করে বলল, 'সত্যি মজাদার।'

'কী বলেছিলাম—'

বিনু বলল, 'এখানকার খবর তুমি কী করে জানলে ভাই ?'

মুরুব্বিআনা চালে হেসে অশোক বলল, 'অনেক কষ্ট করতে হয়েছে।' একটু থেমে আবার বলল, 'আরো অনেক জায়গার খবর আমি জানি।'

'বল না, বল না—'

'একদিনে সব শুনে ফেললে তারপর কী করবে ? একটু ধৈর্য ধর।'

এরপর থেকে ডিফেন্স পার্টির সঙ্গে রাত জাগতে এসে তিনজনে এক ফাঁকে সরে পড়ে। যুবতী স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে যুবকেরা যেখানে শুয়ে থাকে, বিনুরা গিয়ে তাদের ঘরের জানলায় কান পাতে।

তা ছাড়া রাজদিয়ার রাস্তায় আরো কত দৃশ্য চোখে পড়ে। হুস-হুস করে যে জীপগুলো ছুটে যায় তার ভেতরে দেখা যায়, আমেরিকান টমির গলা জড়িয়ে নারীদেহ ঝুলছে। ঝাউবনের মধ্যে নিগ্রো সৈন্যগুলো কোত্থেকে মেয়েমানুষ জুটিয়ে এনে এই শীতের রাতে নরকের খেলা শুরু করে দ্যায়।

একদিন এক বাড়িতে কান পাততে গিয়ে বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল।

বিনুরা দেখল, শীতের রাত্তিতে এরা জানলা খুলে শুয়েছে।

খুব চাপা গলায় অশোক বলল, 'ভালই হয়েছে। এতদিন খালি শুনেছ, এবার ভেতরকার মজা দেখতে পাবে।'

পা টিপে টিপে তিনজনে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অন্য সব বাড়ির জানলায় কান রেখে বিনুরা যা শুনেছে, এখানেও প্রায় তা-ই শুনতে পেল। গাঢ় গলায় পুরুষটি তার সঙ্গিনীকে আদরের কথা বলছে। মাঝে মাঝে চুমু খাবার শব্দ।

উত্তেজনায় তিনজন জানলায় মুখ বাড়াতে লাগল। কিন্তু ঘরের ভেতর আলো নেই, তা ছাড়া ওরা মশারি টাঙিয়ে শুয়েছে। চোখে শান দিয়েও কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

বাইরে হিমের ভেতর অস্থির হয়ে উঠল বিনুরা। হঠাৎ শ্যামল এক কাণ্ড করে বসল, বোতাম টিপে হাতের টর্চটা জ্বেলে ফেলল। মশারির গায়ে আলো পড়তেই দুটি ঘনবদ্ধ যুবক-যুবতী ছিটকে দু'ধারে সরে গেল। তারপরেই যুবকটি তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কে, কে রে, চোর—'

মেয়েটিও চেঁচাতে লাগল, 'চোর, চো—'

ততক্ষণে আলো নিভিয়ে ফেলেছে শ্যামল। একমুহূর্ত বিমূঢ়ের মতন দাঁড়িয়ে থাকল তারা। তারপর সারা বাড়ির দরজা-জানলা খোলার আওয়াজ কানে আসতেই উর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল এবং চোখের পলকে এর ঢেঁকিঘরের পাশ দিয়ে, ওর বাগানের ভেতর দিয়ে, তার উঠোন ডিঙিয়ে নদীর পারে এসে পড়ল।

নদীর পারে স্টিমারঘাটের কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে অশোক শ্যামলকে বলতে লাগল, 'তুমি কি ছেলে বল তো! ফস করে টর্চ জ্বেলে দিলে।'

কাজটা যে ভাল নয় নি, শ্যামল আগেই বুঝতে পেরেছিল। সে চুপ করে থাকল।

অশোক আবার বলল, 'টর্চটা জ্বেলেছিলে জ্বেলেছিলে, একটু পরেই যদি জ্বালাতে—'

শ্যামল বলল, 'পরে জ্বাললে কী হত?'

চোখের তারা নাচিয়ে নাচিয়ে অশোক বলল, 'আরো মজা দেখতে পেতে।'

একধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল বিনু। ভয়ে উত্তেজনায় তার বুকের ভেতরটা ভীষণ কাঁপছিল। আর সেই কাঁপুনির মধ্যে, কেন কে জানে, হঠাৎ ঝুমার কথা খুব মনে পড়ে যাচ্ছিল তার।

॥ চল্লিশ ॥

রাজদিয়ায় আসবার পর কিছুদিন বেশ ভালই ছিলেন সুরমা। কাগজের মতন সাদা ফ্যাকাসে শরীরে লালচে আভা দেখা দিয়েছিল। নিষ্প্রভ চোখে আলোর খেলা শুরু হয়েছিল, রুগ্ন মুখে লাবণ্য ফুটি-ফুটি করছিল। চোখের কোলে, শীর্ণ আঙুলের মাথায় রক্তের সঞ্চার চোখে পড়ছিল।

কিন্তু ক'দিন আর। তারপরেই আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন সুরমা। টিপটিপে বৃষ্টির মতন একটানা অসুখ চলছিলই। তার মধ্যেই ভাত খেতেন, স্নান করতেন, হেঁটে চলে বেড়াতেন।

কিন্তু এ বছর শীত পড়তেই একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন সুরমা। লারমোর রোজ সকালবেলা একবার করে তাঁকে দেখে যান। সুরমার অসুখটা হার্টের, হৃৎপিণ্ডটি খুবই দুর্বল। তার ওপর নানারকম স্নায়বিক উপসর্গ রয়েছে।

এবার শুয়ে পড়বার পর থেকেই কেমন যেন হয়ে গেছেন সুরমা। যত দিন যাচ্ছে, মৃত্যুভয় চারদিক থেকে তাঁকে যেন ঘিরে ধরতে শুরু করেছে। প্রায় সারাদিনই ক্ষীণ স্বরে তিনি বলে যান, 'ওগো, সুধা-সুনীতির বিয়ের ব্যবস্থা কর।'

অবনীমোহন বলেন, 'হবে হবে, আগে তুমি সেরে ওঠ।'

'এবার আমি আর উঠব না। মন বলছে, এই শোওয়াই আমার শেষ শোওয়া।'

'কী আজে-বাজে বলছ। ঠিক সেরে উঠবে তুমি, আবার আগের মতন সুস্থ হবে।'

বিচিত্র হাসেন সুরমা, 'যতই ভোলাতে চাও না, এবার আর আমার রেহাই নেই। বেঁচে থাকতে থাকতে সুধা-সুনীতির বিয়ে দাও। দেখে শান্তিতে চোখ বুজি।'

সুরমা কোন কথাই যখন শুনবেন না তখন কী আর করা! সুধার জন্য হিরণকে একরকম ঠিক করাই আছে। শুধু হিরণের ঠাকুরদা আর জেঠাইমাকে কথাটা জানাতে হবে। হেমনাথ জানেন তাঁর কথার ওপর ওঁরা কিছু বলবেন না। হিরণ সম্বন্ধে তাঁর মতামতই চূড়ান্ত।

সুনীতির সঙ্গে আনন্দর বিয়ের ব্যাপারে অবনীমোহন আর হেমনাথ একদিন

রামকেশবের বাড়ি গেলেন। তারপর রামকেশব এবং স্মৃতিরেখার সঙ্গে পরামর্শ করে মধুপুরে আনন্দর বাবাকে চিঠি লেখা হল। ইভাকুয়েশনের সময় থেকে ওঁরা ওখানে গিয়ে আছেন। স্মৃতিরেখা এবং রামকেশবও আনন্দর বাবাকে চিঠি লিখলেন।

দিনকয়েকের ভেতর উত্তর এসে গেল। ছেলে বড় হয়েছে, তাকে সংসারী করবার জন্য আনন্দর বাবা পাত্রীর খোঁজ করছিলেন। সুনীতিকে যদি ছেলের পছন্দ হয়ে থাকে, এ বিয়েতে তাঁর আপত্তি নেই। শিগ্‌গিরই তিনি রাজদিয়া আসছেন। সাক্ষাতে অন্য কথা হবে।

দিন পনেরোর ভেতর মধুপুর থেকে আনন্দর বাবা-মা ভাই-বোনেরা এসে পড়ল। হেমনাথ এবং অবনীমোহনের সঙ্গে কথা বলে, সুনীতিকে দেখে আনন্দর বাবা খুবই সন্তুষ্ট। এক কথায় বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। স্থির হল, মাঘ মাসে ধান-কাটার পর বিয়েটা হবে।

* * *

বিয়ের ক'দিন আগে এক দুপুরবেলায় মাঠের দিক থেকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে কুমোরপাড়ার হাচাই পাল এসে হাজির। ভয়ে চোখের তারা ঠিকরে বেরিয়ে আসছে তার।

স্নেহলতা উঠোনের একধারে তুলসী মঞ্চের পরিচর্যা করছিলেন। সুধা-সুনীতি বিনু-ঝিনুক, বাড়ির সবাই দাঁড়িয়ে ছিল।

হাচাই পালের ঐ রকম সন্ত্রস্ত উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে স্নেহলতা চমকে উঠলেন, 'কী হয়েছে রে হাচাই ?'

হাঁপাতে হাঁপাতে হাচাই পাল বলল, 'সুন্দি কাউঠার খোজে মাঠে গেছিলাম। গিয়া দেখি বাঘ। দেইখ্যাই লৌড় (দৌড়) দিলাম—'

'বাঘ !'

'হ বৌ-ঠাইরেন—'

এই বাঘ নিয়ে দিন সাতকের মধ্যে এক মজার ব্যাপার ঘটে গেল।

॥ একচল্লিশ ॥

কুমোরপাড়ার হাচাই পালই শুধু না, কদিনের মধ্যে বাঘটাকে আরো অনেকে দেখল। যেমন মৃধাবাড়ির ছলিমুদ্দি, গোসাই-বাড়ির সহদেব, নিকুঞ্জ কবিরাজ, অধর সাহা, মনা ঘোষ—এমনি আরো অনেকে।

কেউ বলল, বাঘটা দু'হাত লম্বা। কেউ বলল, আট হাত। কেউ বলল, দশ হাত। যত দিন যেতে লাগল লোকের মুখে মুখে বাঘটার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে লাগল।

নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য বাঘটাও যেন উঠে পড়ে লেগে গেল। আজ এ-বাড়ির ছাগল পাওয়া যাচ্ছে না, কাল ও-বাড়ির গরুর খোঁজ নেই, পরশু সে-বাড়ির হালের বলদ নিরুদ্দেশ। একদিন তো যুগীপাড়ার একটা ছেলেই নিখোঁজ হয়ে গেল। মাঠের মাঝখানে নলখাগড়ার ঝোপে খানকয়েক হাড় ছাড়া ছেলেটার আর কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না।

এদিকে রাজদিয়াকে ঘিরে দশ বারোখানা গ্রামে সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়ে গেছে। কনট্রোলের দোকান থেকে কেরোসিন উধাও হবার পর সন্ধ্যে নামতে না নামতেই চারদিক নিশুতিপুর হয়ে যাচ্ছিল। আজকাল বিকেল থাকতে থাকতেই বাঘের ভয়ে ঘরে ঘরে খিল পড়ে যায়।

সব চাইতে অসুবিধে হয়েছে বিনু আর ঝিনুকের। তারা যে বড় হয়েছে এ কথাটা স্নেহলতা বা বাড়ির আর কেউ মানতেই চায় না। এখন কিছুদিন স্কুলে ছুটি চলছে। বেলা বেড়ে রোদ বেশ চনচনে হয়ে উঠলে তবে তারা ঘরের বার হতে পারে; আবার বিকেলবেলা রাজদিয়ার সব লোক বাইরে থাকতে থাকতেই তাদের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে যাবার উপায় নেই তাদের। স্নেহলতার ভয়, বাঘটা তাকে তাকে আছে। রাজদিয়ার কয়েক হাজার লোকের ভেতর থেকে বেছে বেছে তাঁর নাতি-নাতনী দুটোকে টপ করে মুখে তুলে নিয়ে যাবে।

স্নেহলতা লক্ষ্মণের গণ্ডী কেটে দিয়েছেন। পেছনে রান্নাঘর, সামনে উঠোন, দক্ষিণে মধুটুকুরি আমের গাছ, উত্তরে ঢেঁকিঘর—এই চতুঃসীমার মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে কার আর ভাল লাগে। এমন কি বাগান এবং পুকুরেও একা একা যাওয়া বারণ।

অন্য কিছুর জন্য না, ঝুমার জন্যই খুব খারাপ লাগে বিনুর। সারাদিন ছটফট করে এ-ঘর ও-ঘর করে বেড়ায় সে; উঠোন জুড়ে অস্থির চঞ্চল পায়ে ঘুরপাক খেতে থাকে।

ঝিনুক কিন্তু ভারি খুশী। পুবের ঘরের উঁচু পৈঠের ওপর বসে পা নাচাতে নাচাতে কৌতুকের চোখে সে বিনুর অস্থিরতা দেখতে থাকে। এক সময় খুব আস্তে করে ডাকে, 'বিনুদা—'

বিনু বলল, 'কী বলছ?'

'তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না ?'

'কষ্ট কেন ?'

ঝিনুকের চাপা ঠোঁটের মাঝখানে হাসির একটু আভা ফুটে উঠেই চকিতে মিলিয়ে যায়। সে বলে, 'সারাদিন বাড়িতে আটকে আছ বলে—'

চোখমুখ কুঁচতে বিরক্ত রাগ-রাগ গলায় বিনু বলতে থাকে, 'সমস্ত দিন বাড়ি বসে থাকতে কারো ভাল লাগে !'

'ঠিকই তো।'

'দিদার কি যে ভয়, রাস্তায় বেরুলে এত লোক থাকতে বাঘ এসে আমাকেই গিলে ফলবে।'

কয়েক পলক বিনুর দিকে তাকিয়ে থেকে গলার স্বর আরো নামিয়ে ফেলে ঝিনুক, 'একে বেরুতে পারছ না। তার ওপর—'

'তার ওপর কী ?'

'ঝুমাদের বাড়ি যাওয়া হচ্ছে না। ঝুমাদের বাড়ি যেতে পারলে এত কষ্ট, এত রাগ হত না। না বিনুদা ?'

চোখের তারা স্থির করে ঝিনুকের দিকে তাকায় বিনু। বুঝতে চেষ্টা করে মেয়েটা কি কিছু আভাস পেয়েছে ? বলে, 'তোমার কি মনে হয়, রাস্তায় বেরুলেই আমি ঝুমাদের বাড়ি যাই ?' বিনুর গলা অল্প অল্প কাঁপে।

ঝিনুক হঠাৎ উদাস হয়ে যায় 'কি জানি—'

আর বিনু এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়ায় না। বড় বড় পা ফেলে আবার এ-ঘরে ও-ঘরে এবং উঠোনে ঘুরতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে ভাবে, ঝুমাই শুধু না, এই ঝিনুক মেয়েটাই কি কম রহস্যময়ী !

বাঘের উৎপাত দিন দিন বেড়েই চলল। রক্তের স্বাদ যখন একবার সে পেয়েছে তখন কি সহজে থামবে ?

এদিকে থানা থেকে ঢেঁড়া দিয়ে পনের কুড়ি মাইলের ভেতর যত গ্রাম-গঞ্জ আছে, সব জায়গার লোককে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। বাঘ মারবার জন্য মোটা টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে।

এত এত ব্যাপার যখন ঘটে গেল তখন কি আর আনন্দ চুপ করে বসে থাকতে পারে ? বাঘ মারার দায়িত্ব সে নিজের কাঁধে তুলে নিল। একদিন দুপুর বেলা বিনুরা দেখতে পেল, পুকুরের ওপারে চারদিকের গ্রামগুলো থেকে কয়েক শ' যুবক এবং প্রৌঢ়কে জড়ো করে ফেলেছে সে। এই মুহূর্তে তার গায়ে পুরোপুরি শিকারীর বেশ। কাঁধ থেকে বন্দুক ঝুলছে, গলায় টোটার মালা। কোমরে মস্ত ভোজালি।

মাঘের মাঝামাঝি এই সময়টায় মাঠে জল নেই। ধানও কাটা হয়ে গেছে। আনন্দকে ঘিরে বিরাট জনতা ধানকাটা মাঠের ওপর গোল হয়ে বসে পড়ল।

এত লোক যখন রয়েছে তখন ভয়ের কোন কারণ নেই। স্নেহলতাকে বলে বিনু ধানখেতে ছুটল।

জনতার বেশির ভাগই চাষী শ্রেণীর মানুষ; দুর্ভিক্ষে হেজেমজে যাবার পর যারা কোন রকমে টিকে আছে তারাই ছুটে এসেছে। উৎকণ্ঠিতের মতন লোকগুলো আনন্দের দিকে তাকিয়ে ছিল।

আনন্দ বলছিল, 'বাঘটাকে তোমারা মারতে চা'ও, এই তো?'

সবাই সমস্বরে বলল, 'হ সায়েববাবু। হালার বাঘের লেইগা পরানে শান্তি নাই। কোন্‌দিন্ কার বাড়িত্ গিয়া যে আকাম কইরা আইব।'

'সায়েববাবু' সম্ভাষণটা খুব সম্ভব আনন্দের হ্যাট-বুট-প্যাণ্ট এবং গুলীবন্দুকের সম্মানে।

আনন্দ বলল, 'সে তো ঠিকই।'

বাঘ কার কি ক্ষতি করেছে, তাদের কতখানি দুর্দশার কার- হয়ে দাঁড়িয়েছে, এরপর লোকগুলো সে সব কাহিনী বলে যেতে লাগল।

সব শুনে আনন্দ বলল, 'বাঘ আমি মেরে দিতে পারি। তবে—'

'ভয় কী?' জনতা উন্মুখ হল।'

'আমার কথামতন তোমাদের চলতে হবে।'

'নিয্যস চলুম্।'

এর পর উদ্দীপ্ত ভাষায় ছোটখাটো একখানা বক্তৃতা দিল আনন্দ। তার সারমর্ম এইরকম। প্রথমত সবাইকে লাঠি এবং সড়কি বানিয়ে নিতে হবে। ঘরে ঘরে শাঁখ, কাঁসর, নিদেনপক্ষে একটুকরো টিন মজুদ রাখতে হবে। কেউ যদি বাঘটাকে দেখতে পায় সঙ্গে সঙ্গে নিজের গ্রামে গিয়ে খবর দেবে। আর খবর পেলেই যত শাঁখটাখ আছে একসঙ্গে বাজাতে হবে। এক গ্রামের বাজনার আওয়াজ গেলেই আরেক গ্রাম বাজাতে শুরু করবে। এই ভাবে চারদিকের গ্রামগুলো সতর্ক হয়ে যাবে।

শুধু শাঁক-কাঁসর বা টিন বাজালেই চলবে না। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ধ্বনিও দিতে হবে, 'বন্দে মাতরম্' 'কালী মাইকী জয়' কিংবা 'আল্লা হো আকবর'। ধ্বনিটা কানে গেলে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। প্রতিধ্বনিও দিতে হবে। তারপর লাঠি সড়কি নিয়ে সব দিক থেকে বাঘটাকে ঘিরে পিটিয়ে মেরে ফেলা হবে। তাতেও যদি সুবিধে না হয়, আনন্দ এবং তার বন্দুক তো আছেই।

পরিকল্পনার কথটা বলে ঘুরে ঘুরে সগর্বে জনতাকে একবার দেখে নিল আনন্দ। তারপর আবার শুরু করল, 'ফন্দিটা কেমন ?'

সবাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সায় দিল, 'চোমৎকার সায়েববাবু, চোমৎকার—'

'এবার বাঘের আর নিস্তার নেই, বুঝলে ?'

'হ।'

এ রকম চমকপ্রদ একখানা পরিকল্পনার পর বাঘের আয়ু যে নেহাতই ফুরিয়ে এসেছে, সে সম্বন্ধে জনতার সন্দেহ থাকল না। উৎসাহে উদ্দীপনায় তাদের চোখ চকচক করতে লাগল।

আনন্দ বলল, 'তা হলে ঐ কথাই রইল—'

'হ।'

হঠাৎ এই সময় একজন বলে উঠল, 'বাঘেরে আমরা যহন ঘিরা ধরুম, আপনে আমাগো লগে থাকবেন তো ?'

বাঁ হাতের তালুতে প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে আনন্দ বলল, 'নিশ্চয়ই। আমি না থাকলে তোমাদের চালাবে কে ?'

লোকগুলো একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। নিজেদের ভেতর তারা বলাবলি করতে লাগল, 'সায়েববাবু আমাগো লগে থাকব। হালার বাঘের এইবার যম আইছে।'

আনন্দ বলল, 'কথা হয়ে গেল। এখন তোমরা বাড়ি যাও। আর হ্যাঁ, যতদিন না বাঘটা মারা পড়ছে, প্রতি সপ্তাহে রবিবার করে এখানে মিটিং হবে। দুপুরবেলা তোমরা চলে আসবে। যদি বাঘ মারার অন্য কোন ভাল ফন্দি মাথায় আসে, তোমাদের বলে দেব।'

'আইচ্ছা।'

বাঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে যে যার বাড়ি চলে গেল। হতভাগ্য প্রাণীটা জানতেও পারল না, তার বিরুদ্ধে কি ভীষণ ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে।

মীটিং শেষ হলে আনন্দকে ধরে বাড়ি নিয়ে এল বিনু। সুধা-সুনীতি উঠোনেই ছিল। ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে সুধা বলল, 'বাবা, একেবারে বীরবেশে যে! দ্যাখ দিদি, দ্যাখ—'

সুনীতি চোরা চোখে আনন্দকে দেখে নিয়ে মুখ নীচু করল, তারপর নখ খুঁটতে লাগল। তার মুখে মৃদু কৌতুকের হাসি আলতোভাবে লেগে রইল।

সুধা এবার এগিয়ে এসে চোখ বড় বড় করে বলল, 'বন্দুক, টোটার মালা, ভোজালি—যেভাবে সেজেছেন, তাতে বাঘটাকে না মারলেও চলবে।'

ভুরু অল্প কুঁচকে আনন্দ বলল, 'কেন ?'

'এই বীরবেশ একবার যদি বাঘটাকে দেখিয়ে দিতে পারেন, রাজ্য ছেড়ে সে পালিয়ে যাবে।'

আনন্দ কি বলতে যাচ্ছিল, বলা হল না। স্নেহলতা কোথায় ছিলেন, আনন্দকে দেখতে পেয়ে ছুটে এলেন। বললেন, 'এসো দাদা, এসো—'

তারপর যতক্ষণ আনন্দ এ বাড়িতে রইল, সুধা তার পেছিনে লেগে থাকল।

দু-চার দিনের ভেতর দেখা গেল, রাজদিয়া এবং চারপাশের গ্রামগুলোতে একটা সুপুরি গাছ কিংবা বয়রা বাঁশও আর আস্ত নেই। সব লাঠি এবং সড়কি হয়ে গেছে।

প্রথমে ঠিক হয়েছিল, রবিবার রবিবার ধানকাটা ফাঁকা মাঠে মীটিং বসবে। এক রবিবার যাবার পরই সিদ্ধান্তটা বাতিল করে দিল আনন্দ। নতুন করে স্থির হল, রোজ সবাইকে আসতে হবে। বাঘ বলে কথা!

দু-চারদিন যাতায়াতের পর হঠাৎ একদিন আনন্দ বলল, বাঘমারা সহজ ব্যাপার না, বুঝলে ?'

সবাই সমস্বরে বলে উঠল, 'হেয়া আর বুঝি না!'

'এর জন্য সকলকে এক-মন এক-প্রাণ হতে হবে।'

'আইজ্ঞা হেয়া তো হইতেই হইব।'

'আমি ভাবছি—'

চারপাশের বিপুল জনতা দম বন্ধ করে উৎসুক তাকিয়ে রইল।

আনন্দ বলল, 'সৈন্যদের মতন তোমাদের প্যারেড করতে হবে। তাতে একসঙ্গে কাজ করার প্রেরণা পাবে।'

'পেরেট কী ?'

'ঐ লেফ্‌ট্‌-রাইট করা।'

পরের দিন থেকেই প্যারেড শুরু হল। দেখা গেল, কেউ লুঙ্গি মালকোচা দিয়ে পরেছে। তার পাশেই হয়তো একজনের পরনে খাটো ধুতি এবং ফতুয়া, গলায় তিনলহর তুলসীর মালা। তার পরের লোকটি পাজামা পরে এসেছে।

নানারকম বেশভূষা আনন্দর পছন্দ না। দু-একদিন দেখে আনন্দ বলল, 'তোমরা এক কাজ কর।'

'কী ?'

'সবাই একটা করে খাকি প্যাণ্ট আর সাদা হাফ শার্ট করিয়ে নাও। এক-রকম পোশাক পরলে দেখতে ভালো, কাজেরও সুবিধে।'

এইবার জনতা বিদ্রোহী হয়ে উঠল, 'কী যে ক'ন সায়েববাবু, তার ঠিক-ঠিকানা নাই। এই আকালে খাইতে না পাইয়া মরতে বসছি। আপনে ক'ন পেন্-জামা (প্যাণ্ট-জামা) বানাইতে। ঐ সগলে আমরা নাই।'

পাছে সেনাদল ভেঙে যায়, এই আশঙ্কায় আনন্দ বলল, 'আচ্ছা থাক থাক, শার্ট-টার্ট বানাতে হবে না।'

ধুতি-লুঙ্গি-পাজামার বিচিত্র সমন্বয়ের ভেতর বিপুল সমারোহে প্যারেড চলতে লাগল।

প্যারেড করতে করতে বাঁয়ের জায়গায় ডান পা তুললে রক্ষা নেই; অমনি আনন্দর হাতের বেত পায়ের গোছে এসে পড়ে। আনন্দর চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ না।

প্যারেড শুরু হবার পর বেশ কিছুদিন বাঘটাকে আর দেখা গেল না। তার বিরুদ্ধে যে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে, এ খবর কি বাঘটা জেনে ফেলেছে? যাই হোক, মানুষ খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে, তবে সতর্ক আছে। সন্ধ্যের আগে আগেই যথারীতি ঘরে ঢুকে খিল দিচ্ছে তারা। এইভাবেই চলতে লাগল।

॥ বিয়াল্লিশ ॥

হঠাৎ একদিন সকালবেলা বারুইবাড়ির প্রাণবল্লভ মাঠের দিক থেকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এবং চেঁচাতে চেঁচাতে হেমনাথের বাড়ি এসে হাজির, 'খাইছে রে খাইছে, আমারে খাইয়া ফালাইল রে—'

পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ, চারদিকের ঘর থেকে সুধা-সুনীতি বিনু-ঝিনুক অবনীমোহন-হেমনাথ বাড়ির সবাই ছোটাছুটি করে বেরিয়ে এলেন।

উদ্বিগ্ন মুখে হেমনাথ শুধোলেন, 'কী হয়েছে প্রাণবল্লভ, কী হয়েছে?'

প্রথমটা কথা বলতে পারল না প্রাণবল্লভ। হাত-পা-ঠোঁট, তার সারা শরীর ভয়ে থর থর কাঁপছে। হাত ধরে তাকে বারান্দায় বসালেন হেমনাথ। বললেন, 'আগে শান্ত হ, পরে বলবি।'

কাঁপা ভাঙা ভাঙা গলায় প্রাণবল্লভ বলল, 'এট্টু জল বড়কত্তা—'

জল খেয়ে খানিকটা শান্ত হল প্রাণবল্লভ। তারপর যা বলল, সংক্ষেপে

এইরকম। ভোরবেলা মেটে আলুর সন্ধানে সে ধানকাটা মাঠে গিয়েছিল। আলের ধারে ঘুরে ঘুরে দু-চারটে যোগাড়ও করেছিল। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তার চোখে পড়েছিল, দক্ষিণের চকে মাঠের মাঝখানে গুটিসুটি মেরে বাঘটা শুয়ে আছে।

প্রাণবল্লভের কাহিনী শুনে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে হেমনাথ বললেন, 'সুধাদিদি, সুনীতিদিদি, শিগ্‌গির শাঁখ বাজা। বাঘের খবর পেলেই আনন্দ শাঁখ-টাখ বাজাতে বলেছিল না ?' সেদিনকার মীটিং-এর কথা কারো জানতে আর বাকি নেই।

সুধা-সুনীতি ছুটে গিয়ে ঘর থেকে শাঁখ বার করে আনল; তারপর দুই বোন গাল ফুলিয়ে জোরে জোরে ফুঁ দিতে লাগল।

প্রাণবল্লভের ভয় কেটে গিয়েছিল। লাফ দিয়ে উঠোনে নেমে আকাশে হাত ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'বন্দে মাতরম্—'

'বন্দে মাতরম্'-এর এরকম প্রয়োগ আগে আর কখনও ছাখে নি বিনু।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এ-বাড়ি ও-বাড়ি এ-পাড়া সে-পাড়া এবং দূর-দূরান্ত থেকে শাঁখ-কাঁসর এবং টিন পেটাবার আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। সেই সঙ্গে মুহুর্মুহু শোনা যেতে লাগল, 'বন্দে মাতরম্—'

'কালী মাঈকী জয়—'

মুসলমান পাড়ার দিক থেকে আওয়াজ আসতে লাগল, 'আল্লা হো আকবর—'

তারপরেই হো-হো চিৎকারে দিগ্‌দিগন্ত তোলপাড় করে অসংখ্য মানুষ বেরিয়ে পড়ল। সবার হতে লাঠি আর সুপুরি কাঠের সড়কি।

হেমনাথ প্রাণবল্লভকে বললেন, 'যা শিগ্‌গির, আনন্দকে বাঘের খবরটা দিয়ে আয়।'

স্নেহলতা বললেন, যা চেঁচামেচি আর কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ তাতে খবর পেতে কি তার বাকি আছে ?'

'তবু যাক।'

প্রাণবল্লভ রামকেশবের বাড়ি ছুটল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে খবর দিল, সে একাই না, আরো অনেকে আনন্দকে বাঘের খবর দিতে গিয়েছিল। কিন্তু আনন্দকে পাওয়া যাচ্ছে না।

হেমনাথ বললেন, 'সে কি ! কাজের সময় সেনাপতিই নিরুদ্দেশ !'

প্রাণবল্লভ কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। হেমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করতে লাগল।

তার মনের কথাটা যেন পড়তে পারলেন হেমনাথ। বললেন, 'কিছু বলবি ?'

'হ—'

'বল্ না—'

'অপরাধ যদি না নেন, কথাখান কই—' বলে হাত জোড় করল প্রাণবল্লভ।

হেমনাথ অবাক, 'অপরাধ নেব কেন ?'

হাতজোড় অবস্থাতেই প্রাণবল্লভ বলল, 'আমার মনে হইল সায়েববাবু (আনন্দ) বাড়িতেই আছে ; ভিতরে তেনার গলাও য্যান পাইলাম। কিন্তুক মা ঠাইরেনরা কইয়া দিল, তেনি নাই—'

হেমনাথ ধমকের গলায় বললেন, 'কী যা তা বলছিস্!'

'বিশ্বাস যান না বড়কত্তা ?'

'না।'

'বিশ্বাস না যাওনেরই কথা। কিন্তুক—'

'কিন্তু কী ?'

'সাক্ষী আছে।'

'কে সাক্ষী ?'

প্রাণবল্লভ একে একে নাম করে যেতে লাগল, 'গণকবাড়ির মহেন্দর, কামারবাড়ির নিমাই, সোনারুবাড়ির অনন্ত, কলিমুদ্দি মাঝি, বরাতুল্লা শিকারী—কত মাইন্‌ষের নাম কমু ?'

'এত লোক আনন্দর খোঁজে গিয়েছিল!' হেমনাথের চোখে মুখে এবং কণ্ঠস্বরে বিস্ময়।

'হ। বাঘ দেখলে তেনিই তো খপর দিতে কইছিল।'

একটু চুপ করে থেকে হেমনাথ বললেন, 'আচ্ছা তুই যা এখন—'

প্রাণবল্লভ চলে গেল।

ওদিকে আরেক কাণ্ড চলছিল। লাঠি-সড়কি নিয়ে রাজদিয়ার লোক তো মাঠের দিকে ছুটছিলই। দিগন্তের ওপারের কৃষাণ গ্রামগুলো থেকে শত শত মানুষ ছুটে আসছিল ; তাদের হাতেও লাঠি-সড়কি এবং নানারকম অস্ত্র।

শাঁখ, কাঁসর এবং টিন পেটাবার আওয়াজ আসছিলই। সেই সঙ্গে মুহুর্মুহু শোনা যাচ্ছিল, 'বন্দে মাতরম্—'

'কালী মাঈকী জয়—'

'আল্লা হো আকবর—'

ধানকাটা শীতের মাঠ পানিপথ কি হলদিঘাটের যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা নিতে শুরু করেছে।

বিনু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'আমি মাঠে যাব দিদা—'

'মাঠে কেন রে দাদাভাই ?' স্নেহলতা চমকে উঠলেন।

'বাঘ মারা দেখতে।'

'না—না, ওখানে তোমাকে যেতে হবে না।' জোরে জোরে প্রবলবেগে হাত নাড়তে লাগলেন স্নেহলতা ; চোখেমুখে তাঁর ভয়ের ছায়া পড়ল।

'আমি যাবই—' ঘাড় গোঁজ করে পা ছুঁড়তে লাগল বিনু। শাঁখ কাঁসরের শব্দ, ঘন ঘন 'বন্দে মাতরম্' আর 'আল্লা হো আকবর' তার রক্ত চঞ্চল করে তুলেছে।

'ওখানে কী হবে, কেউ বলতে পারে! বাঘটা যদি কোনরকমে ছিটকে তোর কাছে চলে আছে—'

'আমি ঐ হিজলগাছের মাথায় চড়ে দেখব—' দূর মাঠের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল বিনু।

স্নেহলতা বললেন, 'গাছে-টাছে চড়তে হবে না। তুই ঘরে গিয়ে বোস। জানলা দিয়ে যেটুকু দেখা যায় তার বেশি দেখবার দরকার নেই।

বিনু শুনল না। উর্ধ্বশ্বাসে মাঠের দিকে ছুটল। আজ আর তাকে বাড়িতে আটকে রাখা গেল না। মাঠজোড়া রণভুমি তাকে বিপুল আকর্ষণে টেনে নিয়ে গেল।

পেছনে স্নেহলতার ভীত ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শোনা যেতে লাগল ; হেমনাথ আর অবনীমোহনকে তিনি বলছেন, 'তোমরা ছেলেটাকে আটকালে না ? আজ কী যে হবে! যাও যাও, ওকে ফেরাও—'

হেমনাথরা কী উত্তর দিলেন, বিনু শুনতে পেল না। তার আগেই ছায়াচ্ছন্ন ঝুপসি বাগান পেরিয়ে, মাঘের নিস্তরঙ্গ পুকুর পেছনে ফেলে, ফসলশূন্য ফাঁকা মাঠে এসে পড়ল।

চারদিক থেকে জনতা গোল হয়ে ছুটছে। সম্মোহিতের মতন তাদের পিছু পিছু চলতে লাগল বিনু।

দক্ষিণের চকে এসে দেখা গেল, সত্যি সত্যিই মাঠের মাঝ-মধ্যিখানে বাঘটা শুয়ে আছে। চারধার থেকে গোল হয়ে জনতা ঝড়ের মতন নেমে আসছিল। বাঘটা যখন সিকি মাইলের মতন দূরে সেই সময় যেন মন্ত্র পড়ে হঠাৎ তাদের থামিয়ে দিল।

একধারে সারি সারি অনেকগুলো হিজল গাছ। বিনু আর দেরি করল না, সব চাইতে উঁচু গাছটার মগডালে চড়ে বসল। ভাটির দেশে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবার আগে বিনুকে গাছে চড়া শিখিয়ে দিয়েছিল যুগল।

শাঁখ কাঁসরের আওয়াজ থেমে গেছে। 'কালী মাঈকী জয়' কিংবা আল্লা হো আকবর-ও আর শোনা যাচ্ছে না। জনতা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে যেন বিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'সায়েববাবু কৈ ?'

আট-দশটা লোক চিৎকার করে বলল, 'বাড়িত্ নাই।'

'অহন কী করা ?'

'সায়েবাবু তো কইছিল, বাঘ দেখলে তেনারে খপর দিতে। তেনি নাই ; আমরা ফিরাই যাই।'

'সগলেরে তাইলে ফিরনের কথা কইয়া দ্যাও। বাঘ-মারণ বইলা কথা। সায়েববাবু না থাকলে আমাগো চালাইব কে ?'

একটা লোক চিৎকার করে ফেরবার কথা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বাজিতপুরের জোয়ান ছেলে হালিম বলল, 'কিছুতেই না। অ্যাদ্দূর আইসা ফিরা যামু না। সুযুগ যহন পাইছি, শালার বাঘেরে নিকাশ করুম।' বলেই আকাশের দিকে হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে চেঁচাল, 'আউগাও (এগোও) ভাইসগল—'

নিমেষে জনতার ভেতর সাড়া পড়ে গেল।

'আল্লা হো আকবর—'

'কালী মাঈকী জয়—'

তারপরেই বাঘটাকে ঘিরে মানুষের বৃত্ত ছোট হয়ে আসতে লাগল। কিন্তু জন্তুটা যখন তিনশ' গজের মতন দূরে, লোকগুলো আবার থেমে গেল।

আনন্দ নেই। সেনাপতিত্ব আজ হালিমের দখলে। প্রেরণা দেবার জন্য পেছন থেকে আবার সে চেঁচিয়ে উঠল, 'আউগাও—'

ঠেলে ঠেলে জনতাকে আরো অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেল হালিম। কিন্তু বাঘটা যখন একশ' গজ দূরত্বে তখন আর পারা গেল না।

এতদূর থেকে লাঠি-সড়কি দিয়ে অন্তত বাঘ মারা যায় না। হালিম শূন্যে ঘুষি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সমানে চেঁচাতে লাগল, 'আউগাও ভাইরা, আউগাও—'

কিন্তু এত অনুপ্রেরণাতেও কাজ হল না। লোকগুলো একেবারে অনড় ; কেউ যেন পেরেক ঠুকে মাটিতে তাদের পা আটকে দিয়েছে।

ওদিকে আরেক ব্যাপার ঘটল। বাঘটা ঘুমিয়ে ছিল : হঠাৎ এত চেঁচামেচি শুনে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

হিজল গাছের মাথা থেকে বিনুর মনে হল, বাঘটা দশ হাতও না, বারো হাতও না, ছ' সাত হাতের মতন। হলুদ শরীরে তার লম্বা লম্বা কালো ডোরা।

কাঁচা ঘুমটা ভেঙে যাবার জন্য খুব সম্ভব বাঘটা বিরক্ত হয়েছিল এবং এত লোকজন দেখে কিছুটা বিস্মিত, কিছুটা হতচকিত। সে সামনের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে শ'খানেক লোক অস্ত্র-টস্ত্র ফেলে প্রাণপণে ছুটল; এবং নিমেষে দিগন্তের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার বাঘটা তাকাল ডানদিকে; তক্ষুনি দু-আড়াই শ' লোক আর নেই। অনেকে মালকোচা দিয়ে লুঙ্গি পরে এসেছিল, ছুটবার সময় কাছা খুলে যাওয়ায় লুঙ্গিতে পা আটকে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। ধান কেটে নিয়ে যাবার পর যে গোড়াগুলো মাঠময় ছড়িয়ে আছে তাতে হোঁচট খেয়েও অনেকে পড়ে যাচ্ছে। পড়েই তক্ষুনি উঠে পড়ছে; এবং ধাঁ করে পেছনে একবার তাকিয়ে নিয়েই আবার ছুটছে।

সামনে-পেছনে, যে দিকেই বাঘটা তাকাচ্ছে, এক অবস্থা। মুহূর্তে সব ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। চারদিকে তাকাতে তাকাতে সেনাপতির সঙ্গে একবার তার শুভদৃষ্টি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল একটা ডোরাকাটা লাল লুঙ্গি আর সবুজ জামা প্রায় উড়ে গিয়ে আধ মাইল দূরের একটা খালে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কেউ যখন আর নেই, সেই সময় বাঘটা অলস পায়ে চকের এক প্রান্তে উলুখড়ের জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল। তারপর হিজল গাছ থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এল বিনু।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাঘ শিকারের ব্যাপারটা দিকে দিকে রটে গেল।

হাসতে হাসতে হেমনাথ বললেন, 'যেমন আনন্দটা তেমনি তার সংশপ্তক বাহিনী।'

বিনু শুনতে পেল, সবার কান বাঁচিয়ে সুধা সুনীতিকে বলছে, 'আচ্ছা বীরপুরুষের গলায় মালা দিবি দিদিভাই—'

সুনীতি মুখ তুলতে পারছিল না; মাটির সঙ্গে সে যেন মিশে যেতে চাইছে।

দিন চারেক পর খবর পাওয়া গেল বাঘটা মারা পড়েছে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট

সাহেব লঞ্চে করে রাজদিয়া আসছিলেন ; নদীর বাঁকে বাঘটাকে দেখে গুলী করে মেরেছেন।

বাঘের ভয়ে আনন্দ যে বাড়ি থেকে বেরোয় নি, এই কথাটা কেমন করে যেন চারদিকের গ্রামগঞ্জগুলোতে রটে গিয়েছিল। খবরটা যে শুনেছে সে-ই হেসেছে।

এদিকে সেদিনকার সেই মজার ঘটনাটির পর আনন্দর আর দেখা নেই। আগে দিনে দু'বার করে হেমনাথদের বাড়ি আসছিল, এখন রামকেশবের বাড়ির একটা ঘরে সে নাকি নির্বাসন বেছে নিয়েছে।

একদিন হেমনাথ গিয়ে আনন্দকে ধরে আনলেন। রগড়ের গলায় বললেন, 'আরে দাদা, তোমার এত লজ্জাটা কিসের ?'

আনন্দ খুবই বিব্রত বোধ করছিল, উত্তর দিল না।

হেমনাথ আবার বললেন, 'লজ্জার কিছু নেই, বুঝলে ভাই। বড় বড় সেনাপতি যারা—যেমন ধর রোমেল, মণ্টোগোমারি, দ্য গল, ফ্রণ্টে হেঁজি পেঁজি সোলজারের গায়ের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে কি তারা লড়ে? তারা দূরে বসে কলকাঠি নাড়ে। তুমি ঘরে বসে থেকে আদর্শ জেনারেলের মতন কাজ করেছে।' একটু থেমে আবার বললেন, 'ভয় নেই, এর জন্যে সুনীতিদিদি বরবদল করবে না। কি বলিস রে দিদিভাই—'

সুধা-সুনীতি-বিনু-ঝিনুকরা কাছেই ছিল। সুনীতি ছুটে পালিয়ে গেল।

সুধা চোখের তারায় আর ঠোঁটের প্রান্তে ধারাল হাসিটি হেসে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলল, 'কি বীরপুরুষ, বোঝা গেল। কাঁধে বন্দুক, কোমরে ভোজালি, গলায় টোটার মালা ঝোলানোই সার।'

॥ তেতাল্লিশ ॥

মাঘের শেষ তারিখে দিন পড়েছে। একই লগ্নে সুধা-সুনীতির বিয়ে। রাত থাকতে থাকতে কাকপক্ষী জাগবার আগে দুই বোনকে বিছানা থেকে তোলা হল। শুরু হল 'অধিবাসের' কাজ।

সুধা-সুনীতিকে নতুন কাপড় পরানো হল, গলায় দেওয়া হল তুলসী কাঠের মালা, কোমরে নতুন লাল ঘুনসি, কপালে চন্দন কুসুমের ফোঁটা, চোখে কাজলের টানা, সারা গায় ঝকমকে নতুন গয়না, হাতে নতুন শাঁখা।

মেয়ে সাজাবার পর নতুন পিঁড়িতে তাদের পাশাপাশি বসিয়ে শ্বেত-পাথরের থালায় খাবার খেতে দেওয়া হল—খই, চিড়ে, মুড়কি, ক্ষীর, দই, চিনি-বাতাসা। বিনু ঝিনুকও ওদের সঙ্গে বসে গেল। এরপর সারাদিন বিয়ের কনেরা আর কিছু খাবে না। খাবে সেই রাত্রিবেলা—বিয়ের পর।

সুধা-সুনীতিকে খেতে বসিয়ে তিরিশ-চল্লিশজন এয়ো নিয়ে গান গাইতে গাইতে নদীর ঘাটে 'জলসই'তে গেলেন স্নেহলতা। সঙ্গে সঙ্গে সানদার (সানাইবাদক) আর ঢুলী বাজাতে বাজাতে চলল।

'জলে ঢেউ দিও না লো সখি
ঢেউ দিও না, ঢেউ দিও না,
আমরা জলের চাতকী।
জলের কালোরূপ নিরখি
জলে ঢেউ দিও না গো সখি।
আগে সখি, পাছে গো সখি
মধ্যে রাধা চন্দ্রমুখী।'

স্নেহলতা যতক্ষণ না ফিরছেন, সুধা সুনীতি পাত ছেড়ে উঠবে না। এই হচ্ছে রীতি।

কিছুক্ষণ পর স্নেহলতারা নদী থেকে নতুন কলসীতে জল ভরে ফিরে এলেন। যে কলসীটায় জল আনা হয়েছে সেটার নাম মঙ্গলকলস। পাঁচজন এয়ো একসঙ্গে কলসীটা ধরে উলু দিতে দিতে মাটিতে স্থির করে বসাল। একজন তার তলায় আগেই ধানদূর্বা দিয়েছে। বাকিরা গান ধরল :

'ওগো মঙ্গলো আসিছে দুয়ারে
মঙ্গলো অবনী আজ।
মঙ্গলো জলধর, মঙ্গলো কলসে
পাদ্য অর্ঘ্য নিয়ে এসো হরষে,
অতিথি, ভূপতি, দেবতা, স্বদেশে,
মঙ্গলো অবনী আজ।'

দেখতে দেখতে রোদ উঠে গেল, বেলা চড়তে লাগল। দুপুরের খানিক আগে পুরুত এল। অবনীমোহন মেয়ে সম্প্রদান করবেন ; পুরুত তাঁকে নিয়ে 'বৃদ্ধি'তে বসে গেল। 'বৃদ্ধি'র সময়ও মেয়েরা গান ধরল :

'ওগো বৃদ্ধির কাজে কী কী লাগে?
ষোল মণ চাউল লাগে গো।

ওগো বৃদ্ধির কার্যে কী কী লাগে ?
ষোল বিড়া পান লাগে গো।
ওগো বৃদ্ধির কার্যে কী কী লাগে ?
ষোল মোণ গুয়া লাগে গো।'

'বৃদ্ধির পর এয়োরা শিলে কাঁচা হলুদ বেটে সুধা-সুনীতিকে মাখাল। তারপর মাথায় ধান-দূর্বা দিয়ে উলু দিতে দিতে স্নান করাতে লাগল। সেই সঙ্গে গান :

'তোরা আয় লো সকলে
আমার সীতাকে স্নান করাব
সুশীতল জলে।
কস্তুরী মিশায়ে জল ঢেলে দাও গো
সীতার শিরে।
সখি, সকলে আন গো মাজ কেটে আরো
কুর হরিদ্রা বেটে আনো—'

সুধা-সুনীতির স্নান হয়ে গেলে 'অধিবাসে'র তত্ত্ব নিয়ে হেমনাথ আর বিনু বেরিয়ে পড়ল। দু বাড়িতে তত্ত্ব যাবে। মাছ, পান, তামার পরাতে পরাতে নানা রকমের মিষ্টি। এত জিনিস হাতে করে তো নিয়ে যাওয়া যায় না। তাই ভবতোষের ফীটনটা সকাল বেলাতেই আনিয়ে রেখেছিলেন হেমনাথ।

প্রথমে বিনুরা গেল হিরণদের বাড়ি। সেখানে বেশিক্ষণ বসল না; তত্ত্ব নামিয়ে দিয়ে সোজা রামকেশবের বাড়ি চলে এল।

এখানেও সানাই বাজছে, ঢাক বাজছে। মাঝে মাঝে শাঁখ এবং কল কল উলুর আওয়াজ আসছে।

বিনুরা বাড়ির ভেতর আসতেই সাড়া পড়ে গেল। ঝুমা কোথায় ছিল, ছুটতে ছুটতে সামনে এসে হাজির।

আজ দারুণ সেজেছে ঝুমা। অন্যদিন ফ্রক পরে থাকে। আজ হলুদ রঙের সিল্কের শাড়ি আর লাল টুকটুকে একটা জামা পরেছে। শাড়িটার গায়ে ছোট ছোট নীল ময়ূর। কপালে আগুনের কুঁড়ির মতন কুমকুমের একটি টিপ। টিপ-টাকে গোল করে ঘিরে চন্দনের বিন্দু। চোখে কাজলের টান। গালে এবং ঠোঁটে লালচে রং। আঙুলে সবুজ পাথর বসানো লম্বা আংটি, গলায় হার, হাতে সোনার চুড়ি, বাঁ হাতের সুডোল নরম কব্জিটাকে বেষ্টন করে সরু ফিতেতে বাঁধা চৌকো ঘড়ি।

ঝুমার সাজটাজ নিয়ে ঠাট্টা করতে যাচ্ছিল বিনু। তার আগেই ঘাড়খানা

বাঁকিয়ে গালে একটি হাত রেখে ঝুমাই বলে উঠল, 'বাবা, কি সাজটাই না সেজেছে! একেবারে বরবেশ।'

চমকে নিজের দিকে তাকাল বিনু। তার পরনে ধবধবে পাটভাঙা ধুতি, দুধ-রঙ সিল্কের পাঞ্জাবি, পায়ে নতুন পাম্প-শু। সাজসজ্জা তারও কিছু কম না। বিব্রত হেসে বিনু বলল, 'না মানে—'

চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঝুমা বলতে লাগল, 'যা সেজেছ, এখন কারো সঙ্গে মালা-বদল করিয়ে দিলেই হয়—'

বিনুর আড়ষ্টতা কেটে গিয়েছিল। হাসতে হাসতে বলল, 'আমার আপত্তি নেই। একজন যদি রাজী থাকে আজই—' বলে চোখের তারায় ইঙ্গিত করল।

ইঙ্গিতটা বুঝেছে ঝুমা। ঝঙ্কার দিয়ে বলল, 'আহা-হা, আহ্লাদ কত—'

বিনু হাসতেই লাগল।

ঝুমা আবার বলল, 'ওবেলা তোমাদের বাড়ি যাচ্ছি।'

'বরযাত্রীদের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, বাসর জাগব। তোমাকেও জাগতে হবে।

'নিশ্চয়ই।'

'বাসরে তোমার কী হাল করি, দেখো।'

'দেখব।'

একটু ভেবে ঝুমা বলল, 'বাসর তো সেই রাত্রিবেলায়। তখন যা হবার হবে। এখন একটু মজা করি—'

বিনু ভয়ে ভয়ে বলল, 'কী করবে?'

উত্তর না দিয়ে ছুটে কোথায় যেন চলে গেল ঝুমা। পরক্ষণেই ফিরে এসে বিনু কিছু বুঝবার আগেই এক গাদা হলুদ তার নাকে-মুখে-ধুতি-পাঞ্জাবিতে মাখিয়ে দিল।

বিনু বলতে লাগল, 'কী করছ! কী করছ?'

ঝুমা বলল, 'একদিন তো মাখতেই হবে। মাখলে কেমন লাগে ছাখো—'

গোধূলি লগ্নে বিয়ে। বেলা থাকতে থাকতেই দুই বর এসে পড়ল। বেশিক্ষণ তাদের বসতে হল না, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিয়ের আসরে নিয়ে যাওয়া হল। সানাই, ঢোল, কাঁসি আর শাঁখের বাজনা, ঘন ঘন উলুধ্বনি—এর মধ্যে পর পর দুই মেয়েকে সম্প্রদান করলেন অবনীমোহন। সাত পাক ঘোরাবার সময় এয়োরা গান ধরল:

'আমতলায় ঝামুর ঝুমুর কলাতলায় বিয়া,
আইল গো সুন্দরীর জামাই মুকুট
মাথায় দিয়া।
মুকুটের তলে তলে চন্দনের ফোঁটা।
চল সখি সবাই মিলা জামাই বরি গিয়া।
ও রাধে ঠমকে ঠমকে হাঁটে
শ্যামচাঁদের পাছে যেমন ময়ূরে প্যাখম ধরে।
আগে যায় গো শ্যাম রাজা
পাছে যায় গো রাধা,
তারও পাছে যায় গো পুরুত
ভৃঙ্গার হাতে লইয়া।
এক পাক, দুই পাক, তিন পাকও যায়,
সাত পাক গিয়া রাধা নয়ন তুইলা চায়।'

বিয়ের আসর থেকে সোজা বাসরঘরে। পাশাপাশি দুই বাসরঘর সাজানো হয়েছে। সেখানে মেয়েদেরই শুধু ভিড়। ঠাট্টা, ঠিসারা, বিদ্যুৎচমকের মতন হাসাহাসি, ঠেলাঠেলি—এর মধ্যেই দুই ঘরে চাল খেলা, যো-খেলা হয়ে গেল। তারপর শুরু হল জামাই নাজেহাল-করা ধাঁধা। ধাঁধার পর স্নেহলতা রঙ্গিণী মূর্তি ধরলেন। দুই বাসরে ঘুরে ঘুরে মাথায় আড়-ঘোমটা টেনে মাজা বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে গাইতে লাগলেন :

'ওগো বর এলাম তোমার বাসরে
একটা গান গাও না শুনি,
গান যদি না গাও, আমার নাতনীর
ধর পাও,
নহিলে মিলবে না সোনার চাঁদবদনী।'

এত ভিড়ের ভেতর ছুঁচের পেছনে সুতোটির মতন বিনুর পেছনে ঝুমা লেগেই আছে। আর ঝিনুক? জল খেলা, চাল খেলা, ধাঁধা, নাচ, গান, ঠাট্টা, রগড়—কিছুই যেন বুঝতে পারছিল না সে। পলকহীন ঝুমা আর বিনুর দিকে তাকিয়ে ছিল সে।

এ বিয়ের আরো একটা দিক আছে। সেটা এইরকম। হেমনাথ রাজ্যসুদ্ধ লোককে নেমন্তন্ন করে এসেছিলেন, বিয়ে দেখার নেমন্তন্ন। কিন্তু খাবার জন্য

তাদেরই ডেকেছিলেন যারা দেশজোড়া আকালে আর মন্বন্তরে একটু ফ্যানের আশায় রাজদিয়ার রাস্তায় রাস্তায় প্রেতমূর্তির মতন ঘুরে বেড়ায়।

সন্ধ্যে থেকে হেমনাথ তাদের সামনে দাঁড়িয়ে তদারক করে খাওয়াচ্ছিলেন।

সকাল থেকেই লারমোর এ বাড়িতে আছেন। তিনি বলেছেন, 'এ কি করছ হেম! না খেয়ে খেয়ে ওদের পেট মরে গেছে। তার ওপর ভালমন্দ পড়লে আর দেখতে হবে না। সটান যমরাজার দরবারে গিয়ে হাজির হবে।'

হেমনাথ বলেছেন, 'এমনিও মরবে, অমনিও মরবে। না খেয়ে মরে কী হবে, খেয়েই মরুক।'

খাওয়া-দাওয়া যখন শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় গদু চক্কোত্তি এসে হাজির। যুগলের বৌভাতে সে এসেছিল, তারপর এই দেখা গেল। চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে গদুর। বুকের হাড়গুলো গুনে নেওয়া যায়; চোখ ভেতরে ঢুকে গেছে।

হেমনাথ বললেন, 'তোমার এ কি হাল হয়েছে চক্কোত্তি!'

গদু চক্কোত্তি বলল, 'আর কইয়েন না হ্যামকত্তা, না খাইয়া খাইয়া শরীল গেল। যা আকাল পড়ছে তাতে কেউ আর খাইতে ছায় না। আগে মাইন্‌ষে আনন্দ কইরা খাওয়াইত; অহন আমারে দেখলে মুখ ফিরাইয়া নেয়। যা দুদ্দশা, তাগোই বা দোষ কী?'

'সে তো ঠিকই। অনেক রাত হয়ে গেছে; হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসে যাও।'

যুগলের বিয়ের সময় গদু চক্কোত্তি যা খেয়েছিল সুধা-সুনীতির বিয়েতে তার তিনগুণ খেল। কিন্তু কে জানত, এই খাওয়াই তার শেষ খাওয়া।

যাই হোক খেয়ে টেয়ে চলে গেল গদু চক্কোত্তি। দিন দুই পর খবর এল, এখান থেকে মাইল তিনেক দূরের এক গ্রামে ভেদবমি করে সে মারা গেছে।

॥ চুয়াল্লিশ ॥

সুধা-সুনীতির বিয়ের মাসখানেক পর একদিন দুপুরবেলা ভয়ানক শ্বাসকষ্ট শুরু হল সুরমার। তক্ষুনি লারমোরকে ডেকে আনার জন্য করিমকে পাঠানো হল। কিন্তু লারমোর পৌঁছুবার আগেই সব শেষ।

এ বছর পুজোর পর থেকেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন সুরমা। চলাফেরা দূরের কথা, উঠে বসবার শক্তিটুকু পর্যন্ত তাঁর ছিল না। অদৃশ্য রক্তশোষা দেহের

সব সার যেন চুষে নিয়ে একটা বাক্সে সাদা কাগজের মতন সুরমাকে ফেলে রেখে গিয়েছিল।

এ বাড়ির লোকেরা মনে মনে অনেক আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিল। বুঝতে পারছিল, সুরমা খুব বেশিদিন বাঁচবেন না। দ্রুত আলো নিভে আসার মতন তাঁর আয়ু ফুরিয়ে আসছিল। যা অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী, আজ দুপুরবেলা তা ঘটে গেল।

খবর পেয়ে সুধা-সুনীতি-হিরণ-আনন্দ ছুটে এল। শুধু কি ওরাই, কুমোর-পাড়া-কামারপাড়া-যুগীপাড়া-তিলিপাড়া, সারা রাজদিয়া, রাজদিয়াই বা কেন, মৃত্যু-সংবাদ কানে যেতেই চারদিকের গ্রামগঞ্জগুলো থেকে অসংখ্য মানুষ মলিন মুখে হেমনাথের বাড়ির দিকে আসতে লাগল।

সমস্ত বাড়িখানা জুড়ে কান্না ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। সুধা-সুনীতি সুরমার অসাড় বুকে মুখ গুঁজে অবোধ শিশুর মতন কাঁদছিল, 'তুমি আমাদের ফেলে কোথায় গেলে মা?'

সুরমার শিয়রের কাছে বসে ছিলেন স্নেহলতা আর শিবানী। সজল চোখে ভাঙা ভাঙা গলায় তাঁরা বলছেন, 'আমাদের কাঁদাবি বলেই কি এতদিন পর রাজদিয়া এসেছিলি মা?'

একধারে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল ঝিনুক। আরেক ধারে হেমনাথ এবং অবনীমোহন ঘন ঘন হাতের পিঠে চোখ মুছছিলেন। তাঁদের চোখ ফোলা ফোলা, আরক্ত, জলপূর্ণ।

এত কান্নার মাঝখানে বিনু কিন্তু একটুও কাঁদতে পারছিল না। বুকের ভেতর পাষাণভারের মতন কি যেন চেপে আছে, চোখ ফেটে যাচ্ছে কিন্তু এক ফোঁটা জলও বেরুচ্ছে না। এত লোকজন, এত কান্না, শোকোচ্ছ্বাস—কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছিল না সে। দেখতে বা বুঝতে পারছিল না। বিনুর সমস্ত অনুভূতি বুঝিবা অসাড় অবোধ হয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে গেল।

ওদিকে কারা যেন কুড়োল দিয়ে বাগানের বুড়ো একটা আমগাছ কেটে ছোট ছোট খণ্ড করে ফেলল। তারপর পুকুরের ওপারে উঁচু মতন জায়গাটায় চিতা সাজাল।

এদিকে স্নেহলতারা সিঁদুরে-চন্দনে এবং রাশি রাশি ফুলে সুরমাকে সাজিয়ে দিলেন। তারপর কারা যেন হরিধ্বনি দিয়ে তাঁকে কাঁধে তুলে পুকুরপাড়ের দিকে নিয়ে গেল। হেমনাথ বিনুর একটা হাত শক্ত করে ধরে শবযাত্রীদের সঙ্গে

সঙ্গে সঙ্গে চললেন। সুধা-সুনীতি-স্নেহলতা-শিবানী-অবনীমোহন—কেউ বাড়ি থাকল না। সবাই চলেছে আর অভিভূতের মতন বুক ফাটিয়ে কাঁদছে।

বিনুর মনে হল, সে যেন মাটির ওপর দিয়ে হাঁটছে না, হাওয়ার ভেতর ভারহীন হাল্কা শরীর নিয়ে ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে।

চিতায় তুলবার আগে সুরমাকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরানো হল। পুরুত জোরে জোরে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছিল। শব্দগুলো কানে আসছিল ঠিকই কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিল না বিনু।

একটু পর সুরমাকে চিতায় তোলা হল। এবার মুখাগ্নির পালা। বিনুকেই তা করতে হবে। কে যেন সাদা ধবধবে একগোছা পাটশোলার মাথায় আগুন ধরিয়ে তার হাতে দিল। হেমনাথ তাকে ধরে চিতার চারধারে প্রদক্ষিণ করাতে লাগলেন। পুরুতটা মন্ত্র পড়তে পড়তে আগে আগে চলতে লাগল। বিনুর মনে হতে লাগল, তার চারপাশে সমস্ত চরাচর যেন দুলছে।

চিতাটাকে ক'বার প্রদক্ষিণ করেছে, বিনু মনে করতে পারল না। এক সময় পুরুতের কথায় মন্ত্রচালিতের মতন সুরমার মুখে পাটকাঠির আগুন ছোঁয়াল।

শবযাত্রীরা চারদিক থেকে চিৎকার করে করে বলতে লাগল, 'বল হরি—'

'হরি বোল—'

তার পরেই চিতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

কতক্ষণ আর? চৈত্র মাসের রাত গাঢ় হবার আগেই সুরমার রুগ্ন শীর্ণ দেহ চিতাধূমে বিলীন হয়ে গেল।

আগুন নিভে গেলে চিতা ধুয়ে শবযাত্রীরা পুকুরঘাটে স্নান করল, বিনুকেও স্নান করানো হল; তারপর নতুন কোরা কাপড়ের তেউনি পরানো হল তাকে; গলায় লোহার চাবি-বাঁধা ধড়া ঝুলিয়ে দেওয়া হল। হাতে দেওয়া হল এক টুকরো কম্বলের আসন।

পরদিন থেকে শুরু হল হবিষ্যি। ঘরের এক কোণে নিজের হাতে নতুন মালসায় আলো চালের একসেদ্ধ ভাত রাঁধে বিনু। কাছে বসে সজল চোখে দেখিয়ে দ্যান স্নেহলতা। রাতে একটু দুধ আর ফল-টল খেয়ে খালি মেঝেতে একটুকরো নতুন কাপড় পেতে শুয়ে পড়ে।

রাজদিয়ার সব বাড়ি থেকে হবিষ্যির উপকরণ পাঠাচ্ছে—আলো চাল, কাঁচা দুধ, সর বাটা ঘি, আলু, কাঁচকলা ইত্যাদি।

দেখতে দেখতে শ্রাদ্ধ চুকে গেল। শ্রাদ্ধের পরদিন মৎস্যমুখী। রাজদিয়ায় হেন মানুষ নেই যে সুরমার শ্রাদ্ধে না এসে পেরেছে।

বিনুদের সংসারে এই প্রথম মৃত্যু। একটি মৃত্যুই বিনুর চোখে জগতের রূপ একেবারে বদলে দিয়ে গেছে।

এখন, এই চৈত্র মাসে হিজলগাছগুলো ফুলে ফুলে ছেয়ে যেতে শুরু করেছে। কাউগাছের ডালে ডালে গুটি ধরেছে। মান্দার আর শিমুল গাছগুলো সারা গায়ে থোকা থোকা আগুনের মতন লাল টুকটুকে ফুল ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাগানের আমগাছগুলোতে গাঢ় সবুজ রঙের আম লম্বা বোঁটায় সারা দিন দোল খায়। পরিষ্কার করে মুছে দেওয়া আয়নার মতন আকাশটা ঝকমকে। সকালে-দুপুরে-বিকেলে, পুকুরের ওপারে শূন্য মাঠের মাথায় কত রকমের পাখি যে উড়তে থাকে—কানিবক, পানিকাউ, টিয়া, বুলবুলি, ধবধবে গো-বক।

যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, এখন শুধু রঙের সমারোহ। লাল-নীল-সবুজে মনোহর এই বসুন্ধরা বিনুকে আজকাল আর আকুল করে না। যুগল চলে যাবার সময় ধানের ক্ষেত, শাপলা বন, জলসেঁচি শাকের ঘন জঙ্গল, উলু-খড়ের বন, কেয়া ঝোপ, বেত ঝোপ, বনতুলসীর চাপ চাপ অরণ্য—জল বাঙলার সজল শ্যামল ভূখণ্ডের সবটুকুর উত্তরাধিকার তার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিল। এই সেদিনও একা একা শূন্য মাঠের আলপথ ধরে মোহাচ্ছন্নের মতন হেঁটে যেতে তার ভাল লাগত। আকাশ জুড়ে ফিনফিনে পাতলা ডানায় ফড়িংদের ওড়াওড়ি দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে যেত। চনচনে সোনালি রোদ, উল্টোপাল্টা বাতাস, গাছপালা, বনানী, নরম তৃণদল—সব যেন জাদুকরের মতন তাকে সম্মোহিত করে ফেলত।

কিন্তু আজকাল সারা দিনই প্রায় পুবের ঘরের পৈঠেয় চুপচাপ বসে থাকে বিনু। পুকুরের ওপারে ধু-ধু দক্ষিণের চক, অনেক দূরের দিগন্ত, আকাশ, বনভূমি—সব মিলিয়ে যেন এক অপরিচিত মহাদেশ। ওখানকার কোন কিছুই সে জানে না, চেনে না। কোনদিন ওখানে সে যেন যায় নি, যাবার আকর্ষণও বোধ করে না।

দিনের বেলায় একটা দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ে বিনুর। সুরমাকে যেখানে পোড়ানো হয়েছে তার পাশেই উঁচু বাজ্‌-পোড়া সুপুরি গাছটার মাথায় সমস্ত দিন একটা শঙ্খচিল ডানা মুড়ে বসে থাকে; সন্ধ্যে হলেই পাখিটা উড়ে যায়।

শুধু দিনের বেলাতেই না, রাত্তিরেও ঐ পৈঠেটিতে বসে থাকে বিনু। তার চোখের সামনে একটি দুটি তারা ফুটতে ফুটতে সমস্ত আকাশ ছেয়ে যায়। এক সময় চাঁদও ওঠে।

রাজদিয়ায় আসার পর হেমনাথ তাকে নক্ষত্র চিনিয়েছিলেন। ঐ তারাটা

অরুন্ধতী, ঐটা লুব্ধক, ঐটা শতভিষা। ছেলেবেলায় মায়ের কাছে বিনু শুনেছিল, মানুষ মরে গেলে নাকি আকাশের তারা হয়ে যায়। ঐ সুদূর জ্যোতিষ্কলোকের কোন্ তারাটি মা, কে জানে।

প্রায় রোজই ঝিনুক তার পাশে এসে নিঃশব্দে বসে পড়ে। কখন যে মেয়েটা আসে টেরও পাওয়া যায় না। হঠাৎ একসময় আধফোটা ঝাপসা গলায় সে ডেকে ওঠে, 'বিনুদা—'

বিনু মুখ ফেরায় না। উদাস গলায় বলে, 'কী বলছ ?'

'পিসিমার জন্যে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না ?'

বিনু চুপ।

ঝিনুক আবার বলে, 'জানো বিনুদা, মায়ের জন্যে আমারও খুব কষ্ট হয়।'

হঠাৎ বিনুর মনে হয়, ঝিনুকের সঙ্গে এক জায়গায় তার ভারি মিল। মেয়েটাকে বড় আপনজন মনে হয়।

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

সুরমার মৃত্যুর ব্যাপারে অনেক দিন স্কুল কামাই হয়েছে। প্রায় মাসখানেক পর আজ স্কুলে গেল বিনু।

সেটেলমেণ্ট অফিসের কাছে আসতে ঝুমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আচমকা বিনুর মনে পড়ল, মায়ের মৃত্যুর পর রাজদিয়ার সব মানুষ তাদের বাড়ি গেছে। শুধু ঝুমা ছাড়া।

ঝুমা বলল, 'তুমি খুব রোগা হয়ে গেছ বিনুদা।'

আবছা কি উত্তর দিয়ে বিনু বলল, 'মা মরে গেল। তুমি তো আমাদের বাড়ি একদিনও এলে না ?'

দুই হাত এবং মাথা জোরে জোরে নেড়ে ঝুমা বলল, 'তোমাদের বাড়ি গেলেই তো কান্নাকাটি; ও-সব আমার ভাল লাগে না।'

পলকে মুখখানা মলিন হয়ে গেল বিনুর! মনে হল, ঝুমা বড় দূরের মানুষ।

সুরমার মৃত্যুর মাস দুই পর সুনীতিকে নিয়ে আনন্দ কলকাতায় চলে গেল। তাদের সঙ্গে শিশিররাও গেলেন। কলকাতার অবস্থা নাকি এখন ভাল। জাপানী বোমার ভয়ে যারা পালিয়ে গিয়েছিল সব ফিরে আসতে শুরু করেছে।

যাবার আগের দিন সুনীতিরা দেখা করতে এসেছিল; ঝুমাও এসেছিল ওদের সঙ্গে।

আড়ালে ডেকে নিয়ে ঝুমা বিনুকে বলেছে, 'আমরা যাচ্ছি। কলকাতায় গিয়ে চিঠি দেব। তুমিও কিন্তু চিঠি লিখবে।'

আস্তে করে ঘাড় কাত করেছে বিনু।

সুনীতিরা চলে যাবার পর দুটো সপ্তাহও কাটল না। একদিন সকালবেলা হিরণ এসে হাজির।

হেমনাথ বাড়িতেই ছিলেন। বললেন, 'কী ব্যাপার হিরণচন্দ্র?'

'একটা কথা ছিল দাদু—'

'নির্ভয়ে বলে ফেল।'

খানিক ইতস্তত করে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে হিরণ বলল, 'আমি কলকাতায় একটা ভাল চাকরি পাচ্ছি দাদু—'

হেমনাথের ভুরু কুঁচকে গেল, 'কিসের চাকরি?'

'ওয়ারের। অফিসার র‍্যাঙ্কের চাকরি। নেব?' হিরণের চোখ চকচক করতে লাগল।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন হেমনাথ, 'ওয়ারের চাকরি নিবি বলেই কি তোকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম? তুই চলে গেলে কলেজের কী হবে? ছি-ছি, লোভটাই বড় হল?'

হিরণের মুখ কালো হয়ে গেল।

এর পর অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকলেন হেমনাথ। বুঝলেন, হিরণকে আটকাবার চেষ্টা বৃথা। যুদ্ধের চাকরি তার অসীম শক্তি দিয়ে হিরণকে রাজদিয়া থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবেই। এক সময় গম্ভীর গলায় হেমনাথ বললেন, 'ইচ্ছে যখন হয়েছে, যাও। তবে এতে আমার ভীষণ আপত্তি—' হেমনাথকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে। খুবই হতাশ আর করুণ।

দিনকয়েক পর সুধাকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেল হিরণ।

দেখতে দেখতে আরো ক'মাস কেটে গেল।

সুরমা নেই। সুধা-সুনীতি চলে গেছে। হেমনাথের বাড়িটা এখন আশ্চর্য নিঝুম। কিছুদিন আগেও হৈ-চৈ, হুল্লোড় এবং জীবনের নানা প্রাণবন্ত খেলায় এ-বাড়িতে সব সময় উৎসব লেগে থাকত। এখন তাকে ঘিরে অপার শূন্যতা এসেছে যেন।

মাঝে মাঝে শিবানী আর স্নেহলতা সুরমার জন্য বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদেন।

অবনীমোহন আর হেমনাথ উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন।

এখন বর্ষা।

মেঘ-বৃষ্টি-বাজ আর ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমক—চতুরঙ্গে আকাশ সারা দিন সেজেই আছে। ক'বছর ধরেই বিনু দেখছে, বর্ষা নামলেই পুকুরের ওপারের মাঠ ভেসে যায়। তার মাঝখানে কৃষাণ-গ্রামগুলো দ্বীপের মতন কোন রকমে মাথা তুলে থাকে। মাটির তলায় কোথায় যে শাপলা-শালুক আর পদ্মের বীজ লুকিয়ে থাকে, কে বলবে। জল পড়লেই লাফ দিয়ে তারা বেরিয়ে আসে। সাদা সাদা শাপলা ফুলে, থালার মতন বড় বড় গোল পদ্মপাতায় আর লাল টুকটুকে শালুকে জলপূর্ণ চরাচর ছেয়ে যায়। গাঢ় সবুজ রঙের ধান আর পাটের চারাগুলো বর্ষার জলের ওপর দিয়ে মাথা তুলে থাকে। মাঝে মাঝে এক আধটা নিঃসঙ্গ বন্যা গাছ; কোথাও বা হিজলের জনতা।

এবারও তার ব্যতিক্রম নেই। উত্তরে-দক্ষিণে-পুবে পশ্চিমে, যেদিকেই তাকানো যাক, চোখ জুড়ে বর্ষায় সেই পরিচিত জলছবি।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা বিনু আর ঝিনুক পুবের ঘরে পড়তে বসেছিল। সামনে আড়াইতলা পিলসুজে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলছে। অবনীমোহন এবং হেমনাথও এ ঘরেই ছিলেন। আজকের স্টিমারে যে খবরকাগজখানা এসেছে, দু'জনে ভাগা-ভাগি করে পড়ছেন। সুরমার মৃত্যুর পর খবর কাগজ নিয়ে আজকাল আর এ-বাড়িতে আসর বসে না।

বাইরে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছিল। হঠাৎ ঝুম ঝুম আওয়াজে বিনুরা মুখ তুলে তাকাল।

চোখের সামনে থেকে কাগজ নামিয়ে হেমনাথ বললেন, 'এই বৃষ্টিতে আবার কে এল?'

ততক্ষণে বিনু দেখতে পেয়েছে। উঠোনের মাঝখানে ঝিনুকদের ফীটনটা এইমাত্র এসে থামল।

বিনু বলল, 'মনে হচ্ছে ভবতোষ মামা এসেছেন—'

সত্যিই ভবতোষ। একটু পর তিনি ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

ভবতোষের দিকে তাকিয়ে সবাই চমকে উঠল। চুল এলোমেলো, চোখ দুটো লাল টকটকে এবং ফুলে ফুলে অস্বাভাবিক বড় হয়ে গেছে। মনে হয়, যে কোন সময় সে দুটো ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে। চোখের কোলে গাঢ় কালির

ছোপ, কণ্ঠার হাড় ফুটে বেরিয়েছে। জামার বোতাম নেই; বুকটা হাট করে খোলা; কোঁচার দিকটা অনেকখানি খুলে মাটিতে লুটোচ্ছে।

কেউ কিছু বলবার আগেই ভাঙা ভাঙা ঝাপসা গলায় ভবতোষ বললেন, 'কাকাবাবু, আপনার বৌমা সেই লোকটার সঙ্গে পালিয়ে গেছে—' তাঁর চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়তে লাগল।

হেমনাথ চকিত হলেন, 'সে কি! বৌমা তার বাপের বাড়ি ছিল না?'

'হ্যাঁ। ওখান থেকেই গেছে। আচ্ছা আমি যাই—' বলেই প্রায় ছুটতে ছুটতে ফীটনটায় গিয়ে উঠলেন।

হেমনাথ বিমূঢ়ের মতন একটুক্ষণ বসে থাকলেন। তারপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগলেন, 'ভব—ভব—'

ভাবতোষ সাড়া দিলেন না। ঝুম ঝুম আওয়াজ কানে ভেসে এল। অর্থাৎ ফীটনটা চলতে শুরু করেছে।

কী করবেন, হেমনাথ যেন ভেবে পেলেন না। হঠাৎ তাঁর চোখ এসে পড়ল বিনুর ওপর। দ্রুত শ্বাসটানার মতন করে বললেন, 'যা তো দাদা, ভব'র সঙ্গে যা। ছেলেটা আবার ঝোঁকের বশে এক কাণ্ড না করে বসে। সবসময় ওর কাছে থাকবি। যদি তেমন বুঝিস, আজ রাত্তিরে আর ফিরতে হবে না।'

বিনু ছুটে গিয়ে যখন ফীটনটা ধরল তখন সেটা বাগান পেরিয়ে রাস্তার ওপর চলে এসেছে।

ভবতোষ বললেন, 'এই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তুমি আবার এলে কেন?'

বিনু ভয়ে ভয়ে বলল, 'দাদু পাঠিয়ে দিলেন।'

শব্দ করে অদ্ভুত হাসলেন ভাবতোষ, 'কাকাবাবুর ভয়, আমি বুঝি আত্মহত্যা করব। তা বোধহয় করব না। আচ্ছা, এসেছ যখন ওঠ—'

বিনু গাড়িতে উঠল।

তারপর চমকপ্রদ ব্যাপার ঘটল। পথে যত বাড়ি পড়ল সব জায়গায় গাড়ি থামিয়ে থামিয়ে জড়িত ভাঙা গলায় স্ত্রীর চলে যাবার কথা বলতে লাগলেন ভাবতোষ। মানুষের বেদনা প্রকাশের রূপ কী বিচিত্র!

সারা রাজদিয়া ঘুরে ভবতোষ যখন তাঁর বাড়ি ফিরলেন তখন অনেক রাত। বাকি রাতটুকু কেউ আর ঘুমলো না। বিনুকে সামনে বসিয়ে সমানে স্ত্রীর কথা বলে যেতে লাগলেন ভবতোষ। সমস্ত শুনে বিনু যা বুঝল, সংক্ষেপে এইরকম।

বিয়ের আগেই ঝিনুকের মায়ের সঙ্গে একজনের ভালবাসা ছিল। তা

সত্ত্বেও তাঁর বাপ-মা একরকম জোর করেই ভবতোষের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়েছেন। এ বিয়ে মেনে নিতে পারেন নি ঝিনুকের মা; সংসারে নিয়ত ঝগড়া-ঝাটি, অশান্তি লেগেই ছিল। পরিণামে একদিন তিনি বাপের বাড়ি চলে গেলেন। আজ সকালে খবর এসেছে, ভালবাসার নেই লোকটির সঙ্গে তিনি চলে গেছেন।

সমস্ত রাত ভবতোষের কাছে কাটিয়ে সকালবেলা বাড়ি ফিরল বিনু। ফিরেই দেখল, একা একা বসে ঝিনুক কাঁদছে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বিনু। ঝিনুককে দেখতে দেখতে অপার মমতায় তার মন ভরে যেতে লাগল। অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে ঝিনুকের পাশে গিয়ে বসল সে। খুব কোমল গলায় বলল, 'কেঁদো না ঝিনুক, কেঁদো না—'

দু' হাতে মুখ ঢেকে ঝিনুক ফোঁপাতে লাগল, 'আমার মা চলে গেছে।'

বিনু বলল, 'আমার কথা একবার ভাবো তো; আমারও মা নেই।'

মুখ থেকে হাত সরিয়ে জলভরা গভীর চোখে বিনুর দিকে তাকাল ঝিনুক।

॥ ছেচল্লিশ ॥

আরো একটা বছর ঘুরে গেল।

এর মধ্যে বিনু ম্যাট্রিক পাশ করে রাজদিয়া কলেজে ভর্তি হয়ে গেছে। ঝিনুক ক্লাস এইটে পড়ছে।

সুরমার মৃত্যুর পর অনেকদিন এই বাড়ির ওপর দিয়ে উদাস হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল। তখন বিনুর মনে হত, পৃথিবীর আহ্নিক গতি বার্ষিক গতি বুঝি চিরদিনের জন্য থেমে গেছে। মনে হত, চোখের সামনের মনোহর দৃশ্যময় জগতের কোথাও উজ্জ্বল রঙ নেই। সব দীপ্তিহীন ধূসর হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে দুঃখের তীব্রতা কমে এসেছে। শোকটা এখন আর অনুভূতিতে নেই, স্মৃতি হয়ে গেছে।

সুধা নেই, সুনীতি নেই, সুরমা মৃত। একদিন এই বাড়িটা ঘিরে সব সময় যেন উৎসব লেগে থাকত। হিরণ আসত, আনন্দ আসত, রুমা-ঝুমারা আসত। জাপানী বোমার ভয়ে যারা দেশে পালিয়ে এসেছিল, তারা আসত। গান-বাজনা-নাটক এবং হুল্লোড়ে বাড়িটা গম গম করত।

ভরা কোটালের পর প্রবল ভাঁটার টানে সবাই অদৃশ্য হয়ে গেছে। বাড়িটা আজকাল আশ্চর্য নিঝুম। যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, শুধু শূন্যতা।

সুধা-সুনীতি সেই যে কলকাতায় চলে গিয়েছিল, তারপর আর রাজদিয়ায় আসে নি। মাঝে মাঝে এক আধখানা চিঠি লিখে সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখছে শুধু।

সুধা-সুনীতির কথা থাক, নতুন সংসার পেয়ে তারা বিভোর হয়ে আছে। এখান থেকে যাবার পর ঝুমাটা খুব চিঠি লিখত বিনুকে—সপ্তাহে দুটো করে। কবে থেকে চিঠি আসা কমতে কমতে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, বিনু লক্ষ্য করে নি।

সময়টা জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি। বাগানের আমগাছগুলো কবেই নিঃস্ব হয়ে গেছে, ডালে ডালে পাতা ছাড়া আর কিছুই নেই। কালোজাম, গোলাপজাম, রোয়াইল আর লটকা ফলের গাছগুলোরও এক অবস্থা। শুধু আষাঢ়ে আমাগাছগুলো সারা গায়ে কিছু কিছু ফল সাজিয়ে রেখেছে। তবে বেতঝোপের দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়, হাল্কা বাদামি রঙের গোল গোল থোকা থোকা বেতফলে ঝোপগুলো ছেয়ে আছে।

গরম শেষ হয়ে এল। এর মধ্যেই আকাশ জুড়ে কালো কালো ভবঘুরে মেঘের হানা দিতে শুরু করেছে। ক'দিন আর? আষাঢ় মাস পড়লেই মেঘের টুকরোগুলো ঘন হয়ে জমাট বেঁধে চরাচর ছেয়ে ফেলবে। তারপর শুরু হবে বর্ষা। আকাশ থেকে লক্ষ কোটি বৃষ্টির ধারা সারাদিন ধরে, সারারাত ধরে শুধু নামতেই থাকবে।

চৈত্র-বৈশাখে যে মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, নতুন বর্ষা তাদের জুরিয়ে দেবে। তপ্ত তৃষিত বসুন্ধরা স্নিগ্ধ সরস হতে থাকবে। চারদিকে বর্ষা তার সজল ছায়া ফেলতে শুরু করেছে।

একদিন দুপুরে অবনীমোহন কোথায় যেন গিয়েছিলেন। সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে হেমনাথকে বললেন, 'মামাবাবু একটা কথা বলছিলাম—'

হেমনাথ আর বিনু পুবের ঘরে বসে ছিল। স্নেহলতা এইমাত্র এ-ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন হেমনাথ, 'কী কথা অবনী?'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে অবনীমোহন বললেন, 'আমি আসাম যাব।'

'হঠাৎ আসামে!' হেমনাথ অবাক।

তক্ষুনি উত্তর দিলেন না অবনীমোহন।

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'ক'দিনের মধ্যেই বৃষ্টি নেমে যাবে। জমিতে হাল-লাঙল নামাতে হবে। এ সময় তুমি আসাম যেতে চাইছ!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মানে—'

'কী?'

'এ বছর আমি চাষ করব না।'

'তবে জমির কী হবে?'

'ভাবছি বর্গাদারদের কাছে ভাগচাষে দিয়ে দেব।'

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর হেমনাথ বললেন, 'আসাম থেকে ফিরছ কবে?'

'কিছু ঠিক নেই।'

'ওখানে যাবার কী কারণ ঘটল, বুঝতে পারছি না তো।'

'আমি একটা কনট্রাক্ট পেয়েছি।'

'কিসের কনট্রাক্ট?'

'মিলিটারির।'

'কই, আমাকে আগে কিছু বলনি তো—'

'আজই পেলাম, আগে বলব কি করে?' অবনীমোহন হাসলেন।

হেমনাথ বললেন, 'কনট্রাক্ট তো নিয়েছ। আসামে গিয়ে কী করতে হবে?'

'মিলিটারিদের জন্যে রাস্তাঘাট আর পাহাড়ের ওপর ব্যারাক-ট্যারাক তৈরি করতে হবে।'

'তোমার ওসব কাজের অভিজ্ঞতা আছে?'

'বিন্দুমাত্র না'

'তা হলে?'

'করতে করতেই অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে।'

হেমনাথ বিমূঢ়ের মতন তাকিয়ে থাকলেন।

অবনীমোহন বলতে লাগলেন, 'রাজদিয়ায় আসবার আগে চাষ-আবাদের কিছু কি জানতাম? করতে করতেই শিখে গেলাম।'

হেমনাথ এবারও কী উত্তর দেবেন, ভেবে পেলেন না।

অবনীমোহনের দিকে পলকহীন তাকিয়ে ছিল বিনু। বাবাকে সে চেনে। তাঁর মধ্যে কোথায় যেন একটা চঞ্চল যাযাবরের বাস, দুটো দিনও সেটা তাঁকে স্থির থাকতে দেয় না, নিয়ত ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

যৌবনের শুরু থেকে কত কী-ই তো করেছেন অবনীমোহন। অধ্যাপনা-

ব্যবসা-চাকরি, একটা ধরেছেন, আরেকটা ছেড়েছেন। নির্ভর করার মতন কিছু হাতে পেলে মানুষ তাকে ঘিরেই জীবনকে পুষ্পিত করে তোলে। অবনী-মোহনের স্বভাব আলাদা। অনিশ্চয়তার ভেতর ছুটে বেড়ানোতেই তাঁর যত আনন্দ।

এই প্রৌঢ় বয়সে বসুন্ধরার এক কোণে অনেকখানি ভূমি পেয়েছেন তিনি, চারদিক শস্যে-স্বর্ণে পরিপূর্ণ। কোথায় পা পেতে বসে বাকি জীবন কাটিয়ে দেবেন, তা নয়। রক্তের ভেতরে সেই যাযাবরটা তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছে।

চার পাঁচ বছরের মতন রাজদিয়া তাঁকে মুগ্ধ সম্মোহিত করে রেখেছিল। জলবাঙলার এই সরস শ্যামল জায়গাটার আর সাধ্য নেই অবনীমোহনকে ধরে রাখে। তার সম্মোহনের মন্ত্র বৃথা হয়ে যেতে শুরু করেছে।

দিনকয়েক পর অবনীমোহন আসাম চলে গেলেন।

অবনীমোহন চলে যাবার পর সময় যেন ঝড়ের গতিতে ছুটতে লাগল। যুদ্ধের প্রথম দিকে দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনী সমস্ত পৃথিবীকে পায়ের নীচে নামিয়ে এনেছিল। এখন তারা পিছু হটছে। দিকে দিকে শোনা যাচ্ছে মিত্রশক্তির জয়ধ্বনি।

একদিন খবর এল লাল ফৌজ বার্লিনে ঢুকে পড়েছে এবং জার্মানী আত্ম-সমর্পণ করেছে। পূর্ব গোলার্ধে এখনও যুদ্ধের আসর জমজমাট। হঠাৎ আরেকদিন খবর এল, হিরোসিমা নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা পড়েছে। এবং এই দুটি বোমাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ওপর যবনিকা টেনে দিল।

অবনীমোহন সেই যে খবরকাগজ আনার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, এখনও তা চলছে। তিন মাস পর পর হেমনাথ টাকা পাঠিয়ে দেন, ডাকে খবর কাগজ চলে আসে।

একদিন বিনু দেখল, প্রথম পাতা জুড়ে বড় বড় অক্ষরে খবর বেরিয়েছে।

'বিশ্বযুদ্ধের অবসান. মিত্রপক্ষের নিকট জাপানের আত্ম-সমর্পণ: জাপ সম্রাটের ঘোষণা।

'পটাসডাম ঘোষণার সমস্ত শর্ত স্বীকার। মিকাডো কর্তৃক পারমাণবিক বোমার ধ্বংসলীলার কথা উল্লেখ।

'প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও মিস্টার এটলীর বিবৃতি। প্রশান্ত মহাসাগরীয় মিত্র-পক্ষ বাহিনীর প্রতি যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ।

'নিউইয়র্ক, ১৫ই আগস্ট—সম্রাট হিরোহিতো অদ্য বেতারে সরাসরি জাপ

জাতির উদ্দেশে এক বক্তৃতায় বলেন যে, পটাসডাম চরমপত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। জাতির উদ্দেশে সম্রাটের সরাসরি বক্তৃতা এই প্রথম।'

একধারে ছোট হরফে আরেকটা খবর রয়েছে।

'পরাজিত জাপানের প্রতি মিত্রপক্ষের প্রথম আদেশ জারী। জেনারেল ম্যাক আর্থারের প্রতি দূত প্রেরণের নির্দেশ। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি মিত্রবাহিনী কর্তৃক দখলের আয়োজন।'

তার তলায় আরেকটা খবর।

'জাপানী সমর সচিবের আত্মহত্যা। যুদ্ধে পরাজয়ের জের।'

'লণ্ডন, ১৫ই আগস্ট—জাপানী নিউজ এজেন্সির খবরে প্রকাশ যে, জাপানের সমর সচিব কোরেচিকা আনামি গতরাত্রে তাঁর সরকারী বাসভবনে আত্মহত্যা করেছেন।'

কোথায় গ্রেট ব্রিটেন, কোথায় আমেরিকা, কোথায় নরওয়ে, কোথায়ই বা ফ্রান্স আর রাশিয়া। মিত্রবাহিনী জেতার ফলে সে সব জায়গায় নাকি উৎসবের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধজয়ের ঢেউ অখ্যাত নগণ্য রাজদিয়াতেও এসে পড়ল।

মিলিটারি ব্যারাকগুলো আলোর মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে। রঙীন কাগজ দিয়ে বড় বড় তোরণ তৈরি করা হয়েছে। সেগুলো থেকে লাল-নীল কাগজের ঠোঙায় অসংখ্য লণ্ঠন ঝুলছে। আর উড়ছে পতাকা—মিত্রশক্তির সবগুলো দেশের পতাকা রাজদিয়ার আকাশে সগর্বে মাথা তুলে আছে।

যুদ্ধজয়ের আনন্দে সারাদিনই ব্যারাকগুলোতে হুল্লোড় চলছে। নাচ গান আর অবিরাম জ্যাজ বাজনার শব্দে রাজদিয়ার স্নায়ু বুঝি ছিঁড়েই পড়বে। নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা-মাণিকগঞ্জ থেকে কত যুবতী মেয়ে যে আনা হয়েছে তার লেখাজোখা নেই। তা ছাড়া মদের ঢল বয়ে যাচ্ছে। মিলিটারি ব্যারাকের একটি প্রাণীও এখন সুস্থ বা স্বাভাবিক নেই। দিনরাত্রি নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন।

মাসখানেক প্রমত্ত উৎসব চলল। তারপর একদিন রাজদিয়া-বাসীরা দেখতে পেল, ধূসর রঙের সেই বড় স্টিমারটা এসে জেটীঘাটে ভিড়েছে। বিশাল জল-পোকার মতন এই স্টিমারটা করেই নিগ্রো আর আমেরিকান টমিরা রাজদিয়ায় এসেছিল, তাদের লরী-ট্রাক-কামান-বন্দুক-গোলাগুলী এবং অসংখ্য সাজ সরঞ্জাম এসেছিল।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। রাজদিয়া-বাসীরা এবার দেখল, জীপ-ট্রাকের চাকাটাকা খুলে এবং বড় বড় লোহার পেটিতে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করে স্টিমারে তোলা হচ্ছে। একদল টমিও স্টিমারে উঠল।

সকালের দিকে স্টিমারটা এসেছিল, বিকেলে চলে গেল।

এরপর থেকে রোজ সকালবেলা স্টিমারটা রাজদিয়া আসতে লাগল এবং যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম আর একদল করে টমি নিয়ে চলে যেতে লাগল। দশ দিনের ভেতর চারদিক ফাঁকা হয়ে গেল। যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় প্রাণীর কঙ্কালের মতন রাজদিয়া জুড়ে পড়ে থাকল কতকগুলো শূন্য ব্যারাক এবং লম্বা লম্বা পীচের রাস্তা।

যুদ্ধের মাঝামাঝি দু-তিনটে বছর রাজদিয়ার জীবন খুব চড়া তারে বাজছিল, আবার পুরনো স্তিমিত ঢিমে তালের দিনযাপনের মধ্যে ফিরে গেল সে।

॥ সাতচল্লিশ ॥

যুদ্ধের শেষ দিকে বিস্ময়কর একটা খবর এসেছিল—সুভাষচন্দ্রের খবর।

বিনুর মনে পড়ে, তারা রাজদিয়া আসার কিছুদিন পর সুভাষচন্দ্র কলকাতার বাড়িতে অন্তরীণ হয়েছিলেন। সেই অবস্থাতেই একদিন তাঁকে পাওয়া গেল না। সমস্ত দেশ স্তম্ভিত বিস্ময়ে শুনল, ব্রিটিশের সতর্ক বিনিদ্র পাহারার মধ্য দিয়ে তাঁর রহস্যময় অন্তর্ধান হয়েছে। কিভাবে, কোথায়, কোন দুর্গমে তিনি অদৃশ্য হয়েছেন, কেউ জানতেও পারল না। সারা দেশের কাছে সুভাষচন্দ্র এক চমকপ্রদ লিজেণ্ডের নায়ক হয়ে থাকলেন।

তার ক'বছর পর যুদ্ধের যখন শেষ অঙ্ক, শেষ দৃশ্য, সেই সময় উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ওপার থেকে টুকরো টুকরো যেসব খবর আসতে লাগল তাতে শৃঙ্খলিত দেশের হৃৎপিণ্ড বিপুল আশায় দুলতে লাগল।

রূপকথার চাইতেও সে এক অবিশ্বাস্য ইতিহাস। কলকাতা থেকে অন্তর্হিত হয়ে প্রথমে আফগানিস্তান, সেখান থেকে বার্লিন, তারপর টোকিও গেলেন সুভাষচন্দ্র। পদানত দেশ তাঁকে যেন অস্থির উন্মাদ করে তুলেছে।

বীর নায়ক রাসবিহারী তখন আজাদ হিন্দ সংঘ সৃষ্টি করেছেন। সুভাষচন্দ্র তাতে প্রাণসঞ্চার করে নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। 'আজাদ হিন্দ সংঘ' হল আজাদ হিন্দ ফৌজ। ইতিহাসের সে এক পরম শুভক্ষণ। একই পতাকাতলে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে ভারতবর্ষের সকল প্রান্ত এসে হাত মেলাল। সুভাষচন্দ্র সেদিন থেকেই নেতাজী।

তারপর শুরু হল শৃঙ্খলমুক্তির অভিযান। জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে

উধ্বশ্বাসে রুদ্ধমুখে সে এক দুরূহ ব্রতপালন। দেখতে দেখতে সিঙ্গাপুরে জাতীয় পতাকা উড়ল। তারপর বর্মা পেরিয়ে ইম্ফল পেছনে ফেলে ঝড়ের গতিতে কোহিমা পর্যন্ত এল আজাদ হিন্দ ফৌজ।

ঐ কোহিমা পর্যন্তই। এদিকে জাপানের তখন করুণ অবস্থা। রসদ নেই, খাদ্য নেই। ফলে সুভাষচন্দ্রের বড় সাধের 'দিল্লী চল' স্বপ্ন হয়েই রইল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের মরণপণ অভিযান পরাভূত বিধ্বস্ত হয়ে যায়। 'জীবন-মৃত্যু'কে যাঁরা তুচ্ছ করেছিলেন সেই ভয়লেশহীন বীর সন্তানেরা বন্দী হয়ে একে একে দিল্লীর লালকেল্লায় কারারুদ্ধ হয়েছেন। ধীলন, শাহনওয়াজ, সায়গল—পরাধীন জাতির ইতিহাসে নামগুলো সোনার অক্ষরে লিখে রাখবার মতন।

বিনুর মনে আছে, দিনকয়েক আগে খবরের কাগজে পড়েছিল, আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযুক্ত সেনানীদের বিচারের জন্য সামরিক ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছে এবং বন্দীরা আপীল করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

ট্রাইবুনাল গঠনের পর তিন সপ্তাহ বিচার স্থগিত ছিল। আজ লালকেল্লায় তার প্রহসন শুরু হবে। একরকম অনায়াসেই এই বিচারের রায় আগে থাকতে বলে দেওয়া যায়।

সমস্ত দেশের প্রাণপুরুষ এই বীর সেনানায়কদের জন্য উদ্বেল হয়ে উঠেছে। আসমুদ্র হিমাচল বিশাল ভারতবর্ষের এমন কেউ নেই, মনে মনে লালকেল্লার সেই পুরুষ ক'টির পাশে গিয়ে দাঁড়ায়নি। সামরিক ট্রাইবুনালের সামনে বীর সন্তানদের মুক্তির জন্য সওয়াল করতে ছুটে গেছেন ভুলাভাই দেশাই। দীর্ঘ দু যুগ পর ব্যারিস্টার বেশে জওহরলাল আজ ভুলাভাইর পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন।

কোথায় কলকাতা, কোথায় বোম্বাই, কোথায় দিল্লী—সমস্ত ভারতবর্ষ আজ অস্থির, উত্তেজিত। বিচারের আগের মুহূর্তে দেশের আত্মা যেন বজ্রকণ্ঠে দাবি জানাচ্ছে, স্বাধীনতার সৈনিকদের সসম্মানে মুক্তি চাই।

দূর সমুদ্রকল্লোল এই রাজদিয়ায় এসেও ধাক্কা দিল। বিনুরা কলেজে স্ট্রাইক করল, দুটো প্রাইমারি স্কুল, ছেলেদের হাইস্কুল এবং মেয়েদের হাইস্কুলেও স্ট্রাইক হয়ে গেল। তারপর ছাত্রছাত্রীরা ত্রিবর্ণ পতাকা হাতে নিয়ে মিছিল বার করল। সারা শহর ঘুরতে ঘুরতে তারা শ্লোগান দিতে লাগল :

'আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সৈনিকদের—'

'মুক্তি চাই, মুক্তি চাই।'

'জয় হিন্দ—'

'বন্দে মাতরম্—'

'নেতাজীকি—'

'ভারত মাতাকি—'

'জয়।'

'শাহ্‌নওয়াজ-ধীলন-সায়গলকি—'

'জয়।'

একে একে এল রসিদ আলী ডে, বোম্বাইতে নৌবিদ্রোহ। সারা দেশ ঝড়ের দোলায় দুলতে লাগল।

আজাদ হিন্দ সৈনিকদের মুক্তির জন্য আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ, রসিদ আলী ডে—বিদ্যুৎচমকের মতন দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

এদিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে গ্রেট ব্রিটেনের শ্রমিক সরকার ঘোষণা করলেন, একটি ক্যাবিনেট মিশন এদেশে পাঠাবেন। উদ্দেশ্য, কিভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় তার সূত্র উদ্ভাবন করা।

উনিশ শ ছেচল্লিশের তেইশে মার্চ ক্যাবিনেট মিশন ভারতে এসে পৌঁছুল। দলে তিনজন সদস্য—লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং মিস্টার এ. ভি. আলেকজাণ্ডার।

ক্যাবিনেট মিশন ভারতবর্ষে এসেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের সঙ্গে আলোচনা শুরু করল।

লাহোর প্রস্তাবের পর মুসলিম লীগ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারতবর্ষের দেহ ছিন্ন করে একটি সার্বভৌম মুসলমান রাষ্ট্র গড়তেই হবে। লীগ নেতাদের ভয় দেশ স্বাধীন হলে সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিরাপত্তা থাকবে না, 'হিন্দু রাজ' তাদের ধ্বংস করে দেবে।

কিন্তু ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যরা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন, দেশভাগে তাঁদের বিন্দুমাত্র সায় নেই। তখন মোটামুটি স্থির হয়, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা এবং সুশাসনের জন্য ফেডারেল গভর্নমেণ্ট তৈরি করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার দায়িত্ব। এ. বি এবং সি—দেশকে তিনটি অংশে ভাগ করে যত বেশি বিষয়ে সম্ভব আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে।

'বি' বিভাগে থাকবে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বৃটিশ

বেলুচিস্তান। এই অংশটিতে নিরঙ্কুশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা। 'সি' বিভাগে থাকবে বাঙলা ও আসাম। এখানেও মুসলমানরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন হাতে পেলে মুসলমানদের সন্দেহ ও উৎকণ্ঠা অন্তত থাকার কথা নয়। তবে জাতীয় ঐক্যের দিকে দৃষ্টি রাখতেই হবে।

মুসলিম লীগ শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। কংগ্রেসেরও এতে আপত্তি ছিল না। সফলকাম ক্যাবিনেট মিশন দেশে ফিরে গেল।

ক্যাবিনেট মিশন চলে যাবার পর ক'দিন আর। আবার পুরনো সংশয় ঘৃণা এবং পারস্পরিক বিদ্বেষে আকাশ বিষাক্ত হয়ে উঠল। মুসলিম লীগ সিদ্ধান্ত নিল কনস্টিটিউয়েণ্ট অ্যাসেমব্লিতে যোগ দেবে না বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবে না। জিন্না ছেচল্লিশের ষোলই আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' ডাক দিলেন।

ছেচল্লিশের ষোলই আগস্ট ইতিহাসের এক অন্ধকার দিন। সারা দেশ জুড়ে আত্মঘাতী দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। কোথায় কলকাতা, কোথায় বিহার, কোথায় নোয়াখালি—সমস্ত ভারতবর্ষ রক্তের সমুদ্র হয়ে দুলতে লাগল। কে বলবে মাত্র ক'দিন আগে নৌ-বিদ্রোহ ঘটে গেছে, কে বলবে রসিদ আলী ডে কিংবা আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীদের মুক্তির জন্য জাতিধর্ম-নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ সেদিন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আন্দোলন করেছিল।

খবর কাগজ খুললে এখন শুধু আগুন-হত্যা-ধর্ষণ। ভারতবর্ষ যেন এক দুঃস্বপ্নের ঘোরে বর্বর যুগের কোন আদিম উষায় ফিরে গেছে।

আসমুদ্র হিমালয় একখানা আগুনের চাকা যেন ঘুরে চলেছে। এই ছোট্ট রাজদিয়াতেও তার আঁচ এসে লাগল।

মিলিটারি ব্যারাকে সাপ্লাই দেবার জন্য রজবালি শিকদার মন্তাজ মিঞার যে বাড়িটা ভাড়া নিয়ে গুদাম করেছিল, এখন সেটাই মুসলিম লীগের অফিস। তার থেকে খানিকটা এগিয়ে গেলে হাইস্কুলের গা ঘেঁষে কংগ্রেসের অফিস।

আজকাল রোজই হয় মুসলিম লীগ, না হয় কংগ্রেস রাজদিয়ায় মীটিং করছে। মীটিংয়ের পর দু-দলই মিছিল বার করে।

সবুজ পতাকা উড়িয়ে লীগের সমর্থকরা শ্লোগান দেয় :

'লড়কে লেঙ্গে—'

'পাকিস্তান।'

'কায়েদে আজম—'

'জিন্দাবাদ।'

কংগ্রেসের মীটিঙে মোতাহার হোসেন সাহেব আবেগপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা দেন 'আমরা হিন্দু মুসলমান যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি বাস করছি। বাস করবও। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এদেশকে কোনদিনই ভাগ করতে দেওয়া হবে না। এক বছর, দু'বছর, দশ বছর, হাজার বছর পরও এ দেশ একই থাকবে।'

সারা দেশ যখন অস্থির, উন্মাদ, তখন মোতাহার সাহেবের কথা কার কানে ঢুকবে? দেশজোড়া উন্মত্ততা জলবাঙলার এই স্নিগ্ধ শ্যামল ভুবনেও একদিন রক্তের সমুদ্রকে টেনে নিয়ে এল।

ঘটনাটা এইরকম।

সেদিন হেমনাথের সঙ্গে সুজনগঞ্জের হাটে গিয়েছিল বিনু। নৌকো থেকে নেমে ওপরে উঠতেই তারা শুনতে পেল, বিষহরিতলার ওধারে বিশাল মাঠখানায় মীটিং চলছে। হাটের বেশির ভাগ লোক ওখানে ভিড় জমিয়েছে।

কিছুটা আপনমনে হেমনাথ বললেন, 'আজকে আবার কিসের মীটিং?'

বিনু বলল, 'কি জানি—'

বেগুন ব্যাপারী গয়জদ্দি পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, হেমনাথ ডাকলেন।

গয়জদ্দি দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, 'কী ক'ন হ্যামকত্তা?'

'অমন দৌড়চ্ছিস কেন?'

'মীটিনে যাই—'

'কিসের মীটিং রে?'

'ঢাকা থনে বড় মাইনষেরা আইছে, তেনারা কী সগল কইব। যাই—' আর দাঁড়াল না গয়জদ্দি, আবার ছুটল।

একটু চুপ করে থেকে হেমনাথ বিনুকে বললেন, 'মীটিং-এ যাবি-নাকি দাদাভাই?'

'চল। ঢাকার লোকেরা কী বলছে, শুনেই আসি।'

॥ আটচল্লিশ ॥

তামাকহাটা, মরিচহাটা, আনাজহাটা পেছনে রেখে বড় বড় পা ফেলে বিষহরিতলার কাছে এসে পড়ল বিনুরা।

আশ্চর্য, লারমোর চেয়ার-টেবিল পেতে যথারীতি রুগী দেখতে বসেছেন। এক পাশে ওষুধের মস্ত বাক্স। আরেক পাশে সুজনগঞ্জ হাটের অনেকগুলো

অসুস্থ রুগ্ন মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। সামনের বিশাল মাঠ জুড়ে যে অত বড় একটা মীটিং চলছে, অসংখ্য হাটুরে মানুষ যে ভিড়জমিয়েছে—সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই লারমোরের। নিজের কাজের মধ্যে তিনি ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে এত অস্থিরতা, এত উত্তেজনা, কলকাতা-বিহার-নোয়া-খালি রক্তের নদী হয়ে যে দুলছে—লারমোরের দিকে তাকালে সে কথা কে বিশ্বাস করবে!

পেট টিপে টিপে একটা রুগীকে পরীক্ষা করছিলেন লারমোর। হেমনাথ ডাকলেন, 'লালমোহন—'

লারমোর মুখ তুললেন। খুশী গলায় বললেন, 'আরে হেম যে, কখন এলে হাটে?'

'এই সবে। নৌকো থেকে নেমে সোজা আসছি।'

'বসবে তো? না হাট-টাট সেরে আসবে?'

'বসবও না, হাটও সারব না—'

'তবে কী করবে?'

সামনের বিশাল জনতার দিকে আঙুল বাড়িয়ে হেমনাথ বললেন, 'ওখানে মীটিং হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।' লারমোর ঈষৎ মাথা হেলিয়ে বললেন, 'অনেকক্ষণ থেকেই দেখছি। শুনলাম ঢাকা থেকে কারা এসে বক্তৃতা দিচ্ছে।'

'আমিও তাই শুনলাম। আর শুনেই এদিকে এলাম—'

'মীটিংএ যাবে নাকি?'

'হ্যাঁ। তুমিও চল—'

'আমার যাবার সময় কোথায়? দেখছ না, ওরা বসে আছে। এখন উঠে গেলে আমাকে খেয়ে ফেলবে।' লারমোর তাঁর রুগীদের দেখিয়ে দিলেন।

হেমনাথ বললেন, 'তুমি তা হলে যাবে না?'

'না। ওসব কচকচি আমার খুব খারাপ লাগে। নিজের কাজ আর এইসব রোগা অসুস্থ মানুষ ছাড়া অন্য কিছু ভাল লাগে না। ঢাকার লোকেরা এসে কী-ই বা বলবে! তাতে এখানকার মানুষের উপকার কিছু হবে?'

হেমনাথ হাসতে লাগলেন, 'তার মানে এদের ছেড়ে কোথাও যেতে চাও না তুমি?'

'না।'

'রাজ-সিংহাসন দিলেও না?'

'না।'

'তবে তুমি এদের নিয়েই থাকো। আমরা মীটিংএ যাই—'

'যাও। মীটিং শুনে এখানে আসবে তো?'

'আসব।'

হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে লারমোর বললেন, 'হাট থেকে তুমি কখন বাড়ি ফিরবে হেম?'

হেমনাথ বললেন, 'বিকেল নাগাদ—'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

'সে কি, আজ এত তাড়াতাড়ি। তুমি তো হাট ভাঙবার পর সেই রাত্রিবেলা রাজদিয়া ফের।'

'আজ শরীরটা খুব ভাল লাগছে না।'

হেমনাথকে উদ্বিগ্ন দেখাল, 'কী হয়েছে?'

'তেমন কিছু না।' লারমোর হাসলেন, এই একটু জ্বর জ্বর মতন। আচ্ছা তোমরা মীটিংএ যাও। এরপর গেলে হয়তো কিছুই শুনতে পাবে না।'

শেষ পর্যন্ত সামনের ঐ বিশাল মাঠে, বিপুল জনতা যেখানে উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হেমনাথদের যাওয়া হল না। লারমোরের অস্থায়ী হাসপাতাল থেকে সবে দু' পা এগিয়েছেন, মীটিং ভেঙে গেল! তারপরেই জলোচ্ছ্বাসের দিশেহারা ঢলের মতন জনতা ছুটল হাটের দিকে।

মীটিং থেকে যারা ফিরছে তারা সবাই উত্তেজিত, উদ্‌ভ্রান্ত। সমানে তারা চিৎকার করছিল, 'মার শালাগো—'

'মার স্মুন্দির পুতেগো—'

মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল, 'লড়কে লেঙ্গে—'

'পাকিস্থান—'

হেমনাথ আর বিনু দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

আগে ঐ মাঠে অনেকবার হাটুরে মানুষদের ভিড় করতে দেখেছে বিনু। হরিন্দ যখন দেশ-দেশান্তরের খবর এনে ওখানে ঢেঁড়া দিত, একটা মানুষও আর হাটের চালার তলায় থাকত না। যুদ্ধের সময় সেনাদলে রিক্রুটমেণ্টের জন্য এস-ডি-ও কি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কিংবা মিলিটারি অফিসাররা যখন আসতেন তখনও মরিচহাটা তামাকহাটা নৌকোহাটা ফাঁকা করে সবাই ওখানে ছুটে যেত। কিন্তু এমন উত্তেজনা নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতন কেউ ফিরত না।

জনতা উন্মত্তের মতন ছুটে যাচ্ছে। ঢাকার লোকগুলো তাদের কী বলেছে কে জানে। বিনুরা বিমূঢ়ের মতন দাঁড়িয়ে থাকল।

কিছুক্ষণের ভেতর দেখা গেল, হাটের একটা চালাও আর আস্ত নেই। বাঁশের খুঁটিগুলো জনতার হাতে হাতে মারণাস্ত্র হয়ে ঘুরছে।

দেখতে দেখতে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল।-সমস্ত সুজনগঞ্জের হাট জুড়ে কয়েক হাজার লাঠি আকাশের দিকে উঠেই নেমে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে উঠছে চিৎকার, আর্তনাদ। লোকের পায়ে পায়ে হাটের ধুলো মাথার ওপর উঠে মেঘের মতন জমছে।

অনেকক্ষণ পর আপন মনে হেমনাথ বললেন, 'কী সর্বনাশ!'

বিনু খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। নিজের চোখে আগে আর কখনও দাঙ্গা ছাখে নি সে। ভীরু গলায় ডাকল, 'দাদু—'

'কী বলছিস?' অন্যমনস্কের মতন সাড়া দিলেন হেমনাথ।

'আমরা কেমন করে বাড়ি যাব?'

হেমনাথ বুঝিবা তার কথা শুনতে পেলেন না। বলতে লাগলেন, 'অন্য অন্য জায়গায় দাঙ্গা হয়েছে। কিন্তু এ পাপ তো এখানে ছিল না—'

বিনু কি বলতে যাচ্ছিল, পেছন থেকে লারমোরের গলা ভেসে এল, 'হেম—হেম—'

হেমনাথ ঘুরে দাঁড়ালেন; বিনুও ঘুরল। চোখাচোখি হতেই লারমোর বললেন, 'এখানে এস—'

হেমনাথরা লারমোরের কাছে চলে এলেন।

উদ্বিগ্ন স্বরে লারমোর বললেন, 'কাণ্ডটা দেখেছ?'

'হুঁ—' গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন হেমনাথ।

এই সময় হাটের দিক থেকে ছুটতে ছুটতে মজিদ মিঞা এসে হাজির। তাকে পাগলের মতন দেখাচ্ছে। অস্থির গলায় সে বলতে লাগল, 'এ কী হইল ঠাউরভাই, এ কী হইল?'

হেমনাথ কী বলবেন, ঠিক করে উঠতে পারলেন না। অত্যন্ত বিচলিত আর চঞ্চল হয়ে উঠেছেন তিনি।

মজিদ মিঞা আবার বলল, 'একটা কিছু বিহিত করেন ঠাউরভাই। আপনের চৌখের সামনে এমুন খাওয়াখাওয়ি মারামারি হইব। কোন্ খানে কার দোষে দাঙ্গা হইছে হেয়াতে আমাগো কী? আমরা চিরকাল যেমুন একলগে আছি, তেমুনই থাকতে চাই। আপনে অগো থামান ঠাউরভাই।

সারা জীবন যা দেখি নাই, এই শ্যাষ বয়সে হেই খুনাখুনি দেখতে হইব ? তার থনে আমার মরণ ভাল ।’

হেমনাথ কিছু বলবার আগেই লারমোর চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘এ দাঙ্গা চলতে পারে না। যেভাবেই হোক থামাতে হবে। চল—’ বলেই হাটের মাঝখানে যেখানে তাণ্ডব চলছে, সেদিকে ছুটলেন।

মজিদ মিঞা, বিনু এবং হেমনাথও লারমোরের পিছু পিছু ছুটলেন। সব চাইতে প্রথমে পড়ে আনাজহাটা। সেখানে এসে দেখা গেল অনেকগুলো লোকের হাত-পা ভেঙে গেছে; মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। রাশি রাশি ঝিঙে-পটল-আলু-বেগুন চারধারে ছত্রখান হয়ে আছে। আহত লোকগুলো যন্ত্রণায় ক্ষতস্থান চেপে ধরে কাঁদছিল, কঁকাচ্ছিল, গোঙানির মতন শব্দ করে চিৎকার করছিল।

ডানদিকে মরিচহাটা, বাঁ ধারে মাছের বাজার। দু জায়গাতেই সমানে লাঠি চলছে আর বৃষ্টির ধারার মতন ঢিল পড়ছে। সেই সঙ্গে রুদ্ধ হিংস্র মারমুখী জনতা চেঁচাচ্ছিল :

‘মার শালারে—’

‘মার বউয়ার ভাইরে—’

‘মাইরা মাইরা সুমুন্দির পুতেরে শ্যাষ কইরা দে—’

‘লড়কে লেগে—’

‘পাকিস্তান—’

‘কালী মাইকী জয়—’

হঠাৎ গলায় সবটুকু শক্তি ঢেলে সুজনগঞ্জের হাটটাকে চমকে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন লারমোর, ‘থামা, থামা—তোরা মারামারি থামা—’

মজিদ মিঞাও চেঁচাচ্ছিল, ‘আহাম্মকের ছাওরা, এমুন খুনাখুনি করিস না তরা। আল্লার কিরা।’

চিৎকার করতে করতে একবার মরিচহাটা, একবার মাছের বাজার, একবার গো-হাটার দিকে ছুটছিলেন লারমোর। তাঁর পেছনে ছিল বিনুরা।

উন্মত্ত জনতা মজিদ মিঞা বা লারমোরের কথা কানেই তুলছিল না। হিংস্র এক ডাকিনী তাদের যেন মন্ত্র পড়ে ছেড়ে দিয়েছে। সমানে তারা লাঠি চালিয়ে যাচ্ছিল, ঝাঁক ঝাঁক ঢিল ছুঁড়ছিল। তাদের চোখে হত্যা যেন ঝিলিক দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

ছোটাছুটি করতে করতে তামাকহাটায় এসে হঠাৎ লারমোরের চোখে

পড়ল, একটা রুগ্ন লোকের মাথার ওপর তিন-চারটে লাঠি উদ্যত হয়ে আছে পলক পড়বার আগেই নেমে আসবে।

লারমোর লাফ দিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, 'মারিস না ওকে, মারিস না। ঐ লাঠির একটা বাড়ি পড়লে ও মরে যাবে।'

যারা মারবার জন্য লাঠি তুলেছিল তাদের ভেতর থেকে একজন খ্যাস খ্যাস করে হেসে উঠল, 'ভালই তো, বেশী কষ্ট করতে হইব না। এক বাড়িতে, যমের দুয়ারে পাঠাইয়া দিতে পারুম। তুমি যাও সাহেব—'

'না ; কিছুতেই না—' মা-পাখি যেমন করে তার বাচ্চাকে ডানা দিয়ে ঘিরে রাখে তেমনি করে দু' হাত দিয়ে রুগ্ন লোকটাকে আগলে রাখলেন লারমোর।

সেই লোকটা আবার বলল, 'সর সাহেব ; শালারে নিকাশ কইরা দেই—'

'না। ক'দিন আগে কালাজ্বরে ও মরতে বসেছিল, কত কষ্ট করে ওকে মরার হাত থেকে ফিরিয়েছি। আমার চোখের সামনে ওকে কিছুতেই মারতে দেব না।'

'ভাল চাও তো চইলা যাও সাহেব—'

'না।' লারমোর অনড় হয়ে রইলেন ; তাঁর চোখে কঠিন প্রতিজ্ঞা জ্বলছে যেন।

সেই লোকটা উগ্র গলায় আবার বলল, 'শালা বিদ্যাশী, এইখানে আইসা মাদ্‌বরী (মাতব্বরী) ফলাও—'

লারমোর চমকে উঠলেন, 'আমি বিদেশী !'

'নিয্যস।'

কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না লারমোর। আবার প্রতিধ্বনি করলেন, 'আমি বিদেশী, আমি বিদেশী—'

'তয় কি তুমি এই দ্যাশের নাতিন জামাই ? নিজের গায়ের রংখান দেখছ ?'

সেই লোকটার সঙ্গীগুলো অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। তাদের একজন বলল, 'প্যাচাল না পাইড়া সইরা যাও সাহেব—'

স্থির শিখার মত দাঁড়িয়ে ছিলেন লারমোর। বললেন, 'না—'

'তয় মর শালা—'

কেউ কিছু বুঝবার আগেই একটা লাঠি এসে পড়ল লারমোরের মাথায়। চড়াত করে শব্দ হল একটা। তারপরেই রক্তের ফোয়ারা ছুটল। মাথায় হাত দিয়ে পলকে লুটিয়ে পড়লেন লারমোর।

বিনু চিৎকার করে উঠল, 'লালমোহন দাদুকে মেরে ফেলল, মেরে ফেলল—'

মজিদ মিঞা কপালে চাপড় মারতে মারতে আর্ত আকুল গলায় বলতে লাগল, 'হায়, হায়, এই কি সব্বনাশ করলি ডাকাইতরা !'

হেমনাথ কিছুই বললেন না। ধীরে ধীরে বসে লারমোরের রোগা দুর্বল দেহখানা কোলে তুলে নিলেন। হেমনাথের শরীর আশ্চর্য কঠিন ; শুধু ঠোঁট দুটো থরথর করছে।

এই সময় ওদিক থেকে কারা যেন সন্ত্রস্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'পুলিস আইছে, পুলিস আইছে—'

নিমেষে সামনের সেই হিংস্র, উত্তেজিত, হত্যাকারী লোকগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু তারাই না, যারা দাঙ্গা করছিল, সুজনগঞ্জ হাটের সীমানার ভেতর তাদের কারোকেই আর দেখা গেল না।

আঘাত লাগার ফলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন লারমোর। দিনের আলো থাকতে থাকতেই অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে নিয়ে হেমনাথরা রাজদিয়ায় ফিরলেন ; একেবারে সোজা গীর্জায় নিয়ে তুললেন।

লারমোর আজকের দাঙ্গায় শিকার হয়েছেন, এই খবরটা কেমন করে যেন দিগ্বিদিকে রটে গিয়েছিল। রাজদিয়ার কুমোরপাড়া, কামারপাড়া, যুগীপাড়া, মুধাপাড়া, নিকারীপাড়া, সর্দারপাড়া—শুধু কি রাজদিয়া, চারপাশের গ্রামগঞ্জগুলো শূন্য করে কত মানুষ যে লারমোরকে দেখতে এল! বিষণ্ণ করুণ মুখে তারা আজকের এই নিদারুণ ঘটনাকে ধিক্কার দিতে লাগল, 'আ রে সব্বনাইশারা, তরা মারণের লেইগা মানুষ বিচরাইয়া (খুঁজে) পালি না? লালমোহন সাহেব যে আমাগো বাপের লাখান ভালবাসছে। হ্যায় যে আমাগো বাপ—'

কাদের আর বিধবা পরানের মা (দু' জনেই লারমোরের আশ্রিত) অবোধ শিশুর মতন কাঁদছে। কাঁদছে আর ভাঙা গলায় বলছে, 'সাহেবের যদি ভালমন্দ কিছু হয় আমরা কই যামু? আমাগো কী হইব? কে দেখব আমাগো?' চোখের জলে তাদের বুক ভেসে যাচ্ছিল।

খবর পেয়ে স্নেহলতাও ছুটে এসেছেন। শিবানী আসতে চেয়েছিলেন ; বাড়ি একেবারে ফাঁকা থাকবে বলে আসেন নি। এসেই লারমোরের শিয়রের কাছে বিষণ্ণ প্রতিমার মতন বসেছেন স্নেহলতা।

এদিকে এই বিপদের সময় হেমনাথ কিন্তু একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েন

নি। রাজদিয়ায় ফিরেই ডাক্তার আনতে মজিদ মিঞাকে কমলাঘাট পাঠিয়ে দিয়েছেন। কমলাঘাটের বন্দরে বড় ডাক্তার আছে।

সন্ধ্যের পর ডাক্তার নিয়ে তখনও মজিদ মিঞা ফেরে নি, লারমোরের জ্ঞান ফিরল। চোখ মেলে ক্ষীণ দুর্বল স্বরে তিনি ডাকতে লাগলেন, 'হেম—হেম কোথায় ?'

হেমনাথ লারমোরের পায়ের দিকে বসেছিলেন। তাড়াতাড়ি উঠে এসে বললেন, 'এই যে ভাই, এই তো আমি–

'আমি আর বাঁচব না—'

'ছি, ও-কথা বলতে নেই। তোমার অনেক কাজ; বাঁচাতে তোমাকে হবেই।' হেমনাথের কণ্ঠস্বর অসহ্য আবেগে কাঁপছিল।

লারমোর বিচিত্র হাসলেন, তারপর অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন, 'বাঁচতে আমি চাই না হেম, চাই না। ওরা আমাকে বিদেশী বলল! আমি বিদেশী, আমি বিদেশী!'

হেমনাথ বললেন, 'কে বললে তুমি বিদেশী ?'

তার কথা বোধহয় শুনতে পেলেন না লারমোর। আপন মনে বলে যেতে লাগলেন, 'কবে এ দেশে এসেছিলাম মনেও পড়ে না। জীবনের সবটুকুই এখানে কাটিয়ে দিলাম। এখানকার অন্ন-বস্ত্র-ভাষা সমস্তই মাথায় তুলে নিয়েছি। এখানকার মানুষকে বুকে জায়গা দিয়েছি। তবু আমি বিদেশী, আমি বিদেশী—'

হেমনাথ তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলেন, 'কেন তুমি কষ্ট পাচ্ছ লালমোহন ? একটা অমানুষ উন্মাদ কী বলেছে, মনে করে রেখ না। তুমি যদি বিদেশীই হবে এত লোক তোমাকে দেখতে এসেছে! ঐ দিকে তাকাও—' লারমোরের খবর পেয়ে যারা ছুটে এসেছিল উদ্বিগ্ন মুখে এখনও তারা গীর্জায় ভিড় করে আছে। হেমনাথ তাদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলেন।

লারমোরের দুরন্ত অভিমান একটুও শান্ত হল না। ক্লান্ত স্বরে তিনি বলতে লাগলেন, 'একজন বললেও তো বিদেশী বলেছে—' বলতে বলতে শিশুর মতন ফুঁপিয়ে উঠলেন। তাঁর চোখের কোল বেয়ে মুক্তোর দানার মতন ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরতে লাগল।

বিনু কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। লারমোরের দিকে তাকিয়ে অপার বিস্ময়ে তার মন ভরে যাচ্ছিল। এমনিতে এই মানুষটি ধীর, স্থির, সংযত। জগতে ঈশ্বরের দূত হয়েই তিনি যেন নেমে এসেছেন। কিন্তু 'বিদেশী', এই একটি মাত্র কথায় কি

নিদারুণ অস্থিরই না হয়ে উঠেছেন! মানুষের হৃদয়ে কোথায় যে দুর্বল আবেগ প্রোথিত হয়ে থাকে।

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'কেঁদো না—শান্ত হও—'

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর খুব ক্লান্ত স্বরে লারমোর বললেন, 'আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে হেম—'

'বেশ তো, ঘুমোও না—'

'একটা কাজ করবে হেম?'

'কী?'

'হল ঘরে যেশাসের পায়ের কাছে আমাকে নিয়ে যাবে? ওখানে গেলে আমি একটু শান্তি পেতাম।'

ধরাধরি করে হেমনাথরা খাটসুদ্ধু লারমোরকে হল ঘরে নিয়ে এলেন। পুব দিকের দেয়ালে যেখানে জ্যোতির্ময় মানবপুত্রের বিশাল ছবিটা টাঙানো রয়েছে, তার তলায় তাঁকে রাখলেন।

লারমোর বললেন, 'এবার একটু ঘুমোই হেম।' ধীরে ধীরে তাঁর চোখ এবং কণ্ঠস্বর বুজে এল।

অনেক রাত্রে কমলাঘাট থেকে ডাক্তার নিয়ে ফিরল মজিদ মিঞা। বড় ডাক্তার লারমোরের গায়ে হাত দিয়েই চমকে উঠলেন। ভাল করে পরীক্ষা করে গম্ভীর গলায় জানালেন, লারমোরের চোখে চিরনিদ্রা নেমে এসেছে। মানুষের সাধ্য নেই এ ঘুম ভাঙায়।

একধারে দাঁড়িয়ে বিনু দেখল, ক্রুশবিদ্ধ যীশুমূর্তির তলায় এ-কালের লাঞ্ছিত রক্তাক্ত অপমানিত আরেক ক্রাইষ্ট।

খুব অল্পদিনের ভেতর পর পর দুটো মৃত্যু দেখল বিনু। সুরমার এবং লারমোরের। সুরমার মৃত্যু বিনুর ব্যক্তিগত ক্ষতি। কিন্তু এ মানুষটি কোথা থেকে এসে জলবাঙলার প্রতিটি বৃক্ষলতা, পশু-পাখি, তৃণদল এবং মানুষের হৃদয়ে নিজের সিংহাসন পেতেছিলেন। সমস্ত চরাচর শূন্য করে তিনি আজ চলে গেলেন।

গীর্জার একধারে লারমোরের সমাধি দেওয়া হয়েছে। সেই জায়গাটায় একটা বেদী তৈরি করে দিয়েছেন হেমনাথ; তার গায়ে শ্বেত পাথরের ফলক রয়েছে। তাতে লেখা:

'ডেভিড লারমোর

জন্ম—১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ, ১৯শে মে।

মহাপ্রয়াণ—১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ, ২২শে ডিসেম্বর।

মানবতার প্রতীক, আর্তজনের বন্ধু মহাপ্রাণ এই মানুষটি এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।'

॥ উনপঞ্চাশ ॥

লারমোরের মৃত্যুর পর আশা করা গিয়েছিল, মানুষের মনে শুভবোধ জাগবে। কিন্তু কিছুই হল না। উত্তেজনা, অশান্তি, আতঙ্ক বেড়েই চলল। প্রায় রোজই খবর আসে মুসলিম লীগ এ-গ্রামে ও-গ্রামে এ-গঞ্জে সে-গঞ্জে এবং নদীর চর-গুলোতে মীটিং করে বেড়াচ্ছে। চারদিকে দাঙ্গাও চলছে। হত্যা, আর্তনাদ, হল্লা, আগুন ছাপিয়ে বহুকণ্ঠের চিৎকার শোনা যায়, 'লড়কে লেঙ্গে—'

'পাকিস্তান—'

পাল্টা উত্তরও ভেসে আসে, 'বন্দে মাতরম্—'

তারপর ক'মাস আর। ভারতবর্ষের ভাগ্য একদিন স্থির হয়ে গেল। কত কালের সুপ্রাচীন এই দেশ। সাতচল্লিশের পনেরই আগস্ট তাকে কেটে দু'টুকরো করে ফেলা হবে। এক ভাগ হবে পাকিস্তান। আরেক ভাগ আবহমান কালের পুরনো নামটাই ধরে থাকবে—ভারত।

খবর পেয়ে মোতাহার হোসেন সাহেব ছুটে এলেন। রাস্তা থেকে বাগানে পা দিয়েই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন, 'হেমদাদা—হেমদাদা—'

হেমনাথ বাড়িতেই ছিলেন। দেশভাগ নিয়ে বিনুর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। চমকে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কে, মোতাহার?'

'হ্যা।'

'আয়, আয়—'

মোতাহার সাহেব ঘরে এসে তক্তপোষে বসলেন। তাঁকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছে। বললেন, 'খবর শুনেছেন?'

কোন্ খবরের কথা তিনি বলছেন হেমনাথ বুঝতে পারলেন। বললেন, 'শুনেছি। তোর ছাত্রের সঙ্গে তা-নিয়েই আলোচনা করছিলাম।'

মোতাহার সাহেব বললেন, 'শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ আর জিন্নারই তা হলে জয় হল।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন হেমনাথ, 'তাই তো দেখছি।'

'কিন্তু—'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন হেমনাথ, 'কী ?'

প্রথমটা উত্তর দিলেন না মোতাহার সাহেব; অন্যমনস্কের মতন জানলার বাইরে ধু-ধু ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে বলতে লাগলেন, 'দেশটা দু'টুকরো হবে বলেই কি এত দিন ধরে এত মানুষ সংগ্রাম করল, এত মানুষ জেল খাটল, হাজার হাজার সোনার ছেলে প্রাণ দিল! না হেমদা, এ আমরা চাই নি। এ আমরা চাই নি।'

মোতাহার সাহেবের উত্তেজনা অস্থিরতা ক্রমশ বাড়তেই লাগল। তিনি বলতে লাগলেন, 'কোন্ থিওরীর ওপর দেশটা ভাগ হতে চলেছে, ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যায়।'

বুঝতে না পেরে হেমনাথ শুধোলেন, 'কোন্ থিওরীর কথা বলছিস মোতাহার ?'

'জিন্নার টু নেশন থিওরী।' প্রবল আক্ষেপের গলায় মোতাহার সাহেব বলতে লাগলেন, 'সারা জীবন একতার কথা বলে শেষে কিনা দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিষ গিলতে হল।'

হেমনাথ চুপ।

মোতাহার সাহেব বলতে লাগলেন, 'দেশভাগই যদি মেনে নেওয়া হল, আগে মানলেই হত। এত রক্তারক্তি, এত দাঙ্গা, এত এত হত্যা-ধর্ষণ-আগুন— কোনটাই ঘটত না।'

'তা ঠিক।'

'নেতারা খেয়ালের বশে যা করলেন তার পরিণাম ভাল হবে না। দেশ-ভাগের পেছনে কী আছে লক্ষ্য করেছেন হেমদাদা ?'

'কী আছে ?'

'ঘৃণা বিদ্বেষ আর শত্রুতা।'

আস্তে করে মাথা নাড়লেন হেমনাথ।

মোতাহার সাহেব বলতে লাগলেন, 'দেশ যদি সত্যি সত্যিই ভাগ হয়, হিন্দু-মুসলমানকে চিরকাল ঐ তিনটে জিনিসের জের টেনে চলতে হবে। আর সব

চাইতে ক্ষতি হবে বাঙালী জাতির। এ জাতি আর কোন দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর মোতাহার সাহেবই আবার শুরু করলেন, 'আপনার কী মনে হয় হেমদাদা ?'

'কি ব্যাপারে ?'

'দেশভাগ কি শেষ পর্যন্ত হবে ?'

'তার মানে—' হেমনাথ অবাক, 'সব স্থির হয়ে গেছে। একটা সেটেলড্ ফ্যাক্টকে আনসেটেল্ড করা যাবে কী করে ?'

হেমনাথের কথা বুঝি বা শুনতে পেলেন না মোতাহার সাহেব। তাঁর বুকের ভেতর এই মুহূর্তে কোন্ হাওয়া বইছে, কে জানে। দূরমনস্কের মতন তিনি বললেন, 'আমার কি মনে হয় জানেন হেমদাদা ?'

'কী ?'

'পার্টিসান আটকে যাবে।'

'কে আটকাবে ?'

'দেশের মানুষ। নেতাদের এই হঠকারিতা তারা কিছুতেই কোনমতেই মেনে নেবে না। আপনি দেখে নেবেন।' মোতাহার সাহেবের চোখ জ্বলতে লাগল। হাত মুষ্টিবদ্ধ ; চোয়াল কঠিন।

এমনিতেই মোতাহার সাহেব মানুষটি বেশ গম্ভীর। তার চোখ এত উজ্জ্বল আর তীক্ষ্ণ যে, সেদিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। দেখলেই ভয় লাগে, আবার ভক্তিও হয়।

কিন্তু খুব কাছাকাছি এলে টের পাওয়া যায় গাম্ভীর্যটা তাঁর ছদ্মবেশ। কঠিন মাটির ঠিক তলাতেই সুশীতল জল রয়েছে, সামান্য খুঁড়লেই ফিনকি দিয়ে ফোয়ারা বেরিয়ে আসবে।

বাইরে কঠিন ভেতরে সরস, এই মানুষটি আজ কিন্তু অস্থির, উদ্‌ভ্রান্ত, চঞ্চল। মাটি খুঁড়লে আজ আর ফোয়ারা বেরুবে না ; পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আগুন হয়ে বেরিয়ে আসবে।

শেষ পর্যন্ত দেশজোড়া রক্তাক্ত সূতিকাগারে সেই দিনটি ভূমিষ্ঠ হল। পনেরই আগস্ট, উনিশ শ' সাতচল্লিশ। খণ্ডিত দেশের ওপর দিয়ে স্বাধীনতার রথ এল ঘর্ঘরিয়ে।

মোতাহার সাহেব দেশবাসীর ওপর ভরসা রেখেছিলেন ; তারা দেশভাগ বন্ধ করবে। জননীর মতন গরীয়সী এই জন্মভূমির দেহে ছুরি বসাতে দেবে না। কিন্তু সব বৃথা, সব বৃথা। হায় রে দুরাশা !

এই মুহূর্তে দেশের সব মানুষই প্রায় অন্ধ, আচ্ছন্ন। দু হাত দূরের জিনিস দেখবার মতন দৃষ্টিটুকু পর্যন্ত তাদের নেই। জননীদেহ কেটে-কুটে ভাগাভাগি করে নেওয়া ছাড়া তারা আর কিছু ভাবতেই পারছে না।

মোতাহার সাহেবের মতন যে দু চারজন আছেন, যাঁদের দৃষ্টি আপন সময়ের সমস্ত অন্ধকার, সংশয় এবং কুয়াশা সরিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছয়, তারাই শুধু অসীম দুঃখে দুরন্ত অভিমানে মূক হয়ে গেছেন। এ তাঁরা চান নি।

॥ পঞ্চাশ ॥

পনেরই আগস্ট ভোর হবার কয়েক ঘণ্টা আগে 'পাকিস্তান ডে' ঘোষণা করা হয়েছিল।

চোদ্দই আগস্টের মাঝরাত থেকেই রাজদিয়ার চোখে আর ঘুম নেই। ঢাকা থেকে কত ব্যাণ্ড পার্টি যে আনা হয়েছে ! এই নগণ্য শহরের সব রাস্তা ঘুরে ঘুরে তারা বাজিয়ে চলেছে।

রাজদিয়ার চোখ থেকে ঘুম তো গেছেই ; ঘরেও আর কেউ নেই। বাজনার শব্দে সবাই সদরে বেরিয়ে এসেছে। ঝিনুক আর বিনুকে নিয়ে হেমনাথও বাগান পেরিয়ে ক'বার যে রাস্তায় এলেন তার হিসেব নেই।

এক সময় ভোর হল।

এবার ব্যাণ্ড পার্টির সঙ্গে বেরুল মিছিল। মিছিল কি এক-আধটা ? ধবধবে পোশাক-পরা ছোট ছোট শিশুদের মিছিল, কিশোর-কিশোরীদের মিছিল, যুবক-যুবতীদের মিছিল। প্রতিটি মিছিল চাঁদ-তারা-আঁকা সবুজ পতাকা আর নেতাদের ছবি দিয়ে সুসজ্জিত।

মিছিলগুলো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ধ্বনি দিচ্ছে :

'কায়েদে আজম—'

'জিন্দাবাদ।'

'পাকিস্তান—'

'জিন্দাবাদ—'

যেভাবে আর যে মূল্যেই হোক, স্বাধীনতা এসেছে। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরীদের কণ্ঠস্বর আর ব্যাণ্ড-পার্টির বাজনা আকাশে-বাতাসে বিচিত্র উন্মাদনা ছড়িয়ে দিচ্ছিল। হেমনাথ আর বাড়ি বসে থাকতে পারলেন না। বিনুকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

মিছিলের পর মিছিল পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে এবং শোভাযাত্রা দেখতে দেখতে এক সময় সারি সারি মিষ্টির দোকান, স্টীমার-ঘাটা, বরফকল পেরিয়ে তাঁরা স্কুলবাড়ির কাছে চলে এলেন।

মিষ্টির দোকান, স্টিমারঘাটা, বরফ কল কিংবা রাজদিয়ার যত বাড়িঘর—সবার মাথায় সবুজ পতাকা উড়ছে। স্টিমারঘাটটাকে ফুল-পাতা আর রঙীন কাগজ দিয়ে চমৎকার করে সাজানো হয়েছে। তা ছাড়া রাস্তায় কুড়ি পঁচিশ হাত দূরে দূরে একটা করে তোরণ চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে উঁচু উঁচু মঞ্চ বানিয়ে নহবত বসানো হয়েছে। সেখানে সানাই বাজছে।

আজকের এই দিনটা যে আর সব দিনের চাইতে আলাদা, রাস্তায় পা দিয়েই তা টের পাওয়া যায়। এই রাজদিয়ার ওপর দিয়ে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ দিন এসেছে, গেছে। কিন্তু এমন দিন আর কখনও আসেনি। উদাসীনভাবে অন্যমনস্কের মতন একে যেন হাত পেতে নেওয়া যায় না, বিপুল সমারোহে একে বরণ করে নিতে হয়।

যাই হোক, স্কুলবাড়ির কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ কে যেন ডেকে উঠল, 'হেমদাদা—হেমদাদা—'

বিনুরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এদিক-ওদিক তাকাতেই ডানধারে তারা মোতাহার হোসেন সাহেবকে দেখতে পেল।

স্কুলবাড়ির ঠিক গায়েই কংগ্রেস অফিস। তার দরজায় মোতাহার সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। চোখাচোখি হতেই তিনি হাতছানি দিলেন। মোতাহার সাহেব এবং তাঁর দু-একজন সঙ্গী ছাড়া কংগ্রেস অফিস এখন একেবারে ফাঁকা।

বিনুরা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল।

মোতাহার সাহেব বললেন, 'আজ এত সকালে বেরিয়ে পড়েছেন হেমদাদা ?'

হেমনাথ হাসলেন, 'ব্যাণ্ড পার্টির আওয়াজে আর মিছিলের চিৎকারে ঘরে থাকা গেল না যে।

'আপনাকে যেন ভারি খুশী দেখাচ্ছে—'

উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে হেমনাথ বললেন, 'রাজদিয়ার সব লোক বেরিয়ে পড়েছে। আমি আর কি করে ঘরে বসে থাকি বল ?'

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ গলায় মোতাহার সাহেব বলতে লাগলেন, 'এত বড় একটা ট্র্যাজেডি ঘটে গেল, যার পরিণাম কী হবে কেউ বলতে পারে না। আর আপনি মিছিল দেখবার জন্যে, আনন্দ করবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছেন! আপনার কাছে এ কিন্তু আশা করিনি হেমদাদা—'

একটু চুপ করে থেকে হেমনাথ বললেন, 'যা হবার তা তো হয়েই গেছে। তার জন্যে মনে দুঃখ রেখে কী লাভ। হয়ত এতে ভালই হবে। দেশ জুড়ে যে রক্তারক্তি আর হত্যা চলছিল তা চিরদিনের মতন বন্ধ হয়ে যাবে। যা এসেছে তাকে প্রসন্ন মনেই গ্রহণ কর মোতাহার।'

মোতাহার সাহেব খুব একটা সান্ত্বনা পেয়েছেন, এমন মনে হল না। ক্ষোভ, বিষাদ, দুঃখ— সব একাকার হয়ে তাঁর মুখখানাকে মলিন করে রাখল।

বিনু অবাক হয়ে হেমনাথকে দেখছিল। আজই শুধু না, রাজদিয়ায় আসার পর থেকেই দাদুকে দেখছে সে। ভালমন্দ শুভাশুভ যাই সামনে এসে দাঁড়াক তাকে তিনি সানন্দে, পরম উদারতার সঙ্গে বুকে তুলে নিতে পারেন। তাঁর চরিত্রের মূলমন্ত্র এখানেই প্রোথিত।

হেমনাথ বললেন, 'এখন চলি রে মোতাহার—'

মোতাহার হোসেন উত্তর দিলেন না।

হেমনাথ আবার বললেন, 'আমাদের সঙ্গে তুই যাবি?'

নীরস স্বরে মোতাহার সাহেব জানালেন, যাবেন না।

আবার বড় রাস্তায় এসে পড়ল বিনুরা। পুবদিকে খানিকটা গেলেই সেটেলমেণ্ট অফিসের পাশে মুসলিম লীগের অফিস। লীগের অফিসটাকে আজ আর চেনাই যায় না। ফুলে-পাতায়, রঙীন কাগজে আর অসংখ্য সবুজ পতাকায় তার চেহারা বদলে গেছে। কত মানুষ যে সেখানে ভিড় জমিয়েছে লেখাজোখা নেই। লীগের অফিসটা ঘিরে এই মুহূর্তে মনোহর এক উৎসব চলছে।

হঠাৎ কংগ্রেস অফিসটার কথা মনে পড়ে গেল বিনুর। একটু আগেই সেখান থেকে তারা এসেছে। মুসলিম লীগের এই উৎসবমুখর জমকালো বাড়িটার তুলনায় তার দৃশ্য বড় করুণ এবং নিষ্প্রভ। অথচ ক'দিন আগেও কংগ্রেস অফিসেই ভিড় লেগে থাকত। রাতারাতি সব বদলে গেছে।

লীগ অফিসের কাছে আসতেই রজবালি শিকদার ছুটে এল। তার দেখাদেখি আরো অনেকে। ইদানীং রজবালি এ অঞ্চলে লীগের বড় নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসেই রজবালি হেমনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। সে বলল, 'আপনে আইছেন হ্যামকত্তা।' দেখেও সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

সহজ গলায় হেমনাথ বললেন, 'হ্যাঁ এলাম। পার্টিশানের পর এ দেশ যদি পাকিস্তান হয়ে থাকে, আমরা তা হলে পাকিস্তানী। এমন দিনে আমরা আসব না?'

অভিভূত স্বরে রজবালি শিকদার বলল, 'নিয্যস নিয্যস—'

কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে কেউগা আছস, গুলাপ (গোলাপ) জল লইয়া আয়, হ্যামকত্তারে দে—'

একজন ছুটে গিয়ে রুপোর পিচকিরিতে গোলাপ জল এনে বিনুদের মাথায় ছিটিয়ে দিল। শুধু বিনুরাই নয়, হিন্দু-মুসলমান যারাই লীগ অফিসের কাছে আসছে তাদেরই বুকে জড়িয়ে ধরা হচ্ছে, গোলাপ জলে সিক্ত করে দেওয়া হচ্ছে।

লীগ অফিসের একজন বলল, 'পাকিস্তান হইয়া গেছে। যা চাইছিলাম তা পাইছি। আইজ থনে আপনাগো লগে আমাগো কাইজা (ঝগড়া) বন্ধ।'

হেমনাথ হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার সঙ্গে কিন্তু কোনকালেই কারো ঝগড়া নেই।'

তাড়াতাড়ি জিভ কেটে লোকটা বলল, 'আপনের কথা কই না হ্যামকত্তা—'

'তবে?'

'হিন্দুগো কথা কই।'

'আমি বুঝি হিন্দু না?'

রজবালি বলল, 'আপনের লগে কার কথা। আপনে হিন্দুও না, মুসলমানও না। আপনে সগলের হ্যামকত্তা—' তার কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপতে লাগল।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর হেমনাথ বললেন, 'এখন যাই রে রজবালি।'

'অহনই যাইবেন?'

সূর্য উঠে গিয়েছিল। সকালের নরম সোনালী রোদ নদীর ঢেউয়ে টলমল করে চলেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে শঙ্খচিল উড়ছিল। মাসটা যদিও শ্রাবণ, আজকের আকাশ আশ্চর্য উজ্জ্বল, পালিশ-করা নীল আয়নার মতন তার গা থেকে দীপ্তি ঠিকরে বেরুচ্ছে। আর আছে ভারহীন ভবঘুরে মেঘ। উল্টোপাল্টা পুবে বাতাস তাদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে একবার এদিকে, আবার ওদিকে নিয়ে যাচ্ছে।

হেমনাথ বললেন, 'সেই কখন বেরিয়েছি; কত বেলা হয়ে গেল!'

রজবালি বলল, 'এমন দিনে হুদা মুখে (শুধু মুখে) যাইতে পারবেন না, আইজের দিনে এট্টু মেঠাই মুখে দিয়া যাইবেন।'

'এখন মিষ্টিটিষ্টি খেতে পারব না বাপু।'

'তয় বাইন্ধা দেই, বাড়িত্ নিয়া যাইবেন।'

হেমনাথ হাসতে হাসতে বললেন, 'ছাড়বি না যখন, তখন দে। বাড়িই নিয়ে যাই।'

দেখা গেল, হেমনাথদেরই শুধু না, যারাই লীগ অফিসের কাছে আসছে মিষ্টিমুখ না করে কেউ ছাড়া পাচ্ছে না।

রজবালি নিজের হাতে মিষ্টির একটা হাঁড়ি এনে হেমনাথকে দিল। তারপর বলল, 'বিকালবেলা কোর্টপাড়ার মাঠে আইসেন।'

রাজদিয়ায় ফৌজদারি আর দেওয়ানী আদালত দুটো পাশাপাশি। তার সামনে মস্ত মাঠ। হেমনাথ শুধোলেন, 'সেখানে কী?'

'মীটিন্ হইব। ঢাকার থনে বড় মাইনষেরা আইসা বক্তিতা (বক্তৃতা) করব। আইসেন কিলাম।'

'আসব।'

বাড়ি আসতেই স্নেহলতা জানালেন, মীরপাড়া-মৃধাপাড়া-সর্দারপাড়া রাজদিয়ায় যত মুসলমান বাড়ি আছে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সব জায়গা থেকে মিষ্টি পাঠিয়েছে।

বিকেলবেলা আদালত পাড়ার মাঠে এসে দেখা গেল, লোকে লোকারণ্য। রাজদিয়ারই শুধু না, চারদিকের গ্রামগঞ্জ থেকে মানুষ এসে ভেঙে পড়েছে।

রজবালি কোথায় ছিল, ছুটে এল। যেখানে শহরের গণ্যমান্য শ্রদ্ধেয় মানুষেরা বসে আছেন, তাঁদের পাশে দুটো চেয়ারে হেমনাথ আর বিনুকে নিয়ে বসাল।

ঢাকা থেকে নেতারা এসেছিলেন। তাঁরা পাকিস্তান দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। তারপর স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কিছু বলতে অনুরোধ করা হল।

যদিও মুসলিম লীগ এই সভার আয়োজন করেছে, তবু হঠাৎ রজবালি শিকদার বক্তা হিসেবে হেমনাথের নাম প্রস্তাব করে বসল। অগত্যা হেমনাথকে পাকিস্তান সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে হল।

সভা শেষ হতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। তারপর শুরু হল আতসবাজির খেলা। কত রকমের যে বাজি আনা হয়েছে, হিসেব নেই। কোনটা আকাশে গিয়ে আলোর ময়ূর হয়ে যাচ্ছে, কোনটা চিল, কোনটা বাঘ, কোনটা আবার সিংহ। একেকটা হাউই উড়ে গিয়ে আগুনের ফুলকি দিয়ে লিখে দিচ্ছে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' কিংবা 'কায়েদে আজম, জিন্দাবাদ'। তলায় হাজার কণ্ঠে উল্লসিত জয়ধ্বনি উঠছে:

'পাকিস্তান—'

'জিন্দাবাদ।'

'কায়েদে আজম—'

'জিন্দাবাদ।'

বাজি পোড়ানো দেখে হেমনাথরা যখন বাড়ি ফিরলেন, মাঝ রাত পার হয়ে গেছে।

॥ একান্ন ॥

সাতচল্লিশে দেশভাগ হল। তারপর দেখতে দেখতে আরো তিনটে বছর কেটে গেল।

এর মধ্যে বি.-এ. পাস করেছে বিনু। ঝিনুক ম্যাট্রিক পাস করে রাজদিয়া কলেজে ভর্তি হয়ে গেছে।

ওদিকে যুদ্ধের সময় ঝোঁকের বশে সেই যে অবনীমোহন কন্‌ট্রাক্টরি নিয়ে আসাম চলে গিয়েছিলেন, সেখানেও বেশীদিন থাকেন নি। যুদ্ধ থামবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শখ মিটে গিয়েছিল। কন্‌ট্রাক্টরি ছেড়েছুড়ে অবনীমোহন কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন, সেখানে বড় চাকরি নিয়েছেন।

কলকাতায় গিয়েই বিনুকে পাঠিয়ে দেবার জন্য হেমনাথকে চিঠি দিয়েছিলেন অবনীমোহন। বিনু যায় নি। তারপর ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় কিংবা দেশভাগের সময়ও যাবার কথা লিখেছিলেন। তখনও বিনু যায় নি। দেশভাগের সময় অবশ্য জমিজমা বিক্রি করে হেমনাথকেও চলে যেতে লিখেছিলেন অবনীমোহন। সুধা-সুনীতি কলকাতাতেই আছে। তারাও ঐ একই কথা লিখত। এখনও নিয়মিত লিখে যাচ্ছে।

পাকিস্তান দিবসকে ঘিরে রাজদিয়ায় যে উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল ভাটার টানের মতন ধীরে ধীরে তা স্তিমিত হয়ে গেছে। তার জীবন আবার পুরনো তারে ঢিমে তালে বাজতে শুরু করেছে।

তিন বছর আগের মতনই চৈত্র-বৈশাখের রোদে মাঠ ফেটে চৌচির হয়েছে, দিগন্তে আগুনের হল্কা নেচে নেচে গেছে। গ্রীষ্মের পর শ্যামল বেশে এসেছে

বর্ষা। মাঠ ভাসিয়ে, ধানখেত, পাটখেত ডুবিয়ে চারদিকে একাকার করে দিয়েছে। তারপর আকাশে-মাটিতে পরিচিত ছবি এঁকে একে-একে দেখা দিয়েছে শরৎ হেমন্ত-শীত-বসন্ত। রাজদিয়ার মানুষ তিন বছর আগের মতন পাট বুনেছে, ধান কেটেছে, খেতে নিড়ান দিয়েছে, নৌকো বেয়েছে। মটরকলাইর খেতে 'ছেই' সেদ্ধ করে খেয়েছে, গলুয়ায় (মেলায়) গিয়ে বউর জন্য আলতা কিনেছে, ফুলেল তেল কিনেছে। মাঠ পাড়ি দিয়ে গেছে সুজনগঞ্জের হাটে, কিংবা ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে অস্থিসার হয়ে উঠেছে। তিন বছর আগের মতনই তারা ভাসান গান গেয়েছে, সারি-জারি আর রয়ানিতে চারদিক মুখর করে তুলেছে।

তিন বছর আগের মতনই ভেসালের বাঁশে শঙ্খচিল এসে বসেছে। ধানখেতের আলে-আলে জলসেঁচি শাকের অরণ্য উদ্দাম হয়ে উঠেছে। বিলগুলো পানকলস আর জলসিঙাড়ায় ছেয়ে গেছে। পৌষ-মাঘ মাসে শীতের দেশ থেকে এসেছে যাযাবর পাখিরা ; গরম পড়তে না পড়তেই তারা ফিরে গেছে। কাচের মতন স্বচ্ছ জলের তলায় টাটকিনি আর ভাগনা, গজার আর বজুরা, কাচকি আর বাঙালি মাছেরা ডিম পেড়ে পেড়ে রুপোলি ফসলে জলবাঙলাকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে।

তিন বছর আগের মতনই কাউফলের গাছগুলোতে ফুল ধরেছে, বন্যাগাছের দেহ ফলে ভরে গেছে। কালো কালো মসৃণ মুত্রার মাথায় অসংখ্য সাদা ফুলের সুগন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। যেখানেই চোখ ফেরানো যাক—ধানের খেতে, শাপলাবনে, বেতঝোপে কি খাল-বিল-নদীতে—সব দিকেই জলবাঙলার এই অপরূপ বসুন্ধরা আগের মতনই রমণীয়। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের ছুরি ভারতবর্ষকে দু'খানা করে কেটে ফেলার পরও রাজদিয়ার কিন্তু তেমন কোন পরিবর্তন নেই। তার আহ্নিক গতি বার্ষিক গতি প্রায় একই নিয়মে চলেছে।

তবে দূর-দূরান্ত থেকে খবর আসছিল পাকিস্তান হবার পরই এদেশে ভাঙন শুরু হয়ে গেছে। সাতপুরুষের ঘর-ভদ্রাসন ছেড়ে দলে দলে মানুষ আসাম আর আগরতলায় চলে যাচ্ছে। বেশির ভাগ যাচ্ছে কলকাতার দিকে। নোয়াখালি, বরিশাল, ফরিদপুর, কুমিল্লা এমন কি ঢাকা জেলার নানা গ্রাম-গঞ্জ থেকেও ঐ একই খবর আসছিল।

মোতাহার হোসেন সাহেব মাঝে মাঝে আসেন। বিষণ্ণ সুরে বলেন, 'খবর পাচ্ছেন হেমদাদা ?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন হেমনাথ। ঝাপসা গলায় বলেন, 'পাচ্ছি।'

'আপনি তো বলেছিলেন পাকিস্তান হয়ে গেলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু এ কী হচ্ছে?'

হেমনাথ উত্তর দেন না, বিমর্ষ মুখে চুপচাপ বসে থাকেন।

উত্তেজিতভাবে এবার মোতাহার সাহেব বলতে থাকেন, 'সমাধানই যদি হয়ে যাবে, হাজার হাজার মানুষ পূর্ববাঙলা ছেড়ে চলে যাচ্ছে কেন?'

এবারও হেমনাথ নীরব।

এর ভেতর একটা ব্যাপার ঘটে গেল।

একদিন দুপুরবেলা বিনুরা সবে খেয়ে উঠেছে, বাগানের দিক থেকে খুব চেনা একটা গলা ভেসে এল, 'বড়কত্তা, বড়কত্তা—'

হেমনাথ চেঁচিয়ে বললেন, 'কে রে?'

'আমি যুগলা—' বলতে বলতে সত্যিসত্যিই যুগল সামনে এসে দাঁড়াল।

যুগলের গলা পেয়ে স্নেহলতা আর শিবানীও বেরিয়ে এসেছিলেন।

দশ বছর আগে নতুন বৌকে নিয়ে সেই যে ভাটির দেশে দ্বিরাগমনে গিয়েছিল যুগল, তারপর এই প্রথম তাকে দেখা গেল।

প্রায় তেমনই আছে যুগল, তেমনি হিলহিলে বেতের মতন পাতলা চেহারা, তেমনি খাড়া খাড়া চুল। তবে এই মুহূর্তে তাকে অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত আর অস্থির দেখাচ্ছে। কিছুটা বা সন্ত্রস্ত।

এতকাল পর যুগলকে দেখে সবাই ভারি খুশি। স্নেহলতা শিবানী তো চেঁচামেচিই জুড়ে দিলেন, 'বোস যুগল, বোস—'

যুগল বসল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলতে লাগল, 'অহন বসুম না ঠাউরমা। আপনেগো লগে দেখা কইরাই যামু গা।'

'যাবি যাবি। কতকাল তোকে দেখি না। সেই যে শ্বশুরবাড়ি চলে গেলি, ভুলেও আর এদিক মাড়াস না। শ্বশুর-শাশুড়ি পেয়ে আমাদের একেবারে ভুলেই গেছিস। সে যাক গে, এখন এলি কোত্থেকে?'

'ভাটির দ্যাশ থন।'

'শ্বশুরবাড়ি থেকে?'

'হ।'

'ছেলেপুলে হয়েছে?'

'হ।'

'ক'টা ?'

'দুই মাইয়া, এক পোলা।'

'একা একা এলি যে ? বউ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আনলি না কেন ?'

একটু চুপ করে থেকে আবছা গলায় যুগল বলল, 'অরা আইছে– '

স্নেহলতা, শিবানী, হেমনাথ—তিনজনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'কোথায় রে, কোথায় ?'

'ইস্টিমারঘাটায়—'

'স্টিমারঘাটে বসিয়ে এসেছিস যে, তোর আস্পর্ধা তো কম না! ঘরের বৌকে রাজদিয়া পর্যন্ত এনে বাড়িতে তুলিস না!'

মুখখানা কাঁচুমাচু করে যুগল বলতে লাগল, 'রাগ কইরেন না। তাগো আননের সময় আছিল না, আনলেই দেরি হইয়া যাইত। আইজের ইস্টিমার ধরতে পারতাম না। দ্যাশ ছাইড়া জন্মের মত যাওনের আগে আপনেগো লগে দেখা কইরা গেলাম।'

হেমনাথ উৎকণ্ঠিত হলেন, 'কোথায় চলেছিস দেশ ছেড়ে ?'

'কইলকাতা।'

'কলকাতায় কেন ?'

'ভাটির দ্যাশে আর থাকন গেল না বড়কত্তা। আগুন দিয়া গেরামকে গেরাম পোড়াইয়া দিছে, চৌখের সামনা থনে ফসল কাইটা লইয়া যায়। এত অত্যাচার সইয়া থাকন যায় না। হেইর লেইগা যাইতে আছি গা।'

একটু চুপ। পলকে সমস্ত আবহাওয়াটা বদলে গেল। চারদিক থেকে বিচিত্র এক বিষণ্ণতা সবাইকে ঘিরে ধরতে লাগল।

একসময় হেমনাথই বলে উঠলেন, 'কলকাতায় কোনদিন যাস নি। অচেনা জায়গায় গিয়ে কী করবি, কোথায় থাকবি, কী খাবি—তার কি কিছু ঠিক আছে। বরং এক কাজ কর, বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে এখানেই চলে আয়। রাজদিয়াতে কোন গোলমাল নেই।'

খানিক ভেবে যুগল বলল, 'না বড়কত্তা, কইলকাতাতেই যামু। রাইজদিয়াতে গণ্ডগোল নাই বুঝলাম, কিন্তুক হইতে কতক্ষণ। হেয়া ছাড়া—'

'কী ?'

'আমার হউর (শ্বশুর), তিন খুড়া হউর, দুই পিসাতো ভায়রা আর তাগো

গুষ্টি আমার লগে যাইতে আছে। তাগো ফালাইয়া আমি কেমনে আসি ? এত মাইনষেরে জায়গা ছাওন তো সোজা না বড়কত্তা—'

মনে মনে হেমনাথ ভেবে দেখলেন, কথাটা ঠিকই বলেছে যুগল। শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়-স্বজনদের ফেলে একা একা সে আসতে পারে না। আবার সবাই এলে এতগুলো মানুষকে আশ্রয় দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

হেমনাথ এবার অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন, 'ভাটির দেশ থেকে কি অনেক লোক চলে যাচ্ছে ?'

'মেলা বড়কত্তা, মেলা। যা-দশ-বিশ ঘর আছে, তারাও থাকব না। দুই চাইর দিনের ভিতর সাফ হইয়া যাইব।' একটু থেমে যুগল আবার বলল, 'যদি পারেন আপনেরাও যাইয়েন গা !'

হেমনাথ উত্তর দিলেন না।

যুগল এবার বলল, 'আর খাড়াইতে পারুম না, ইস্টিমার ছাড়নের সময় হইয়া আইল। যাই গা ঠাউরমা, যাই বড়কত্তা, চললাম ছুটোবাবু—' হেমনাথ শিবানী আর স্নেহলতাকে প্রণাম করে একটু পর চলে গেল যুগল।

যুগল চলে যাবার পর পুবের ঘরের তক্তপোষে শুয়ে শুয়ে তার কথাই ভাবছিল বিনু। ওরা কলকাতায় যাচ্ছে।

দশ বছর আগে বিনুরা যেদিন প্রথম রাজদিয়া এল সেদিনই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কলকাতার কত খবর নিয়েছিল যুগল। কলকাতা তখন তার কাছে স্বপ্ন, তার কল্পনায় কলকাতা রমণীয় স্বর্গ হয়ে ছিল।

কিন্তু চল্লিশের কলকাতা আর পঞ্চাশের কলকাতা কি এক ? প্রতিদিন ডাকে যে খবরকাগজ আসে তাতে কলকাতার ভয়াবহ ছবি থাকে। সুবিশাল ঐ মহানগর নাকি উদ্বাস্তুতে ছেয়ে গেছে। কোথাও থাকবার জায়গা নেই। তাই ছিন্নমূল নর-নারীর দল রেলস্টেশনে, ফুটপাথে, রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে।

পঞ্চাশের কলকাতা যুগলকে কোন স্বর্গে পৌঁছে দেবে, কে জানে।

॥ বাহান্ন ॥

যুগল যা ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিল, অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। একটা মাসও তারপর কাটে নি, রাজদিয়ার মাটি তেতে উঠল।

ঢাকা থেকে এসে কারা যেন সুজনগঞ্জে, মীরকাদিমে, ওদিকে আউটশাহী

বেতকা আবত্নলাপুরে প্রায়ই মীটিং করে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের চালে আগুন লাগছে, মাঠের পর মাঠ পাকা ধান কারা রাতের অন্ধকারে কেটে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু কি তাই, সন্ধ্যে হলেই ঘরের চালে চালে ঢিল পড়ে, দেশ ছেড়ে চলে যাবার জন্য বেনামী চিঠি আসে। এমন চিঠি খানকতক হেমনাথও পেয়েছেন।

ব্যাপারটা এতেই থেমে থাকল না। সুজনগঞ্জের হাট থেকে ফিরবার পথে সেদিন বারুইপাড়ার রাখাল আর যুগীপাড়ার রাধাবল্লভ সড়কির ঘা খেয়ে এল। তারপর যেদিন গণকপাড়ার কাপাসীকে খুঁজে পাওয়া গেল না সেদিন থেকে এই রাজদিয়াতেও ভাঙন শুরু হয়ে গেল। গণকপাড়া তো বটেই, কুমোরপাড়া, কামারপাড়া, বারুইপাড়া, নাহাপাড়া, সব জায়গা থেকেই দলে দলে মানুষ ভিটে-মাটি ফেলে স্টিমারে করে কলকাতার দিকে চলে যেতে লাগল। হেমনাথ আর মোতাহার সাহেব 'পীস কমিটি' করেও ভাঙন ঠেকাতে পারলেন না।

ইদানিং সব চাইতে আশ্চর্য ব্যবহার হয়েছে মজিদ মিঞার। আগে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই হেমনাথের বাড়ি আসত সে, আজকাল হাজার ডাকাডাকি করলেও আসে না। দেখা হলে এড়িয়ে যায়। তার সম্বন্ধে নানারকম কথা কানে আসছে। লোকটা অদ্ভুতভাবে বদলে গেছে।

শোনা যায় মজিদ মিঞা নাকি কেতুগঞ্জের দিকে লীগের পাণ্ডা হয়ে উঠেছে। আশ্চর্য, এই মানুষই দশ বছর আগে, বিনুরা প্রথম যেদিন রাজদিয়ায় এল, পনের মাইল জল ঠেলে তাদের দেখতে এসেছিল। এই মানুষই সিগারেট খাবার জন্য তাকে মেরেছিল। মারের চোটে জ্বর এলে সারারাত তার শিয়রে বসে কেঁদেছিল। সুজনগঞ্জের হাটে দাঙ্গা বাধলে এই মানুষই পাগলের মতন ছোটাছুটি করেছিল। রক্তাক্ত আহত অবস্থায় লারমোরকে রাজদিয়ায় আনবার পর সে কমলাঘাটে ছুটেছিল ডাক্তার আনতে। তার হৃদয়ের উত্তাপ, তার আত্মীয়তাবোধ, তার মমতা, মহত্ব বিনুকে এতকাল মুগ্ধ করেছে। আশ্চর্য, সেই মানুষটা বদলে গেছে!

যাই হোক রাজদিয়ায় ততটা না হলেও আশেপাশের গ্রাম-গঞ্জগুলো থেকে প্রায়ই-খুন জখম-আগুনের খবর আসছিল। রাত হলেই উল্লসিত চিৎকার শোনা যায়, অন্ধকার চিরে চিরে মশালের আলো দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলতে থাকে।

একদিন আরো নিদারুণ খবর এল। রাজদিয়া থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত যে স্টিমার সারভিস ছিল তা বন্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাজদিয়া যেন অজানা দ্বীপের মতন জলবাঙলার এই প্রান্তে পড়ে রইল।

শুধু রাজদিয়া বা চারধারের গ্রামগুলোতেই না, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-মানিকগঞ্জ থেকেও গোলমালের খবর আসছিল।

যত শুনছিলেন যত দেখছিলেন ততই যেন স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিলেন হেমনাথ। সমস্ত জগৎ থেকে কিছুদিনের জন্য নিজেকে গুটিয়ে এনে চুপচাপ বসে রইলেন। ঠিক বসে রইলেন না, সেই বড় বড় লোহার বাক্সগুলো খুলে সারা জীবনের সঞ্চয় অসংখ্য ভাল ভাল জিনিস—ময়ূরের পালক, সুন্দর হস্তাক্ষর, চকচকে পাথর, চমৎকার চমৎকার ছবি—দেখে দেখে কাটালেন। মন খারাপ হলেই তিনি ওগুলো নিয়ে বসেন। সারাদিন এসব দেখবার পর সন্ধ্যেবেলা গীর্জায় গিয়ে লারমোরের সমাধিতে বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে আসতে লাগলেন।

দিন কয়েক পর-হঠাৎ বুঝিবা হেমনাথের মনে হল, এভাবে নিজেকে গুটিয়ে এনে ঘরে বসে থাকা ঠিক হয়নি। আবার আগের মতন তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগলেন। এই দুঃসময়ে তিনি পাশে থাকলে সবাই ভরসা পাবে।

চারদিক জুড়ে যখন আগুন জ্বলছে সেইসময় একদিন দুপুরবেলা ভাবতোষ এলেন। চুল এলোমেল, চোখের কোলে শ্যাওলার মতন কালচে দাগ, মুখময় তিন-চার দিনের দাড়ি, চোখ আরক্ত। সমস্ত শরীর ঘিরে সীমাহীন বিষণ্ণতা।

দশ বছর ধরে ভাবতোষের এই এক চেহারাই দেখে আসছে বিনু।

এসেই ভাবতোষ বললেন, 'খুব খারাপ খবর কাকাবাবু—'

হেমনাথ বাড়িতেই ছিলেন। উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'কী ব্যাপার ?'

'ঝিনুকের মা মৃত্যুশয্যায়। শেষ সময়ে ঝিনুক আর আমাকে একবার দেখতে চেয়েছে।'

'কে বললে ?'

'সে-ই খবর পাঠিয়েছে।'

একটু ভেবে হেমনাথ বললেন, 'ঝিনুকের মা এখন কোথায় ?'

'ঢাকায়।'

'তোর শ্বশুরবাড়ি ?'

'না।'

'তবে ?'

'যার সঙ্গে চলে গিয়েছিল তার কাছেই আছে।'

'কিন্তু—'

'কী ?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন ভবতোষ।

হেমনাথ বললেন, 'স্টিমার বন্ধ। চারদিকে গোলমাল চলছে। এর ভেতর ঢাকায় যাবি কী করে?'

'আমি একটা বিশ্বাসী মাঝি ঠিক করে রেখেছি, সে-ই নিয়ে যাবে। ভয়ের কিছু নেই।'

'এ সময় পাঠানো উচিত না, ঝিনুক বড় হয়েছে। তবু ওর মায়ের কথা ভেবে না পাঠিয়েও পারছি না। খুব সাবধানে যাবি কিন্তু—'

ভবতোষ মাথা নাড়লেন।

হেমনাথ আবার বললেন, 'কবে ফিরবি?'

'তিন চারদিনের ভেতর।'

ঝিনুককে সঙ্গে নিয়ে ভবতোষ চলে গেলেন।

॥ তিপ্পান্ন ॥

তিন-চারদিনের জায়গায় ষোল-সতের দিন কেটে গেল। তবু ঝিনুকরা ফিরছে না। তাদের কোন বিপদ ঘটল কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। স্নেহলতা শিবানী এবং হেমনাথ অস্থির হয়ে উঠলেন। আর বিনু?

কৈশোর আর যৌবনের দশটা বছর ঝিনুকের সঙ্গে একই বাড়িতে কাটিয়ে দিয়েছে সে। মাঝে মাঝে ভাবতোষ ঝিনুককে নিয়ে গেছেন ঠিকই। কিন্তু দু-একদিন পরেই ফিরে এসেছেন। একসঙ্গে ষোল-সতের দিন তাকে ছেড়ে কখনও থাকে নি বিনু।

ঝিনুক যেন নিশ্বাস-বায়ুর মতন সহজ। কাছে থাকলে টের পাওয়া যায় না। এই দশ বছরে ধীরে ধীরে জীবনের কতখানি জায়গা জুড়ে সে ব্যপ্ত হয়ে গেছে, এই প্রথম বুঝতে পারল বিনু। ঝিনুকের জন্য প্রতি মুহূর্তে তার শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, হেমনাথ ভবতোষদের খোঁজে ঢাকায় যাবেন। বিনুও সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, হেমনাথ নেন নি। বলেলেন, 'দু'জনে গেলে কী করে চলবে? বাড়িতে একজন পুরুষমানুষ থাকা দরকার।'

দিন তিনেক পর ঝিনুককে নিয়ে ঢাকা থেকে ফিরলেন হেমনাথ। কিন্তু এ কোন ঝিনুক? চুল আলুথালু। চোখের দৃষ্টি স্থির, উদ্‌ভ্রান্ত। গালে-ঠোঁটে-বাহুতে, সমস্ত শরীরের কত জায়গায় যে মাংস উঠে উঠে রক্তারক্তি হয়ে

আছে! পরনের জামাটা, শাড়িটা নানা জায়গায় ছেঁড়া। কোন রাক্ষস যেন তার শরীরের সবটুকু সার শুষে নিয়েছে।

ঝিনুককে দেখেই শিবানী স্নেহলতা কেঁদে ফেললেন, 'কী হয়েছে ঝিনুকের? কী হয়েছে? ভব কোথায়?'

হেমনাথকেও চেনা যাচ্ছিল না। বলবান ঋজু মানুষটা একেবারে ভেঙেচুরে গেছেন যেন। তাঁকে একটা ধ্বংসস্তূপ বলে মনে হচ্ছে।

আড়ষ্ট ভাঙা গলায় হেমনাথ বললেন, 'ভব নেই।'

স্নেহলতা চিৎকার করে উঠলেন, 'কী হয়েছে ভব'র? বল—বল—'

হেমনাথ যা বললেন, সংক্ষেপে এই রকম। এখান থেকে ঢাকায় পৌঁছুবার পর ভাবুতোষ দাঙ্গার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। রাক্ষসেরা ভাবতোষকে মেরে ফেলেছে। তারপর ঝিনুককে নিয়ে চলে গিয়েছিল। হেমনাথ ঢাকায় গিয়ে পুলিস দিয়ে ঝিনুককে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু ভাবতোষের মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায় নি।

শ্বাপদেরা ষোল-সতের দিন একটা বাড়িতে ঝিনুককে আটকে রেখেছিল। যে অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়েছে, তার চাইতে সে যদি মরে যেত!

স্নেহলতা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'কেন মরবে, কেন? কী দোষ ওর?'

হেমনাথ ঝাপসা গলায় বলতে লাগলেন, 'কেন যে ওদের আমি ঢাকা যেতে দিলাম! আমি যদি তখন শক্ত হতাম কিছুতেই ওরা যেতে পারত না। ভাবতোষ মরল। আর এই সোনার প্রতিমা নিজের হাতে বিসর্জন দিলাম।'

একধারে দাঁড়িয়ে পলকহীন ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে ছিল বিনু। একটা কথাও বলতে পারছিল না সে। বার বার মনে হচ্ছিল, তীক্ষ্ণমুখ অগণিত তীর তার হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করে যাচ্ছে।

ঢাকা থেকে আসবার পর দুটো দিন কিছু খেল না ঝিনুক, ঘুমলো না, এমন কি একটা কথা পর্যন্ত বলল না। দিনরাত শূন্য চোখে দূর ধানখেতের দিকে তাকিয়ে স্থির বসে থাকল।

পুরো দু'দিন পর ঝিনুক ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'আমাকে তোমরা মেরে ফেল, আমাকে মেরে ফেল।'

স্নেহলতা সান্ত্বনা দেবেন কি, নিজেই কাঁদতে লাগলেন। ঝিনুকের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'কাঁদে না দিদি, কাঁদে না—'

'আমার যে আর কিছুই নেই দিদা, আমার বেঁচে থেকে আর কী লাভ?'

'ওসব ভুলে যা দিদিভাই—'

'ভুলতে যে পারছি না।'

উত্তর না দিয়ে স্নেহলতা তার পিঠে হাত বুলিয়ে যেতে লাগলেন।

ঝিনুক বলতে লাগল, 'আমি এখানে থাকব না দিদি, আমাকে আর কোথাও পাঠিয়ে দাও।'

'কোথায় যাবি দিদি?'

'যেখানে খুশি পাঠাও। আমার এখানে বড্ড ভয় করছে।'

'কিসের ভয়, আমরাই তো আছি।'

'না-না, তোমরা কিচ্ছু করতে পারবে না। ওরা আবার আমাকে ধরে নিয়ে যাবে।'

যত দিন যাচ্ছে, ঝিনুকের ভয় ততই বাড়তে লাগল। রাত্রিবেলা চারধারের গ্রামগুলো থেকে যখন বর্বর চিৎকার ভেসে আসে কিংবা মশালগুলো দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলতে থাকে, সেইসময় ঝিনুক অস্থির হয়ে ওঠে। স্নেহলতা, শিবানী, হেমনাথ বা বিনু—যে-ই কাছে থাকে তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে কাঁপতে বলে, 'আমি আর বাঁচব না, এখানে থাকলে নিশ্চয়ই মরে যাব।'

দেখেশুনে একদিন হেমনাথ বললেন, 'ওর মনের ভেতর ভয় বাসা বেঁধে ফেলেছে। এখানে রাখা আর ঠিক হবে না।'

স্নেহলতা বললেন, 'এখানে তো রাখবে না বলছ; কোথায় রাখবে তা হলে?'

'ভাবছি কলকাতায় অবনীমোহন কি সুধা-সুনীতির কাছে পাঠিয়ে দেব।'

'কলকাতায়?'

'হ্যাঁ।'

'নিয়ে যাবে কে?'

'বিনু। এ ছাড়া সত্যিই ওকে বাঁচানো যাবে না।'

বিনু কাছেই ছিল। বলল, 'এক কাজ করা যাক বরং—'

হেমনাথ শুধোলেন, 'কী কাজ?'

'বাড়িঘর জমিজমা বেচে চল সবাই চলে যাই।'

দৃঢ়স্বরে হেমনাথ বললেন, 'না, কিছুতেই না। কোন অন্যায় আমি করিনি; বিনাদোষে জন্মভূমি ছেড়ে কেন চলে যাব? দুর্দিন দেখে সবাই যদি পালিয়ে যাই সুদিন আনবে কে? মনে রেখো সব মানুষই পশু হয়ে যায়নি; যেতে পারে না। আগের মতন দিন আবার আসবেই। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া?'

'যা দশ-বিশ ঘর এখনও আছে, আমি চলে গেলে তারাও থাকবে না। তাদের জন্যেও আমাকে রাজদিয়া থাকতে হবে।'

'কিন্তু—'

হেমনাথ হেসে ফেললেন, 'তুই কি বলতে চাস, বুঝতে পেরেছি। এর জন্যে যদি মরতেও হয়, আমি রাজী।'

শেষ পর্যন্ত স্থির হল, বিনু একলাই ঝিনুককে নিয়ে কলকাতায় চলে যাবে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে স্নেহলতা বলে উঠলেন, 'কিন্তু—'

'কী ?'

'স্টিমার তো বন্ধ ; যাবে কী করে ?'

হেমনাথ বললেন, 'তারপাশা থেকে দিনে দুটো করে স্টিমার যাচ্ছে গোয়ালন্দে। এখান থেকে নৌকোয় ওরা তারপাশা যাবে। আমি রাজেক মাঝিকে ঠিক করে রেখেছি। সে-ই বিনুদের তারপাশায় নিয়ে স্টিমারে তুলে দিয়ে আসবে।'

'কিন্তু—'

'আবার কী ?'

'ঢাকায় গিয়ে ঝিনুকের যা হাল হয়েছে, তারপাশা যাবার পথে আবার কিছু হবে না তো ?'

'ওদিকে কোন গোলমাল হয়নি। তা ছাড়া রাজেক খুব বিশ্বাসী। তারপর অদৃষ্ট।'

দিন দুই পর সন্ধ্যেবেলা পুকুরঘাট থেকেই রাজেক মাঝির নৌকোয় উঠল বিনুরা। বিনুরা বলতে বিনু আর ঝিনুক। সারারাত বাইলে ভোরবেলা তারা তারপাশা পৌঁছে যাবে। ঝিনুক বিনুর কোলের কাছে চিত্রার্পিতের মতন বসে আছে।

সবে কার্তিকের শুরু। এখনও মাঠে প্রচুর জল। ধানখেত আর শাপলাবন ঠেলে অনায়াসেই নৌকো নিয়ে বড় নদীতে চলে যাওয়া যাবে।

স্নেহলতা শিবানী আর হেমনাথ পুকুর পারে দাঁড়িয়ে আছেন। শিবানী স্নেহলতা খুব কাঁদছিলেন। হেমনাথ রাজেক মাঝিকে সাবধান করে দিচ্ছেন। পাখি পড়ানোর মতন বার বার বলছেন, কিভাবে কেমন করে তারপাশায় নিয়ে যাবে।

রাজেক সমানে মাথা নাড়ছে আর বলছে, 'আপনে নিশ্চিন্ত থাকেন বড়কত্তা,

জান থাকতে ছুটোবাবুগো গায়ে কেউ হাত দিতে পারব না। আল্লার কিরা—'

বিনু একদৃষ্টে হেমনাথের দিকে তাকিয়ে ছিল। স্নেহলতা, শিবানী—কারোকেই দেখতে পাচ্ছিল না সে। তার চোখের সামনের সবকিছু ঘিরে, সমস্ত চরাচর জুড়ে প্রসন্ন পুরুষটি যেন দাঁড়িয়ে আছেন।

হেমনাথকে দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল বিনু। হঠাৎ দশ বছর আগের সেই দিনটির কথা মনে পড়ে গেল তার। জলবাঙলার এই অখ্যাত নগণ্য জনপদে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সারা রাজদিয়ায় যেন উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছিল। আর আজ? রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে সবার চোখের আড়ালে চলে যেতে হচ্ছে। নিরানন্দ নিরুৎসব এই বিদায় বিনুর বুক অসীম বিষাদে ভরে দিতে লাগল।

এইমুহূর্তে কত কথাই মনে পড়ছে তার। লারমোর, মজিদ মিঞা, রামকেশব, মনা ঘোষ, গয়জদ্দি ব্যাপারী, রজবালি শিকদার, পতিতপাবন, মোতাহার হোসেন সাহেব, ফসলকাটা মাঠে যে লোকটা ইঁদুরের গর্ত থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ধান বার করত সেই তালেব, চরের সেই ভূমিহীন কৃষাণের দল, এমনকি ধানের খেতে গা দুলিয়ে দুলিয়ে যে বুড়ো সোনালী গোসাপটা আলের ওপর দিয়ে যেত — সবাই চোখের সামনে ভিড় করে এল। আর মনে পড়ছে শরতের উজ্জ্বল নীলাকাশকে, সাদা সাদা ভবঘুরে মেঘদলকে, কার্তিকের ধূসর হিমকে। জলসেঁচি শাকের নিবিড় লাবণ্য, বেতঝোপ, মূত্রাবন, বড় বড় পদ্মপাতা, জলসিঙাড়া, কাউ আর হিজলবন, কইওকড়া আর হেলেঞ্চা লতার দাম, শঙ্খচিলের ঝাঁক, গোবক, কানিবক, পানিকাউ, শালিক, বুলবুলি, বাচা-ট্যাঙরা-বাঙালি-বজুরি মাছেরা — কত কথা যে মনে পড়তে লাগল। এরাই তো তার হাত ধরে কৈশোর থেকে যৌবনে পৌঁছে দিয়েছে। হায়, কৈশোরের এই রম্যভূমি, যৌবনের এই স্বর্গে আর কোনদিন ফেরা হবে কিনা, কে জানে।

জল বাঙলার মনোহর দৃশ্য, পশুপাখি, বৃক্ষলতা খুব বেশিক্ষণ বিনুকে বিভোর করে রাখতে পারল না। এবার তার চোখ এসে পড়ল খুব সামনে, একেবারে কোলের কাছে, ঝিনুকের ওপর। মেয়েটাকে দেখতে দেখতে অপার স্নেহে অসীম করুণায় তার বুক ভরে যেতে লাগল। এই সময় হঠাৎ মনে পড়ল তার বাবা অবনীমোহন পশ্চিম বাঙলার মানুষ, মা পূর্ব বাঙলার মেয়ে। তার বুকের একধারে পূর্ব বাঙলা, আরেক ধারে পশ্চিম বাঙলা। তার রক্তের স্রোত পদ্মা, আরেক স্রোত গঙ্গা। আর কোলের কাছের এই মেয়েটা—এই ঝিনুক? সে তো পূর্ব বাঙলার লাঞ্ছিত অপমানিত আত্মা। তাকে নিয়েই সে কলকাতায় চলেছে।

হঠাৎ প্রাণের ভেতর কী হয়ে গেল, কে বলবে। বড় মায়ায় ঝিনুককে সে বুকের কাছে নিবিড় করে আনল।

পুকুরপার থেকে একসময় হেমনাথের গলা ভেসে এল, 'আর দেরি করিস না রাজেক ; নৌকো ছেড়ে দে—'

মাঝি বলল, 'এই ছাড়ি—'

একটু পর জলে বৈঠা পড়ল, একটানা বাজনার মতন ছপ ছপ শব্দ কানে আসতে লাগল।

নৌকো অকূলে ভাসল।

দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত

Sig. of Class Teacher

Sig. of Head